আরেক রকম

নবম বর্ষ অষ্টম-নবম সংখ্যা
১৬ এপ্রিল-১৫ মে ২০২১ ১-৩১ বৈশাখ ১৪২৮

মূল্য : ৫০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com
সম্পদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

অনলাইন পড়তে : www.arekrakam.com
ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/arekrakam

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

নবম বর্ষ অষ্টম-নবম সংখ্যা ১৬ এপ্রিল-১৫ মে ২০২১,
১-৩১ বৈশাখ ১৪২৮

Vol. 9, Issue 8th & 9th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয় ৫

নববর্ষের এদিক-ওদিক— **পবিত্র সরকার** ৭

ভাষার জন্য— **মালিনী ভট্টাচার্য** ১১

একত্বের সন্ধান— **সৌরীন ভট্টাচার্য** ১৫

গৌরীপদ দত্ত (১৯২৭-২০২০)— **অমিয় কুমার বাগ্‌চী** ২০

সংকটোত্তর বিশ্ব অর্থনীতি— **আজিজুর রহমান খান** ২৩

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি?— **মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত** ২৭

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে— **অরুণ সোম** ৩৩

শ্রমিক কৃষক সংহতির নতুন সম্ভাবনা— **অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়** ৩৭

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই: ইতিহাসের শিক্ষা— **রজত রায়** ৪১

নির্বাচনী যাত্রাপালা— **মালবী গুপ্ত** ৪৯

ভোট-বৈশাখ— **শুভময় মৈত্র** ৫১

আত্মচিন্তা 'ভয়ঙ্কর'? আহা, কী 'সেকুলার'!— **রূপসা** ৫৪

গানের মধ্যে ভাগাভাগি— **পলাশ বরন পাল** ৫৭

সুকুমার রায়ের মৃত্যু: দায়ী কে?— **আশীষ লাহিড়ী** ৬২

করোনা কাল প্রসারিত হচ্ছে— **মানস প্রতিম দাস** ৬৫

অন্তরিনের মুক্তগদ্য— **স্বপন ভট্টাচার্য** ৬৮

অর্ধশতকের ওপার থেকে দেখা মুক্তিযুদ্ধ ও কলকাতা— **স্বাগতম দাস** ৭১

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র: অপরিচয়ের পরিসর— **সুমন ভট্টাচার্য** ৭৪

ভারতপথিক নির্মলকুমার বসু— **সৃজা মণ্ডল** ৭৮

প্লে-স্কুল, হ্যালোজেন ও শ্যামাপোকা— **অম্লানকুসুম চক্রবর্তী** ৮৪

অক্ষয়বটের দেশ— **কালীকৃষ্ণ গুহ** ৮৭

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: শৈলজ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক
কে কে পুরী, নিউজ ডিস্ট্রিবিউটার্স
৯ ডেকার্স লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৯

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা
বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৭০০০.০০ টাকা দিয়ে "সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী (৪নং ফর্ম) 'আরেক রকম' পাক্ষিক পত্রিকার স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞাতব্য।

১. প্রকাশের কাল	:	পাক্ষিক
২. প্রকাশকের নাম	:	তৃষিতানন্দ রায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৯১
৩. মুদ্রকের নাম	:	তৃষিতানন্দ রায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা ৭০০ ০৯১
৪. সম্পাদকের নাম	:	শুভনীল চৌধুরী
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	ফ্ল্যাট-কে-১, ব্লক-৩ ৫০/এ কলেজ রোড পি.ও.-বোটানিক্যাল গার্ডেন হাওড়া ৭১১ ১০৩
৫. প্রকাশের ঠিকানা	:	৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড কলকাতা-৭০০ ০৪২
৬. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	:	সমাজচর্চা ট্রাস্ট ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড কলকাতা-৭০০ ০৪২

আমি তৃষিতানন্দ রায় এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১৬ এপ্রিল, ২০২১ স্বাঃ তৃষিতানন্দ রায়

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪২

১. অশোকনাথ বসু
১২৪/৯/১ প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২

২. তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪২

৩. অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
ফ্ল্যাট ১৬এফ, 'সপ্তপর্ণী'
৫৮/১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

৪. তৃষিতানন্দ রায়
এ. জে. ২৩৪, সেক্টর ২, সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৯১

৫. অমিতকুমার রায়
ফ্ল্যাট ৩সি, পুষ্প অ্যাপার্টমেন্ট
৬৩এ ব্রাইট স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৯

৬. অমিতাভ রায়
ফ্ল্যাট-৪
১৫৭বি, প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২

৭. সুজিত পোদ্দার *কার্যনির্বাহী সদস্য*
এ. কে. ১২৭, সেক্টর ২, বিধাননগর
কলকাতা ৭০০ ০৯১

আরেক রকম

পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃতির নিয়ম মেনে বছরের এই সময় বাড়ছে তাপমাত্রা। একই সঙ্গে বর্তমান বছরে নির্বাচনের উত্তাপ ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কিছু মানুষ, গণতান্ত্রিক নির্বাচন সমাধা করতে গিয়ে। শীতলকুচির পাঁচটি তাজা যুবকের প্রাণ অকালে ঝরে গেল শাসকের বন্দুকের গুলিতে। অন্যদিকে, আবার করোনার থাবা ক্রমপ্রসারমান। ২০২০ সালের তুলনায় দেশে করোনার সংখ্যা বাড়ছে, দৈনিক নতুন নতুন নজির গড়ছে। মানুষ আতঙ্কিত, করোনা এবং লকডাউনের ভয়ে। অর্থব্যবস্থার সংকট আরো ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। করোনা টিকা এসে গেলেও সরকারের অপদার্থতায় তা জনগণের কাছে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছোতে পারছে না।

এমতাবস্থায় বাঙালির পয়লা বৈশাখ আগত। নতুন আরেকটি বছরকে স্বাগত জানাতে তৈরি বাঙালি। *আরেক রকম* এই নতুন বছরের আগমনের সময়, আবার পাঠকদের অনুরোধে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। ২০২০ সালের ১৬ মার্চ, শেষবার আমরা মুদ্রিত আকারে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিলাম। করোনা ও লকডাউনের জোড়া ধাক্কায় আমরা মুদ্রণ বন্ধ করতে বাধ্য হই। ২০২০ সালের জুন মাস থেকে অবশ্য আমরা নিয়মিত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.arekrakam.com) পত্রিকা প্রকাশ করছি। কিন্তু আর্থিক অনটন, আমাদের পত্রিকা বিতরণের ব্যবস্থা ও অন্যান্য পরিকাঠামো সবই বিপর্যস্ত। তবু পাঠকদের অনুরোধে আমরা এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছি। আপাতত এই মুদ্রণ প্রক্রিয়া পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। পাঠকদের উৎসাহ পেলে এবং আমাদের পরিকাঠামোগত সমস্যার নিরসন হলে আমরা নিয়মিত পত্রিকা মুদ্রণ করব। বিগত নয় বছর ধরে আমাদের পাশে থেকেছেন আমাদের পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, ছাপাখানা ও ওয়েবসাইট টিমের বন্ধুরা, বিক্রেতা এবং আরো অনেকে। আপনাদের সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষ। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং *আরেক রকম*-এর পাশে থাকুন।

পশ্চিমবঙ্গের আগামীদিন খুব সুখকর নয় বলেই মনে হয়। বহুমুখী এক সংকটের সম্মুখীন আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ। এমতাবস্থায় হাহুতাশ না করে আমাদেরকেই নিজেদের সময়কে সুন্দর করে গড়ে তোলার লড়াইয়ে শামিল হতে হবে। *আরেক রকম* সেই লড়াইয়ে চিন্তা ও মননের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে হাজির থাকবে। এই বিশেষ সংখ্যার নিবন্ধগুলি যদি আগামীর সেই লড়াইয়ের সৈনিকদের মগজাস্ত্র শান দেওয়ার কাজে কোনো ভূমিকা পালন করে তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

UTTORA

Good Living Got Better

Our New Project

At

Bagdogra, Darjeeling District

Luxmi Portfolio Ltd.

নববর্ষের এদিক-ওদিক

পবিত্র সরকার

১

একটা বাংলা নববর্ষ আসে আর আমরা কেউ কেউ তীব্রভাবে বুঝে যাই যে, আমরা দীর্ঘদিন উপনিবেশে আক্রান্ত ছিলাম, আর সেই আক্রমণের বাইরে আর বেরোতে পারিনি, কারণ তাতে আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক অস্তিত্বের ভিতর-বাইরের অনেক কিছু আমূল বদলে গেছে। উপনিবেশ আমাদের প্রায় আশি-নব্বইভাগ দখল করে আছে, আর, কী নাম দেব তার—প্রাগ্-ঔপনিবেশিক 'ঐতিহ্য'-র জন্যে, এক চিলতে জায়গা ছেড়ে রেখে দিয়েছে। সেই সংকীর্ণ পরিসরেই আমরা একটু-আধটু খেলাধুলো করি, কখনো রীতিমতো বাঙালি হয়ে যাই, সেই সঙ্গে বাঙালি হিন্দু বা বাঙালি মুসলমান। 'বাঙালি' কথাটার বদলে দক্ষিণ এশীয় বললেও ক্ষতি নেই, আর হিন্দু-মুসলমানের বাইরেও অন্য ধর্মকে যোগ করা যেতে পারে। এই সব আচার-আচরণ চুকে গেলেই আবার ঢুকে যাই উপনিবেশ-উপহৃত আধুনিকতায়, শার্টের বোতাম এঁটে, প্যান্ট-ট্যান্ট পরে—দশটা-পাঁচটা ইশকুল-অফিস-আদালত করতে ছুটি। সে সবই চলে বিলিতি ক্যালেন্ডার মেনে, বিলিতি মাস গেলে মাইনে পাই, বিলিতি মতে—না, তার লিস্টি একটা প্রবন্ধে কুলোবে না, বিলিতি মতে আর ব্যবস্থায় আমাদের সমস্ত জীবন গড়গড়িয়ে চলে। এই আধুনিকতা আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিতে এমন একটা বিচ্ছেদ তৈরি করেছে যে, আমরা তা সামাল দিতে দিতে চলি, চলতেই হয়। এটাকে কেউ কেউ সমন্বয় বলবেন হয়তো, কিন্তু সমন্বয় ঠিক হয় বলে আমাদের মনে হয় না। ঘটনাক্রমে এই ধরনের উপলক্ষ্য বছরে খুব ঘন ঘন আসে না। ওই পুজো-আচ্চা, বিয়ে-শাদি, হিন্দু-মুসলমানের নানা পরব ইত্যাদি—এ সবে দুটো ক্যালেন্ডারের ধাক্কাধাক্কি চলে। অথচ আধুনিকতাকে বাদ দেবার প্রশ্নই ওঠে না, যদিও আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার শাসকদল আধুনিকতার নানা উপসর্গ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি এবং অসন্তোষ জানিয়ে আসছেন—ইংরেজি ভাষা থেকে পোশাক-আশাক, তামসিক খাদ্য-দ্রব্য—সবই তাদের চক্ষুশূল।

যাই হোক, যেহেতু অনেক ক্যালেন্ডারে (অলংকারের, চায়ের, জামাকাপড়ের আর ওষুধের বাঙালি দোকানদারদের সৌজন্যে) আর ডায়েরিতে বাংলা আর ইংরেজি দুটো তারিখই দেওয়া থাকে, আবার বাজারে পঞ্জিকাও বেরোতে থাকে পৌষের শেষ থেকে, খবরের কাগজের মাথাতেও বাংলা সনের তারিখই থাকে ইংরেজির পাশাপাশি, তাতে আমাদের প্রভূত সাহায্য হয়। অন্য সময় ইংরেজি তারিখের দিকেই আমাদের চোখ থাকে, বাংলা তারিখ ভুলেও দেখি না, কিন্তু পয়লা বৈশাখের কাছাকাছি এলেই মনটা উশখুশ করতে থাকে, এবার কোন্ ইংরেজি তারিখ হল, ১৩, ১৪, না ১৫ই এপ্রিল? পঁচিশে বৈশাখ কবে— ৭, ৮ না ৯ মে? এই দুটো তারিখ আমাদের বাংলা সন মেনে ধরে থাকতেই হয়। তবে বাংলাদেশ বুদ্ধি করে বেশ আগেই ইংরেজি বাংলার এই ঝগড়া মিটিয়ে হস্তমর্দন করিয়ে দিয়েছে। তারা ড. মেঘনাদ সাহাদের করা পঞ্জিকা সংস্কার গ্রহণ করে বাংলা আর ইংরেজি তারিখের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব পাতিয়েছে, সেখানে প্রতি বছর এক ইংরেজি তারিখেই, ১৫ এপ্রিলেই, পয়লা বৈশাখ হবে, কার বাপের সাধ্যি নেই আর এদিক-ওদিক করে। আমাদের এখানে আমরা সেটা পারিনি, যতদূর শুনেছি, পঞ্জিকাওয়ালারা বাধা দিয়েছিল। বাংলা ক্যালেন্ডার একটু বিজ্ঞানসম্মত হলে তাদের কী পাকা ধানে মই পড়ত কে জানে ! যাই হোক, বাংলাদেশের ১লা বৈশাখ সম্বন্ধে পরে আর একটু বলব, আমাদের 'রাজভাষা'য় যাকে বলে 'আঁখো-দেখা হাল' তার বিবরণ দিয়ে।

২

এটা সবাই জানে যে, আধুনিক কালে আমরা দু-একটা 'ধর্মমুক্ত' উৎসব শুরু করেছি, যার একটা পঁচিশে বৈশাখ। এটাও বাংলা ক্যালেন্ডার মেনে হয়, রবীন্দ্রনাথের পরিবারের কী দুর্মতি হয়েছিল কে জানে, আদিখ্যেতা করে বাংলা তারিখ ধরে বসে থাকার। এটায় টিকিওয়ালা পুরুতদের কোনো আহ্বান নেই, নইলে তাদের সরস্বতী পুজোর মতো দৌড়োতে হত। তবে পয়লা বৈশাখে অনেক আগে থেকে কিছু ধর্মের বা আচারের ব্যাপার তৈরি হয়ে গেছে। তাতে কলকাতায় গঙ্গাস্নান, কালীঘাটে পুজো দিয়ে হালখাতাকে

শুদ্ধ করার ব্যাপার আছে, অন্তত হিন্দুদের বেলায়। আবার ইদানিং বাংলাদেশের মতো করে 'ধর্মমুক্ত' বা 'সাংস্কৃতিক' পয়লা বৈশাখও পালিত হচ্ছে, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে, ইমানুলের ভাষা ও চেতনা সমিতির উদ্যোগে। আগের রাত থেকে শুরু হয়, পরদিন ভোর পর্যন্ত চলে। এখন পাড়ায় পাড়ায় এই ধর্মমুক্ত উৎসবের বিস্তার হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে নজরুলকে ভর করে। তবে তার পুরোনো চেহারাটায়, অন্তত হালখাতা সংস্করণে কিছু আচার-আচরণ তো লেগেই আছে।

৩

দুই বাংলাতেই বাংলা পয়লা বৈশাখ যখন আসে সেটা খুব সুসময় নয়, উৎসব ঠিক পোষায় না। আগে দু-চার পিস কালবৈশাখি না হয়ে গেলে অসহ্য গরম পড়ে, যেমন এবার পড়েছে। খাওয়া দাওয়ার জিনিসও যে সব জুতসই থাকে তাও নয়, সে তো শীতকালের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি সব সাফ হয়ে যায়। তবু উৎসব বলে কথা, যেকোনো ছুতোয় একটা উৎসব পেয়ে গেলে তাকে ছাড়ে কেডা? তার আগে থেকেই তো কলকাতার ফুটপাথে চৈত্রের সেল ('ছেল্, ছেল্, ছেল্, ছেল্,') শুরু হয়ে যায়, আর আমাদেরও যেন মনে হয় একটা কিছু আসছে শিগ্‌গিরই। 'সে আসে, আসে।' আমরা আঁতেল-জামা পরে নিজেদের প্রশ্ন করি না যে, ওরে গাধা, নতুন বছর আবার কী? সব দিনই এক। মানুষ সময়ের হিসেব তৈরি করেছে, মাস বছর সবই, নতুন বছরও তাই এক কৃত্রিম আরোপ। সময় চলে যায়, এই হল কথা, আর তোদের বয়স বাড়ে, জীবন জীর্ণ হয়–এই হল প্রাকৃতিক ঘটনা। এ নিয়ে এত হইচই করবার কী আছে? সময়ের আবার নতুনই বা কী, পুরোনোই বা কী?

কে শোনে কার কথা! আমরা ওই ক্যালেন্ডারের নতুন পুরোনো মেনেই ধরে নিই বছর চক্রাকার–জন্মায় মরে, আবার জন্মায়। মরে তো ঠিকই আছে, কিন্তু জন্মায় যে, সেটা নিয়ে হইচই করব না? তাই নববর্ষের দিনটা সারা পৃথিবীর সব সংস্কৃতিতেই তুমুল ধুমধাম করে হয়। ইংরেজি নিউ ইয়ার তো আমরাও কবজা করেছি এখন, আর কলকাতাতেই দেখি চিনারা তাদের নতুন বছরে কাগজের ড্রাগন নিয়ে মিছিল করে, পার্শিরা করে নওরোজ। আমাদের নববর্ষই বা ফ্যালনা হবে কেন? তবে আমার জীবৎকালেই তার চরিত্র বেশ বদলে যেতে দেখলাম। আগে এই উৎসবের দুটো দিক ছিল–দিনের বেলাটায় পারিবারিক, আর সন্ধেবেলাটায় কিছুটা সামাজিক। ছেলেবেলায় গ্রামে দেখেছি দুপুরে সন্তানের মায়েরা সকাল সকাল চান করে এসে ছেলেমেয়েদের ভেজা পাখার বাতাস দিয়ে গায়ে জল ছিটিয়ে দিতেন, আর হাত থাকত ভেজা বাঁশের কুরুল বা না-ফোটা পাতার গুচ্ছ, তা থেকেও ঝেড়ে জল ছিটোতেন। গরমে আমাদের সেটা বেশ ভালোই লাগত, আমরা 'আর-একটু দাও' বলে আবদার করতাম। তার পর দুপুরে বেশ ভালো খাওয়াদাওয়া হত। সেদিন হয়তো শুক্তো হত একটু, ছোটো মাছ ভাজা, সোনামুগের ডাল, বড় মাছ, এবং শেষে একটু পায়েস। ব্যস্, রীতিমতো স্মরণীয় ভোজ। নতুন 'সুতো' বা নতুন জামাকাপড় পেতাম কেউ কেউ, তাও কম স্মরণীয় নয়, অন্তত পুজো পর্যন্ত তো বটেই, তখন আর-এক প্রস্থ নতুন জামাকাপড় এসে পয়লা বৈশাখের জামাকাপড়কে পুরোনো মার্কা দেগে দেবে।

সন্ধেবেলার উৎসবটা কিছুটা সামাজিক, তাও অন্যান্য উৎসবের মতো নয়। ওই সময় আমাদের বাঙালি সমাজ দোকানদার আর খদ্দের–এই দুটো অর্থনৈতিক শ্রেণিতে ভাগ হয়ে যায়, আর প্রথম শ্রেণির লোকেরা দ্বিতীয় গোষ্ঠীকে নেমন্তন্ন করে হালখাতা উপলক্ষ্যে। বিশেষ করে জামাকাপড়, সোনার দোকান ইত্যাদিতে নেমন্তন্নের ব্যাপারটা আমার চোখে কেন বেশি পড়ে আমি জানি না। আমি কোনো ফার্নিচার বা মিষ্টির দোকানে পয়লা বৈশাখের নেমন্তন্ন কখনো পাইনি, হয়তো অন্যরা পেয়েছেন। সেখানে আগে তৈরি-করা খাবার দেওয়া হত, লুচি-আলুরদম পর্যন্ত–এখন শিঙাড়া-কচুরি বা মিষ্টির প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, কোথাও বা মন্‌জিনিস, আর ঠান্ডা নরম পানীয় সরবরাহ করা হয়। এটা নিছক সরস সৌজন্যের ব্যাপার নয় সেটা পরে বড়োরা বুঝিয়েছেন। যে সব খদ্দের ধারে জিনিসপত্র নেন, তারা ওদিন কিছু ধার শোধ করেন দোকানির–আগের বছরের পুরোটা করেন কি না জানি না–এবং হিসেব নতুন খেরো-বাঁধানো হালখাতায় তোলা হয়। একটা বৈষয়িক ব্যাপারকে একটা উৎসবের মোড়কে হাজির করা সংস্কৃতির এক বদভ্যাস, সংস্কৃতির চক্ষুলজ্জা আছে বলেই সে এটা করে বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যে 'পুণ্যাহ'-এর কথা লিখেছেন তাও অনেকটা এইরকম ছিল, প্রজারা খাজনা শোধ করবে–সেটা লাঠিয়াল হাঁকিয়ে গলায় কাছা দিয়ে টেনে এনে করানোর বদলে একটা উৎসবের চেহারা দেওয়া। অন্য সময় করা যেতেই পারে, করা হতও প্রচুর, কিন্তু ওই দিনটাতে হয়তো নয়। ধর্ম এখানে খুব কাজে লাগে, প্রজারা ধর্মের গন্ধ পেলে সহজেই কাবু হয়ে যায়।

তবে এখন সব উৎসবেরই পণ্যায়ন ঘটেছে, কর্পোরেটরাও হামলে পড়েছে নববর্ষের উপর। জামাকাপড় পোশাক-আশাক, খাবারদাবার, গেরস্থালি–সব জিনিসের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে যাচ্ছে বাজার। 'কেনো, কেনো, কিনে ফতুর হয়ে যাও, বাবুবিবিগণ।' যেন মাদার টেরিজার একটা কথাকে ওরা প্যারোডি করে বলতে চায়–Buy, till it hurts!

আর একটা ব্যাপার ঘটে পয়লা বৈশাখে। ওই দিন থেকেই বোধ হয় কলকাতার চিতপুরের যাত্রার দলগুলির

নতুন কর্মপরিকল্পনা শুরু হয়। বাংলা কাগজে পাতাজোড়া বিশালবিশাল বিজ্ঞাপন বেরোয় নানা দলের যাত্রা-পসরার। এর পরের বিজ্ঞাপন-পর্ব হল আষাঢ় মাসে রথের দিন।

পয়লা বৈশাখের একটা বিকল্প আছে, সেটা একটা তিথি– অক্ষয় তৃতীয়া। আমি তাকে বলি পয়লা বৈশাখের গরিব আত্মীয়, তার রুটিন মোটামুটি একই রকম, কিন্তু পয়লা বৈশাখের মহিমা সে পায়নি, আর পাবে বলেও মনে হয় না।

৪

আমার চোখে যে নববর্ষ মহিমময় হয়ে জেগে আছে, তা বাংলাদেশের, বিশেষত ঢাকার নববর্ষ উদ্‌যাপন। এই হল পুরোপুরি 'ধর্মমুক্ত' নববর্ষ, যার আরো বিস্তার ঘটবে বলে আমরা আশায় আছি। আমার পুরোনো লেখা থেকে তারই ছিন্ন ছবি জুড়ে দিই।

ঢাকার রমনা উদ্যানে ভোরবেলায় আপনারা অনেকেই গেছেন, তাই না? দোয়েল চত্বর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউর ওপর ভোর থেকে মেলা বসে গেছে, একেবারে গ্রামের মেলা যেন। সেখানে বাঁশি বাজছে, ভেঁপু বাজছে, ছোটোদের খেলনার বিচিত্র বাহার, বেলুনের গা ঘসার ক্র্যাঙাৎ ক্র্যাঙাৎ শব্দ, ঘরগেরস্থালির নানা জিনিস, কিন্তু এখন সে সব লক্ষ্য না করে বাচ্চাদের হাত ধরে ঢাকার প্রায় সব মধ্যবিত্ত মা বাবা ছুটে চলেছে রমনার বটতলার দিকে। তুলি- প্যাস্টেল নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে থাকা আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছোটোদের গালে নকশা আঁকছে, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ছবি, তার নীচে 'জয় বাংলা', নদীতে পাল তোলা নৌকো, শাপলা ফুল–কী নয়? তরুণীরাও সাগ্রহে রংতুলির সামনে পেতে দিচ্ছে গাল।

কলকাতায় যেমন পঁচিশে বৈশাখে সবাই জোড়াসাঁকোর দিকে ছোটে, ঢাকায় ছোটে রমনার বটতলার দিকে। শিশু সন্তানকে নিয়ে আসে, কোলে, হাতে ধরে। ওই দিন সকলেরই পোশাকে একটু লালের ছোঁওয়া থাকে। ধর্ম যাই হোক, বহু মেয়ে লালপেড়ে শাড়ি পরে, আর বটতলায়, সনজিদা খাতুনের ছায়ানট দলের বিশাল অনুষ্ঠানে গান আর আবৃত্তি করে যে মেয়েরা সকলেই তো লালপেড়ে শাড়ি পরা। আর দেড়শো-দুশো ছেলেমেয়ের গলায় কী গান–লালন, হাসন রাজা, রাধারমণ, রবিঠাকুর, নজরুল, দ্বিজু রায়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠেন, গান আর কবিতাগুলো সকালের আকাশে যেন দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রচুর রামধনু এঁকে দিতে থাকে। হাজার হাজার লোক স্তব্ধ হয়ে সেই গান আবৃত্তি শুনছে, বিশাল বিশাল ক্রেনে বসানো টেলিক্যামেরা সেই দৃশ্য-শ্রাব্যকে ধরে নিয়ে সারা পৃথিবীর বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আড়াই-তিন ঘণ্টা একটানা সংগীত আর কবিতার এক মহাভোজ যেন। মৌলবাদীরা এটা পছন্দ করে না বলেই ২০০১-এ বোমা মেরেছিল এখানে, মানুষ খুন করেও কিন্তু এই উৎসবকে থামাতে পারেনি। এখন এ উৎসব আরো দুর্দম হয়েছে।

তারপর ফেরার পথে সাজানো স্টলগুলোতে লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে পান্তা ভাত খাও ইলিশ বা শুঁটকি মাছে দিয়ে, বন্দুক দিয়ে দেয়ালে সাজানো বেলুন ফাটাও, না পারলে বন্ধুরা এর-ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ো, দূর থেকে ঢিল মেরে খাড়া বোতল ফেলে দেওয়ার খেলায় মাতো, বা পাশের স্টলে বাউলের গান শুনতে দাঁড়াও, বাচ্চাকে যা খুশি খেলনা কিনে দাও, তার হাতে-দেওয়া গ্যাসবেলুন আকাশে উড়ে যাক, দুপুরের ঘামের মধ্যেও তাদের গালের নানা রঙিন নকশা অক্ষয় থাক। ঢাকার সব মানুষ যেন এই দিন রমনায় এসে থেকে যায়, বিকেলে ছাত্রছাত্রীদের বিশাল বিশাল মডেল আর ট্যাবলোর মিছিল দেখে, নানা ব্যান্ডের গান শুনে তবে ফিরবে।

বিকেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে ওই নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতেই। বাংলা একাডেমির সামনে যদি দাঁড়াই, হঠাৎ শুনি কোথায় কালবৈশাখির মেঘের মতো গুরুগুরু আওয়াজ হচ্ছে, অথচ পরিষ্কার নীল বিকেলের আকাশ। বিস্ময়ের কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার সেই দোয়েল চত্বর আচ্ছন্ন করে দ্রুত আসতে থাকে ছাত্রছাত্রী আর জনতার এক উচ্ছল মিছিল, রাস্তার সীমানা ভেঙে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, ড্রাম, জয়ঢাক, ধামসা বাজাতে বাজাতে, বিশাল কলরব তুলে। সে মিছিলের মাথায় প্রথমে হয়তো একটা কাগজের না কীসের সিকি কিলোমিটার লম্বা কুমির, বাজনার তালে তালে তা মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে, যেন হাসছে–কুমিরের হাসি সেই আমি প্রথম আর শেষ একবারই দেখেছিলাম– তার পিছনে সকলের মাথার ওপরে একটি একাধিক বাঘ নৃত্য জুড়েছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঈগল পাখি আর বিচিত্র সব পুতুলের দল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকালটির ছেলেমেয়েরা এই সব মূর্তি বানিয়েছে কাগজ, ফোম, এমনকী ফাইবার গ্লাস দিয়ে, সেগুলিকে কাঠির মাথায় জুড়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। গুচ্ছে গুচ্ছে দলে দলে গান চলছে। কাঠির উপরে ব্যানারও আছে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দের কবিতার লাইন দিয়ে। এমন আমি আর কোথাও দেখিনি। বিদেশের কার্নিভ্যালের চলচ্চিত্র দেখেছি, আমেরিকায় নানা দিবস উপলক্ষ্যে প্যারডও দেখেছি, ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের কথা অভিভাবকদের মুখে শুনেছি মাত্র। কিন্তু আনন্দে, উচ্ছলতায় এমন স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল আমি দেখিনি।

শুধু রমনায় নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নয়, শহরের নানা তল্লাটে নববর্ষ উৎসব হয়, উৎসব হয় বাংলাদেশের তল্লাটে তল্লাটে। উৎসব ছড়িয়ে যায় সারা দেশে। ওখানে এখন এটা জাতীয় উৎসব।

খুব তো 'বাংলা বাংলা' করি আমরা। কলকাতায়,

পশ্চিমবাংলায় এমন একটা কিছু করে উঠতে পারি না কেন? অ্যাকাডেমি চত্বরকে ছাড়িয়ে গিয়ে, কলকাতার রাজপথ ছাপিয়ে। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু একটা আয়োজন করতে পারে না বিকেলে, যেমন করেছিল ১৯৯০ নাগাদ? ঘরে বসে টেলিভিশনের নানা চ্যানেলের নববর্ষের বৈঠক দেখলেই চলবে? আসুন আমরা ঘর থেকে বেরোই, কিংবা ঘরে ডাকি মানুষকে। সারা বছর বাংলা তারিখকে ভুলে থাকি ক্ষতি নেই, কিন্তু এই একটা দিনে আমরা সবাইকে (সেই সঙ্গে নিজেদেরকেও) একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিই যে, আমরা বাঙালি! ইংরেজি তারিখ দখল করে নিয়েছে আমাদের মাইনে পাওয়ার দিনকে, আমাদের ইস্কুল-কলেজ-অফিস-কারখানা আদালতের কাজ আর ছুটির দিনকে। আমাদের বৃহৎ রাজনীতি-অর্থনীতিতে বাংলা তারিখ কোথাও নেই, খবরের কাগজের মাথায় ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা তারিখ ছাপা হলেও সেটা কারও নজরে আসে না। ছোটো আর মাঝারি ব্যবসায়ীর হালখাতা ধরে শুধু সে ঝুলে থাকে।

তবু যে এটুকু আছে, এই বা কম কী এই বিশ্বায়নের বাজারে। শুভ নববর্ষ, হে পৃথিবী। পথে বসে থাকা কৃষকেরা, কর্মহীন পরিযায়ী শ্রমিকবন্ধুরা, আরো কোটি কোটি মানুষ যারা বেঁচে আছ প্রকৃতি আর মানুষের তৈরি নানা দুর্গতি পেরিয়ে, সকলে ভালো থাকো।

ধন্যবাদ

করোনা ও লকডাউনের আবহে, *আরেক রকম*-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ আমাদের অর্থসাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এই সাহায্য *আরেক রকম*-কে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আপনাদের কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে রইলাম।

—সম্পাদকমণ্ডলী

আরেক রকম

ভাষার জন্য

মালিনী ভট্টাচার্য

বছর দুয়েকের খুকিটি এঘর ওঘর ঘুরঘুর করে বেড়ায়। প্রতিদিন একটি দুটি করে বুলি ফোটে। এখনও অবশ্য একটিও পুরো বাক্য তার আয়ত্ত্ব হয়নি। হঠাৎই একদিন উঠোনের রোদ্দুরে গায়ে তেল মাখতে মাখতে তেলের বাটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে সবিস্ময়ে বলে ওঠে– তারা তেল আর নুন কোথায় পায়! তার এই প্রথম পুরো বাক্যটি কিন্তু 'বাড়ি যাই', 'জল খাব' ধরনের ব্যবহারিকতার সীমায় বাঁধা কোনো বাক্য নয়। তাও হতেই পারত। কিন্তু বাটিতে যে বস্তুটি রয়েছে তাকেই যে 'তেল' বলে এটা সে তার উক্তির মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করল শুধু তাই নয়, তাকে জুড়তে পারল চেনা ঘুমপাড়ানি ছড়াটির সঙ্গে, যার ফলে তার জীবনের প্রথম সম্পূর্ণ বাক্যটিতেই রইল কাহিনির ব্যঞ্জনা, প্রশ্নের তীক্ষ্ণতা, কথোপকথনের ভঙ্গি।

খুকির এই 'মা নিষাদ' কোনো ব্যতিক্রমী ক্ষমতার পরিচয় নয়। এইভাবেই শিশুরা কথা শেখে সাধারণত। শুধু কথা শেখা তো নয়, এ হল উত্তরাধিকারের রত্নখনিতে তার প্রবেশ। অনেকে মনে করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত বোধহয় ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা শেখার পরে কবিতা লিখবেন বলে বাংলা শিখেছিলেন। ব্যাপারটি এত সহজ নয়। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাগুলি এবং তাঁর অমিত্রাক্ষর উভয়ই আমাকে অন্তত এই বার্তাই দেয় যে শৈশব থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পয়ারছন্দ কানে লেগে না থাকলে বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের পত্তন করা বা চতুর্দশপদীতে যতি ও মিলের ঋদ্ধ বৈচিত্র্য আনা কারো পক্ষে সম্ভব হত না। ছোটোবেলায় যা শুনেছিলেন বা পড়েছিলেন, পরে কিছুটা বা ভোলার চেষ্টা করেছিলেন, আবার সেই উত্তরাধিকারে ফিরে গিয়েই পয়ারছন্দকে ভেঙে গড়ে অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি। আমি বলতে চাইছি, বহু ভাষায় পণ্ডিত হয়েও মধুসূদনের প্রথম ভাষা ছিল বাংলাই। তাঁর ব্যঙ্গ-নাটকে যে কথোপকথনের ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তাতেও একথাই প্রমাণিত হয়।

পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার মধ্যে না গিয়েও একটু মনে করার চেষ্টা করি বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বাধীনতার ঠিক পরের সময়টাতে কীভাবে ভাষা শেখা হত। আমার যে ভাষায় প্রথম কথা বলা তা হল ঢাকা জেলার আঞ্চলিক ভাষা, আমার বাবা-মা আমৃত্যু সেই ভাষাতেই বাড়িতে কথা বলেছেন। আমাদের প্রজন্ম যে কবে তথাকথিত 'কলকাত্তিয়া' ভাষার ব্যবহার শুরু করেছে তা খুব পরিষ্কার মনে না থাকলেও কলকাতায় বসবাস শুরু করার পর থেকে ভাষার পরিবেশে কিছু বদল তো ঘটেইছিল, পারিবারিক পরিপার্শ্বে দু-রকম ভাষা থাকা সত্ত্বেও একটির প্রাধান্য এমনি এমনি আসেনি, নানাবিধ চাপের কারণেই 'কলকাত্তিয়া'-তে 'উন্নীত' হয়েছি সন্দেহ নেই। অনেক পরে যখন পশ্চিমবঙ্গের জেলায় ঘোরার সুযোগ হল, মুর্শিদাবাদী কথ্য বাংলার মধুর টানটি কান জুড়িয়ে দিয়েছিল; এই জেলার মানুষকে আবার অনেকদিন শহরে থাকতে থাকতে একই ধরনের মজবুরির ফলে কথার টানটি খোয়াতেও দেখেছি। একসময়ে এমনই মজবুরির গণতান্ত্রিক সংশোধনের জন্য বিবিসি-তে নিয়ম করা হয়েছিল সংবাদপাঠকেরা 'কুইনস ইংলিশ'-এ আবদ্ধ থাকবেন না, যাঁর যাঁর আঞ্চলিক টান বজায় রেখেই সংবাদপাঠ করবেন। দ্রুত নগরায়ণের দুরমুশে অঞ্চলসমূহে সেই বাগ্‌ভঙ্গি যখন পিছু হটছে, তখনও বিবিসি-র সংবাদে তার রেশগুলি থেকে গেছে।

যাহোক, এক বাংলার থেকে যখন আরেক বাংলার দিকে পাশ ফিরছি তখন আরো অনেকগুলি জিনিষ ঘটছিল যা ছিল ভাষাশিক্ষার সহায়ক। প্রথমত দাদুদিদা মাসিপিসিকাকা যাঁদের মধ্যে বড়ো হওয়া তাঁরা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, গান বা ছড়া শুনিয়েছেন, গল্পের ঝুলি খুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। বড়োদের সঙ্গে বাক্যালাপ কখনোই 'খেয়ে নাও' আর 'পড়তে বসো'-তে সীমিত ছিল না, প্রশ্নের উত্তর দেবার অনেক মানুষ ছিল, ছিল গল্পের বই পড়ে শোনানোর, রাতের আকাশে তারা চেনানোর লোক। ছোটো ভাইবোনদের ঢের গল্প শুনিয়েছি আমিও। শহুরে শিক্ষিত সমাজে নিশ্চয়ই এর কিছু বিশিষ্ট রূপ ছিল, কিন্তু গ্রামের নিরক্ষর পরিবারেও একটি শিশু তার পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে এই উপায়ে ভাষাশেখার কোনো উপাদান পেত না তা নয়। আমাদের তুলনায় এই শিশুরা যে-জায়গা থেকে বঞ্চিত ছিল তা হল বইয়ের জগৎ। সদ্যোস্বাধীন

দেশে তাদের জন্য অক্ষরপরিচয়ের দুনিয়ায় পৌঁছোনোর রাস্তার প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু রাস্তা তখনও তৈরি হয়নি। আমরা কিন্তু অক্ষরপরিচয় শুরু হবার আগে থেকেই অজস্র বই হাতে পেয়েছি, উলটেপালটে দেখেছি, পড়তে শিখে ঊর্ধ্বশ্বাসে সবকিছু গোগ্রাসে গিলেছি। 'পাঠ্যবই' পড়ার বিশেষ প্রশিক্ষণ সে তো অনেক পরের কথা।

আমি আট বছর বয়সে যে ক্লাসে ভর্তি হবার দাবি নিয়ে প্রথম স্কুলে গেলাম, দেখা গেল তার মাপকাঠিতে শুধু বাংলা ও অংক জানলে চলবে না, একটু ইংরেজি লিখতে পড়তেও জানা চাই। কড়ামেজাজের প্রিন্সিপ্যাল আনকোরা আমাকে নিতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন, আমার একমাত্র গৃহশিক্ষিকা আমার মায়ের বিশেষ অনুরোধেই পরীক্ষায় বসতে দিতে রাজি হন। তবে পরীক্ষা কাকে বলে তার কোনো ধারণা না থাকলেও উৎরোতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কী করে এটা সম্ভব হল? আমাকে কখনোই চেপে ধরে ইংরেজি শেখানো হয়নি, বাড়িতে কাউকে ইংরেজিতে কথাও বলতে শুনিনি কস্মিনকালে, কেউ বলেনি বাংলা বই না পড়ে ইংরেজি পড়্। কিন্তু অভিভাবকেরা ইংরেজি জানতেন, বাড়িতে ইংরেজি বই ছিল, ছিল কিছু ছোটোদের বইও, একটি ইংরেজি খবরের কাগজ আসত, সেভাবে বাংলা হরফের পরেই ইংরেজি হরফের সঙ্গে পরিচিতি হয় কিছুটা। ইংরেজি বুলি জানতাম না। কিন্তু বানান করে করে শব্দ বা বাক্য পড়তে পারতাম; বাংলা কিছুটা সড়গড় হবার পরে আরো বই পড়ার লোভেই ইংরেজি পড়া এবং লেখা আয়ত্ত্ব করা। আবারও বলি, ছোটোরা এভাবেই শেখে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সাঁওতাল শিশু বাড়িতে নিজের ভাষার পাশাপাশি সাধারণত আশেপাশে বাংলা ভাষাও শোনে, প্রথম ভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষাটিতেও তাই সহজেই কথা বলে, তাকে জোর করে না শেখালেও। তার পক্ষে পড়তে এবং লিখতে শেখাটা যদিও অন্য ব্যাপার। আমার প্রতিষ্ঠানবহির্ভূত ইংরেজি পড়া ও লেখা শেখার সঙ্গে তার এটুকু মিল আছে যে আমারও ইংরেজির সঙ্গে প্রাথমিক মোলাকাতের সুযোগ পরিপার্শ্বের কারণেই। তবু, সাঁওতাল শিশুর যেমন সাঁওতালি ভাষা আমার তেমন প্রথম ভাষা বাংলা, বাংলা, বাংলা। সে রক্ষাকবচই খেলাচ্ছলেও ইংরেজিতে হাত-পাকাতে শিখিয়েছে।

কথাটা এইজন্য বলতে হল যে ক-দিন আগে নাতনিসম্পর্কীয়া এক ছোটো মেয়ের বাংলা আবৃত্তি শুনে তার অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখন তো সে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ছে, তাহলে বাংলাভাষার সঙ্গে যোগাযোগটা কি এখনও আছে? তিনি জবাব দিলেন, অবশ্যই আছে, স্কুলের পাঠ্যবইতে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল সবই আছে, বাংলা 'সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ' হলেও ওরা স্কুলে ভালই শেখায়। এই শিশুটিও কিন্তু আমাদেরই মতো প্রথম কথা বলেছে বাংলাভাষাতেই। স্কুলের পরিকাঠামোর মধ্যে এই জন্মগত সত্যটা বেমালুম নাকচ হয়ে গিয়ে বাংলা কীকরে তার 'দ্বিতীয় ভাষা' হয়ে গেল এটা আমার কাছে বোধগম্য নয়। ধরে নিলাম সে স্কুলে বাংলা ভালই শেখানো হয়; কিন্তু প্রথম ভাষা তো শুধু স্কুলপাঠ্যের ভাষা নয়, তার উপস্থিতি তো আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে, প্রথম ভাষা আমার সত্তার অংশ। সেই উপস্থিতি আমার দৈনন্দিন জীবন থেকে যদি উবেই গিয়ে থাকে, তাহলেও ইংরেজি তার বদলে আমার প্রথম ভাষা হয় কী করে? হতে পারে তা আমার বৃত্তিগত ভাষা, অন্য অনেক মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদানে আমার সঙ্গী। কিন্তু সেকারণে কি তাকে প্রথম ভাষা বলা যায়? পাগলা দাশু ভালো করে ইংরেজি শিখবে বলে পাৎলুন পরে স্কুলে এসেছিল। কিন্তু ইউরোপে বা চীন-জাপানে ভালো করে ইংরেজি শিখবে বলে কাউকে কি বলতে হয়, ইংরেজিই আমার প্রথম ভাষা!

আমরা যারা এই মিথ্যাচারকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজিকেই আমার শিশুর 'প্রথম ভাষা' বলে ঘোষণা করছি আসলে শিশুর 'প্রথম ভাষা'টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি। যেখানে তার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার ছিল সেখানে প্রবেশের দরজাটি বন্ধ করে দিচ্ছি। এতে তার ব্যবহারিক জীবনে হয়তো কোনো চোট্ লাগবে না, তার সামূহিক জীবনও সে হয়তো এমন পর্যায়ে নির্বাহ করবে যেখানে এর অভাব সে বোধ করবে না, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত হবার সময়ে চারিদিক থেকে সে যতো অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ করতে পারে জীবনের নানা সংকটের মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে তা তাকে ততোটাই সাহায্য করে। অনেক দাম দিয়ে আমরা একটি শিশুকে ভাষাশেখার যে কারখানায় ঢোকাচ্ছি, সেখানে প্রথম থেকেই কি সে এমন এক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না যা খুব সহজেই তার হতে পারত?

শুধু প্রথম ভাষাই নয়, আমাদের দেশের বহুভাষিক পরিস্থিতিই আমাদের এক সম্পদ। শিক্ষার যে সার্বজনীন ব্যবস্থা স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এর স্বীকৃতি একেবারেই কি ছিল না? বহুবিতর্কিত 'ত্রিভাষা-সূত্রে'র প্রথম প্রবক্তারা কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর 'প্রথম ভাষা'-কে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তিনটি ভাষা কী হবে তা নিয়ে বাঁধাবাঁধি না করে কিছু বাস্তব পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তিনটিরও বেশি ভাষা শেখার সুযোগ রাখার প্রস্তাব রেখেছিলেন স্কুলস্তরে। একবারে তিনটি ভাষা শেখা নয়, প্রথম ভাষাটিতে দুরুস্ত হয়েই ধাপে ধাপে অন্য ভাষা শেখা। আমাদের এটা বুঝতে বেশ খানিকটা সময় গেছে যে অনেক অঞ্চলে সর্বাধিক ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও কিছু ভাষা রয়েছে যাতে মানুষ কথা বলে, এমনকী কোনো লিপিও হয়তো ব্যবহার করে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তার জন্য পরিসর রেখেই ভাষাশিক্ষার পরের ধাপে যাওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। একটি ভাষাকে অন্য ভাষা শেখার

সহায়ক না ভেবে যে-ভাষার যতো দাপট তাকে শিক্ষায় ততো প্রাধান্য দেবার নীতি ভাষায় ভাষায় বিরোধ ও সংকীর্ণতার জন্ম দিয়েছে। এরই প্রভাবে দেশের কর্তারা পরবর্তী সময়ে উৎকৃষ্ট স্কুলের মডেল হিসাবে যখন 'কেন্দ্রীয় স্কুল'-এর পরিকল্পনা নিলেন তখন সেখানে নানাবিধ ভাষাকে জায়গা দেবার বদলে হিন্দি এবং ইংরেজি মাধ্যমেরই একচ্ছত্র দাপট জারি করলেন।

আসলে সেই সময় থেকে পর পর অনেকগুলো দশক জুড়ে ভাষাশিক্ষার গুরুত্বও স্কুলশিক্ষায় হ্রাস পেয়েছে। শিশু ভাষা শিখবে এবং তা ব্যবহার করার অভিনব উপায় নিজের জোরেই আবিষ্কার করতে থাকবে, এই অভিমুখটি লোপ পেয়ে তার ভাষাজ্ঞানের সুবাদে সে কতটুকু ব্যবহৃত হতে পারবে সেটাই হয়ে উঠেছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ইংরেজিশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পড়া এবং লেখার তুলনায় বলতে পারার কৃতিত্বই অগ্রাধিকার পাচ্ছে, এমনকী ইংরেজিশিক্ষার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাষাবিশেষজ্ঞরা বারংবার বলেন, শিশু প্রথম ভাষা শেখে পরিপার্শ্ব থেকে আহরণ করে, সেই পরিপার্শ্বে একাধিক ভাষা থাকলেও শুনে শুনেই নানা বুলি সে আয়ত্ত্ব করে। যে ভাষা আদৌ শিশুর পরিপার্শ্বে নেই, তা আহরণ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব, সেটা তাকে 'শিখতে' হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসাবে, তা অসম্ভবও নয়। কিন্তু এই 'ভাষাশেখা'র ব্যাপারটি আসে পরে, এমনকী প্রথম যে ভাষাটিতে সে কথা বলে সেটিও আয়ত্ত্ব করতে হলে তার সামগ্রিক কাঠামো, তার ব্যাকরণ ও বাক্যবন্ধ সম্বন্ধে ধারণা তাকে শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়। মুখের বুলিকে সে হরফে রূপান্তরিত করতে শেখে, হরফ চিনতে শেখে। আবার ভাষাজ্ঞানের বুনিয়াদকে অবলম্বন করেই ভূগোল, ইতিহাস, জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষার প্রাঙ্গণে পড়ুয়া প্রবেশাধিকার পায়, এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে। সেই বুনিয়াদ যদি সংকীর্ণ ও নড়বড়ে হয় তাহলে জ্ঞানের পরিসর কি বাড়ানো সম্ভব?

ভাষার ব্যবহারিক দিকটি অগ্রাহ্য করার কথা বলছি না। ভাষার সাধারণ ভিত্তিগঠনের ওপর জোর না দিয়ে ভাষাশিক্ষাকে ব্যবহারিকতার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিলে সেই সংকীর্ণতর লক্ষ্যেও কিন্তু পৌঁছোনো কঠিন। বিশেষ, যে-ভাষা পড়ুয়ার হাতের কাছে ছিল তাকে অবহেলা করে যদি তার অপরিচিত ভাষার আঙিনায় একটি কৃত্রিম পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ লক্ষ্যপূরণে তাকে বাধ্য করা হয়। বিকল্প পথ নিশ্চয়ই ছিল। তার সূত্রপাত হতে পারত এই অভিমুখ থেকে যে সরকারি ব্যবস্থায় তৈরি স্কুলগুলিই হবে দেশের সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে আদৃত স্কুল, সেখানে সবচেয়ে বঞ্চিত শ্রেণির শিশুদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা হবে সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ তাদের পরিবার-পরিপার্শ্ব থেকে অনেকগুলি জিনিষ তাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। শিশুর প্রথম ভাষা প্রধান আঞ্চলিক ভাষা থেকে আলাদা হলেও তার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ প্রাথমিক স্তরে সে পাবে। প্রধান আঞ্চলিক ভাষাও গোড়ায় সে শিখবে প্রথম ভাষার মাধ্যমেই। তা থেকে তাকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। কতটা সে শিখল তার ওপর নির্ভর করেই ধাপে ধাপে আসবে অন্য এক বা একাধিক ভাষা, যার গোড়াপত্তন প্রাথমিক স্তরে না হলেও চলবে। যে ভাষা সে শিখছে সেভাষায় পাঠ্য ছাড়াও যথেষ্ট বই এবং অন্য সরঞ্জামের জোগান চাই স্কুলেই। দরকার যে ভাষা পড়ুয়া শিখছে সেভাষায় শুধু বই পড়াই নয়, লেখাতেও হাত মক্‌শো করা।

গত কয়েক দশক ধরে আমরা যে ঠিক এর উলটোপথে চলেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যার ফলে যে শিশুরা পরিবার থেকে সহায়তা পাচ্ছে তাদেরও ভাষাশিক্ষায় গুরুতর ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, যাদের সে সহায়তা নেই তাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। এর ফলে যখন তারা কলেজে উঠছে তখন দেখা যাচ্ছে ইংরেজিতে তো বটেই, বাংলাতেও তাদের পক্ষে একটি বই পড়ে বোঝা বা যেকোনো বিষয়ে শুদ্ধ করে দু-পাতা লেখা অতি কঠিন। আবারও বলছি, যারা অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ থেকে এসেছে একথা তাদের ক্ষেত্রেও খাটে। অশুদ্ধ বানানের বাড়বাড়ন্ত থেকে বোঝা যায় ভাষাশিক্ষায় লেখা এবং বইপড়ার যে ভূমিকা থাকে তা এখন খুবই গৌণ। অনেকে বলেন, ভাষাশিক্ষার বর্তমান দৈন্যের বড়ো কারণ শিশুকাল থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অনুশাসনে চলে যাওয়া, গুগল-নির্ভরতা এবং চলমান 'স্ক্রিনে'র ভাষার নেশায় পড়া। একথা আংশিকভাবে মানলেও এগুলি আমার মতে রোগের কারণ নয়, লক্ষণমাত্র। সঠিকভাবে ভাষা শেখার পরে যে পড়ুয়া বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দিকে যায়, তার পক্ষে জ্ঞানচর্চার সহায়কই হয় নতুন প্রযুক্তি, তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করে না। যাঁরা 'অনলাইন' শিক্ষার প্রবক্তা, প্রযুক্তি নিয়ে আবেগে ভেসে তাঁরা ভুলে যান, শিক্ষায় ভাষার যে জীবন্ত এবং ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন মানবিক সংযোগের জন্য, 'অনলাইন'-এ তার খুব সামান্য অংশকেই আনা সম্ভব। প্রথম ভাষা থেকে শুরু করেছিলাম, কিন্তু আসল কথা ভাষা শেখার বুনিয়াদি সম্ভাবনাই আজ বিপন্ন।

২০২০ সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি অতিমারীর আড়ালে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল তার মধ্যে ভাষাশিক্ষার গত কয়েক দশকে শুরু হওয়া অন্তর্জলিযাত্রা সম্পূর্ণ হতে চলেছে। শিশুর মধ্যে ভাষাশেখার যে প্রাথমিক ক্ষমতা থাকে– যার ফলে কখনো একাধিক ভাষার বুলিও তার মুখে শোনা যায়–তার নাম করে সেই ক্ষমতার ওপরেই আঘাত হানার বন্দোবস্ত পাকা করা হয়েছে এই দলিলটিতে। শিশুকে তিন বছর থেকেই 'স্কুল-অভিমুখী' করতে হবে এই অজুহাতে যে সময়ে শিশু তার পরিবার ও পরিবেশকে হেসেখেলে চেনে ভাষা চেনার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের ওপরেই থাবা বসাতে চাইছে এই শিক্ষানীতি। এতদিন

প্রাক্-স্কুল পুষ্টি ও শিক্ষার সহায়ক যে অঙ্গনওয়ারি/বালওয়ারি কেন্দ্রগুলি ছিল সেগুলিকে আরো মজবুত করার বদলে তাদের স্কুল-শৃংখলারই অন্তর্ভুক্ত করে ফেলার ব্যবস্থা হচ্ছে। নিজের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর 'স্বাভাবিক বহুভাষিকতা'-র সুযোগ নিতে তাকে 'চুবিয়ে' রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে একই সঙ্গে একাধিক ভাষার পরিমণ্ডলে। কোন্ কোন্ ভাষা তা যদিও দলিলে স্পষ্ট নয়, তবু প্রধান আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও হিন্দি ইংরেজি দুই-ই থাকবে অনুমান করা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণিতে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখ আশঙ্কা জাগায় তিনবছরের পড়ুয়াকে শিবস্তোত্র চণ্ডীপাঠ সবই শিখতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্রাক্-স্কুল পর্ব পেরিয়ে যখন সে দ্বিতীয়শ্রেণিতে পৌঁছোবে তখন নাকি অন্তত তিনটি ভাষায় পড়া এবং লেখা সে আয়ত্ত্ব করে ফেলবে। মগজধোলাইয়ের বীভৎসতা আর কতো দূর যেতে পারে!

এই শিশুমেধের ব্যবস্থায় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েরা হয়তো উল্লসিতই হবেন। শ্রেণিদ্বেষের স্বাভাবিক নিয়মে দূর গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র দলিত বা আদিবাসী শিশু কী শিখছে তা নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নন। আর এই ব্যবস্থায় যা শেখানো হবে তাঁদের ঘরের শিশুরা তা ভালো করেই শিখতে পারবে, না পারলে বহুমূল্য টুইশনের গজাল মেরে তা তাদের মগজে গোঁজা হবে। কিছু না শিখলেও শেষপর্যন্ত দুনিয়াদারির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অন্য ঢের অবলম্বন পাবে তারা। যদি প্রশ্ন করেন এত কাঠখড় পুড়িয়ে তবে কী শেখা হল, তাহলে নয়া শিক্ষানীতির দলিলে উচ্চশিক্ষার অংশে তার জবাব পেয়ে যাবেন। তার ভাষাশিক্ষার বুনিয়াদ যেমন বুলিশেখার ব্যবস্থায় পর্যবসিত হচ্ছে, তেমনই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার কোনো বিশেষ বিভাগে গভীর অধ্যয়নের সুযোগ না রেখে তার সামনে সাজানো থাকছে খণ্ডবিখণ্ড 'মেড-ইজি' আকর্ষণীয় 'কোর্সে'-র পশরা, কেউ কম কেউ বেশি 'কোর্সে' বাজিমাৎ করে আর্থিক সামর্থ্যমতো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা নিয়ে দুনিয়াজোড়া শ্রমের বাজারে জায়গা খোঁজার চেষ্টা করবে। তবে বুলিশেখার পর্যায়টাতেই শহরগ্রামের অনেক দরিদ্র শিশুর দম ফুরিয়ে যাবে, উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত তাদের ওঠারই ক্ষমতা থাকবে না।

ভাষাশিক্ষাকে নতুন বিধানের নিগড় পরিয়ে এযাত্রা সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের দিকে, বর্তমানে যার খোলাখুলি লক্ষ্য এক দেশ, এক ধর্মের সঙ্গে এক ভাষাও, যার মানে আসলে অধিকাংশের ভাষাহীনতা। স্পষ্টই বলা হচ্ছে এতে 'রাজনীতিটা কম হবে' অর্থাৎ একটাই রাজনীতি চলবে। মুশকিল এই যে এখনও সোচ্চার শ্রেণির মধ্য থেকে এসম্বন্ধে প্রতিবাদ খুবই ক্ষীণ। এমনকী, কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তিও মনে করেন, একুশশতকী বিশ্বায়িত আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হবার এটাই একমাত্র রাস্তা। এই বিপদ থেকেই আজ বেড়ে উঠছে এমন এক প্রজন্ম যারা মতদ্বৈধের ভাষা, প্রতর্কের ভাষা আদৌ শেখারই সুযোগ পাচ্ছে না। যাদের শিক্ষার মধ্যে চিন্তার বিকাশের কোনো জায়গা নেই। এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ধারণায় মুখস্থবিদ্যা বা পুঁথিপড়া বিদ্যার প্রাধান্য ছিল না তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা, ব্রিটিশের অবহেলাসত্ত্বেও পরাধীন দেশে গড়ে-ওঠা দেশীয় জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য, স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট এই সবকিছুর পটভূমিতে স্বাধীনচিন্তার আদর্শের অন্তত কিছুটা পরিসর ছিল। আজ ভাষাশিক্ষাকে মেরে স্বাধীনচিন্তার বিনাশই আদর্শহিসাবে শিলমোহর পেয়ে গেছে।

এই সময়পর্বের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এর নিবিড় যোগ নিয়ে আলোচনা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রথম ভাষা এবং ভাষাশিক্ষায় তার গুরুত্ব– আমার আলোচনার মূলসূত্র এটাই। নয়া শিক্ষানীতির প্রথম খসড়ায় যখন সারাদেশে হিন্দি বাধ্যতামূলক করার কথা উঠল, দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে, বিশেষত তামিলনাড়ু থেকে তার কিছু প্রতিবাদ হয়েছিল, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না এই আওয়াজ তোলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিন্তু তখন প্রতিবাদের কণ্ঠ তেমন শোনা যায়নি। সম্প্রতি কলকাতার কেন্দ্রশাসিত একটি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি চিঠিপত্রে হিন্দি ব্যবহারের ফতোয়া দিয়ে যখন নির্দেশ আসে স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার কর্মীরা প্রতিবাদ করেন বিকল্পে ইংরেজি ব্যবহারের দাবি নিয়ে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানসাধনার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য থাকাসত্ত্বেও কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার জন্য কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরের প্রশ্ন কেউ তোলেননি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভাষাহিসাবে বাংলার স্থান আজ কোথায় সেই প্রশ্ন তাই এড়ানো যাচ্ছে না। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার সময়ে বহুবিধ অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিশ্চয়ই পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনকে তীব্রতর করেছিল। কিন্তু এতে তো সন্দেহ নেই যে বাংলাভাষারই নামে মানুষ প্রাণ দিতেও রাজি ছিলেন। ভারতের পরিস্থিতি তার সঙ্গে তুলনীয় নয়, তবু সরকারের ভাষানীতি যখন ভাষা-ফ্যাসিবাদের দিকে যায়, তখন কোনো আঞ্চলিক ভাষা যার প্রথম ভাষা সে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় মরীয়া হয়ে ওঠে, প্রতিবাদ করে। কিন্তু প্রথম ভাষা নিয়ে যার কোনো নিজস্বতাবোধ তৈরি হয়নি, কার্যত যার প্রথম ভাষা নেই, যে বাংলাভাষী শিশুর নথিপত্রে প্রথম ভাষা ইংরেজি, তার তো এই দমবন্ধের অনুভূতিটাই হবে না। দখলদারি মানতে তার অসুবিধাও হবে না। হিন্দির একাধিপত্যের বিরুদ্ধে তামিল বা মলয়ালম ভাষার সপক্ষে বলার লোক পাওয়া যাবে, এমনকী হিন্দির বিরুদ্ধে ইংরেজির পক্ষ নিয়েও বলার লোক পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলাভাষার সপক্ষে বলার লোক নতুন প্রজন্মের মধ্যে খুঁজতে এবার বোধহয় দিনের বেলাই আলো হাতে বেরোনো দরকার।

একত্বের সন্ধান

সৌরীন ভট্টাচার্য

কম্পারেটিভ লিটেরেচার এসোসিয়েশন অব্ ইন্ডিয়া (ক্লাই)-এর এই আমন্ত্রণে আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি। আমাদের প্রয়াত বন্ধু স্বপন মজুমদারের স্মৃতিতে এই স্মারক বক্তৃতাটির আয়োজন। স্বপন ছিল এই ক্লাই সংগঠনটির খুব আপনজন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে এই সংগঠনের তেমন কোনো সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ হয়নি কখনো। তবুও স্বপন এবং আমার আরো অন্য বন্ধুদের মারফত এই সংগঠন বিষয়ে আমি জানি। কিন্তু ভাবিনি যে এরকম একটা বক্তৃতায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। স্বপন অবশ্যই আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। এবং ক্লাই-এর অনেকের সঙ্গেই আমার সে রকম বন্ধুতার সম্পর্ক আছে। তবুও অধ্যাপক তপতী মুখোপাধ্যায় যখন আমাকে টেলিফোন করলেন তখন আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। বিশেষত এই প্রথম বারের বক্তৃতার দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত হওয়া আমার পক্ষে আরো বেশি সম্মানের।

তপতীর অনুরোধে আমি প্রায় এক কথায় রাজি হয়ে যাই। ব্যাপারটা তো স্বপনকে নিয়ে। স্বপনের কোনো বিষয়ে আমার কোনো ওজর আপত্তি কখনো টেঁকেনি। স্বপন থাকতে যা হয়নি তা আজ স্বপন নেই বলে হবে কেন। কাজেই আমি কোনো অজুহাত দেবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু রাজি হয়ে যাবার পরে সমস্যা হল কী নিয়ে কী বলা যায় তা সাব্যস্ত করা। ওঁরা কোনো বিষয় ঠিক করে দেননি, সেটা ওঁদের সৌজন্য। কিন্তু আমাকেও তো ভাবতে হবে। এমন বিষয় চাই যাতে স্বপনের আগ্রহ হবে, আবার ক্লাইয়ের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদেরও অন্তত কিছু উৎসাহ থাকবে। ভেবে চিন্তে মনে হল একত্বের ধারণা নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে। ভারতীয় সাহিত্যের চালচিত্রে একত্বের ধারণার গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

একটা পুরোনো বিতর্কের কথা মনে এল। সাহিত্য অকাদেমির আশেপাশে একটা কথা অনেকদিন ধরে শোনা যায়। ভারতীয় সাহিত্য একই, যদিও তা লেখা হয় বিভিন্ন ভাষায়। 'Indian Literature is one, though written in many languages'. এই যে বহু ভাষায় লিখিত এক ভারতীয় সাহিত্যের ধারণা, এটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই অনেক কথাবার্তা হয়। যদিও এরকম কোনো ধারণা ঠিক আনুষ্ঠানিকভাবে কোনোদিন সাহিত্য অকাদেমিতে আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। সম্ভবত হয়নি। কথাটা বোধহয় বলেছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। সম্ভবত ১৯৫৪ সালে অকাদেমির জেনারেল কাউন্সিলের প্রথম সভায়। প্রকৃত ঘটনা যাই হোক, এরকম একটা ধারণা ভারতীয় সাহিত্যের চরিত্র নির্ধারণে আমাদের মনে অনেকদিন ধরে জায়গা করে নিয়েছে। এ কথার তথ্য চরিত্র যাই হোক না কেন, কথাটার মর্মার্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। দেশ স্বাধীন হবার পরে প্রথম দশক তখনও শেষ হয়নি। নতুন একটা জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আমাদের সবার চেষ্টায়, সবার চোখের উপরে। সুপ্তোত্থিতের মতো ঘুম-ভাঙা চোখে তখন সবকিছু দেখছি আমরা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুধু সাহিত্য অকাদেমি নয়, আরো সব প্রতিষ্ঠানের জন্ম হচ্ছে একই সময়ে। ললিত কলা অকাদেমি, সংগীত নাটক অকাদেমি। নতুন জাতিরাষ্ট্রের তেজিয়ান সাংস্কৃতিক চেহারা চাই। এই সবই তার প্রকাশ। এরকম একটা জাতীয় মুহূর্তে এক ভারতের এক সাংস্কৃতিক বন্ধনের স্বপ্ন দেখা খুব অস্বাভাবিক কিছু না। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে সংস্কৃতির সম্ভার সাজানো। রাষ্ট্রীয় কণ্ঠস্বর যে তার মধ্যে অন্তত অস্ফুটভাবে ধরা পড়বে তাতেও খুব আশ্চর্যের কিছু নেই। জাতিসূত্রে একটা রাষ্ট্রের কল্পনা করতে গেলে জাতিত্বের ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবেই। জাতিকে আমরা ঠিক কোন স্তরে খুঁজে পাব। ভাষাভিত্তিক সাহিত্যের ধারণার কথা ভাবতে গেলেই উঠে পড়বে এইসব প্রশ্ন। সাহিত্য কি শুধুমাত্র ভাষার গণ্ডিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। তা ছাড়াও ভাষা তো শুধুমাত্র অন্বয়ের স্তরে খুঁজে কোনো লাভ নেই। আর সাহিত্যও শুধু কেবল অন্বয়ের সাহায্যে রচিত হয় না। ভাষা কোন পরিবেশে কীভাবে কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কে বা কারা কখন বলছে তার উপরে নির্ভর করে তার মূর্ত প্রায়োগিক চেহারা। ভাষার চেহারা অবশ্যই নির্ধারিত হয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের যাপিত জীবনের আদল দিয়ে। আর সাহিত্য সেই মূর্ত

যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমাদের মূর্ত জীবনের বহুস্বর। তা কোনো একমেবাদ্বিতীয়মের মন্ত্রে ধরা দেবে কেন। আর ভারতের মতো এত ভাষাগোষ্ঠীর একটা দেশের মূর্ত জীবনযাপনের যে বহুস্বরিক ঐশ্বর্য তার সব রঙ রূপ ও রস ধরে দেবার জন্য একত্বের যেকোনো ধারণাই আমরা নিই না কেন তা মাপে খাটো হয়ে যাবার বিপদ আছে। তাই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর জীবনকে ছুঁতে চাইলে আমাদের মনোজগতে সাংস্কৃতিক ও আনুষঙ্গিক মানসিক মানচিত্রের ভিন্নতার জন্য জায়গা তৈরি রাখতে শিখতে হবে। ভারতের জাতীয় জীবনের নাবিককে বহুত্বকে স্বাগত জানাবার ভাষা আয়ত্ত করতে হবে। কারণ আমাদের জাতীয় জীবন কোনো একটা নদীখাতে বয়ে চলে না, বহু শাখানদী ও উপনদীতে বহতা এই জীবনের স্রোত। মাঝে মাঝে এরকম ভাবনা মাথা চাড়া দেয় বটে যে, আমাদের সব নদীগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক খাতে বইয়ে দিতে পারলে বেশ হত। ইতিহাস ভূগোলের সবকিছুকে ওরকম এক হাতের মুঠোতে নেবার সাবলীল ভাবনায় সুকুমার রায়ের ষষ্ঠীচরণের কথা মনে এসে যেতে পারে। তিনি হাতি লুফতেন যখন তখন।

ভারতীয় থিয়েটারের ক্ষেত্রেও একটা অনুরূপ চেহারা বর্তমান। আমি যে হঠাৎ থিয়েটারের কথা তুলছি তার কারণ আজ আমরা স্বপনের স্মৃতি মনে নিয়ে কথাবার্তা বলছি। স্বপনের বন্ধু ও সহকর্মীরা সবাই জানতেন যে, স্বপন ভারতীয় থিয়েটারের ক্ষেত্রেও সমান উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে জড়িত ছিল। গিরিশ কারনাডের নাগমণ্ডলম তো সে নিজেই বাংলায় তরজমা করেছিল। আরো অন্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সে বাংলায় ভারতীয় নাটকের এক অনুবাদ গ্রন্থমালা সিরিজ পরিকল্পনা করে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল। এ ছাড়া বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর তরফে সে দুটো খুব জরুরি কাজ করেছিল। বহুরূপীর প্রথম চল্লিশ বছরের ইতিহাস রচনা করেছিল স্বপন। আর সুদৃশ্য আর্ট পেপারে ছাপা ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে সাজানো বহুরূপীর এক ছবির আলবাম তৈরি হয়েছিল স্বপনের নির্দেশনায় ও তদারকিতে। এ ছাড়াও নাটকের ক্ষেত্রে স্বপনের আরো কাজ আছে। সুবীর রায়চৌধুরির সঙ্গে মিলে সে রচনা করেছিল স্বদেশি যাত্রা থেকে বিলেতি থিয়েটারের যাত্রাপথের ইতিবৃত্ত। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে যে কারণে আমি নাটকের জগতের কথায় এলাম তা এই যে, শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে বহুরূপী প্রতিষ্ঠানের একটা অত্যন্ত যত্নে লালিত নাট্যাদর্শের বয়ান ছিল, 'এক সৎ ভারতীয় থিয়েটারের সন্ধানে'। ওই গোষ্ঠীর কাজকর্মের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সবাই জানেন এই স্লোগান, 'In search of an honest Indian theatre'। শম্ভু মিত্র ও তাঁর পরিচালনাধীন বহুরূপীতে একভাবে এই আদর্শের চর্চা হত। পরবর্তী কালেও প্রতিষ্ঠান হয়তো সেই আদর্শ নিজেদের বোধ অনুসারে পালন করার চেষ্টা করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই 'সৎ ভারতীয় নাট্যাদর্শ' নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। শম্ভু মিত্রের কল্পনায় সম্ভবত ছিল ভারতের এমন এক নাট্যাদর্শ, যা আমাদের নাটককে আধুনিক মানুষের চোখ দিয়ে দেখা আধুনিক মানুষের কথা বলার এক ভারতীয় ধরন বলে চিনে নিতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ আধুনিক জীবনের এক ভারতীয় রূপকল্প। সে সন্ধানে সেই বহুরূপী খুব বড়ো করে হাত বাড়িয়েছিলেন রবীন্দ্র নাটকের দিকে। এমন নাটক তৈরি করার চেষ্টা চলল যার মর্মকথা আধুনিক কালের, আধুনিক মনোভঙ্গিতে বলা, কিন্তু যার নাট্যরূপ ভারতের। যে-মন এই নাট্যসংকল্পে স্থিত হবে তার মননের আধুনিকতা বড়ো জিনিস।

এ আদর্শ নিয়ে তীক্ষ্ণ বিতর্ক ছিল। যথেষ্ট দ্বিধা দ্বন্দ্ব, তাও ছিল। প্রশ্ন উঠেছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের নাট্য আঙ্গিকের চল আছে যে তার মধ্যে থেকে কোনো ভারতীয়ত্বের সন্ধান বৃথা। আমাদের আছে শহুরে প্রসেনিয়ম থিয়েটার, তার সঙ্গে আছে আর একদিকে পাণ্ডবানির মতো নাট্য ঘরানা। আছে জোরালো শরীরী অভিনয়ের রীতি। আছে পালা নাটক, যাত্রাগান আর নৌটঙ্কি। আছে তৃতীয় থিয়েটার আর অঙ্গন মঞ্চ। এত বিচিত্রের মধ্যে থেকে কাকে বেছে নিয়ে কাকে বলা হবে ভারতীয়। স্পষ্টত, দেখা যাচ্ছে ভারতীয়ত্বের ধারণা বহুমাত্রিকতায় ছাড়া ধরা শক্ত। সাহিত্যের বেলায় ওই বহুমাত্রিকতার চেহারা ধরা পড়ে নানা ভাষার প্রকাশে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে যা কিছু ভারতে প্রচলিত কোনো ভাষায় রচিত তা-ই ভারতীয়। অন্তত তা ভারতীয় সাহিত্যের অংশ। ভারতীয় বলে কোনো এক ধারণার একটা নির্যাস আমার হাতে আছে, সেই সুবাদে কোনো রচনা ভারতীয়, ঠিক তা নয় ব্যাপারটা। ভারতীয় বলে কোনো কিছু একটা আছে, অথচ তা যেন বেরিয়ে যাচ্ছে হাত পিছলে। আচ্ছা আমাদের সাহিত্য অকাদেমির যে পত্রিকা আছে, ইন্ডিয়ান লিটেরেচার নামেই, ধরা যাক সে পত্রিকার কথা। যতদূর আমি জানি, সেই পত্রিকায় কোনো লেখা প্রকাশিত হতে গেলে লেখাটিকে ওইরকম ভারতীয়ত্বের নির্যাস রকমের কোনো ধারণার কষ্টিপাথরের বিচারের মুখোমুখি হতে হয় না। ভারতের কোনো ভাষার সাহিত্য নিয়ে লেখা রচনা হলেই ওই পত্রিকার আওতায় পড়ে বলে গণ্য করা হয়। তাই যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, ভারতীয় বলে যে-ধারণা আমরা ব্যবহার করছি তা আসলে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার একটা তোড়া। কোনো এক বিন্দুতে এসে মিলে যাবার সংহতিসূচক কোনো মিলনমন্ত্র আমার হাতে নেই।

একত্বের যে-দুটো ধারণা নিয়ে আমরা কথা বলেছি এতক্ষণ তাদের মধ্যে তফাত আছে। ফারকটা খেয়াল করা যাক। সাহিত্য অকাদেমির যে-ধারণা তার মধ্যে একটা অতিক্রমণের মাত্রা আছে। এখানে ভারতীয় বলতে এমন একটা কিছুর ভাবনা

আমরা ভাবছি যাতে মনে হয় যেন আমরা যা কিছু করছি বা করতে পারি, ভারত বলে একটা কিছু যেন আছে তার বাইরে। অর্থাৎ আমাদের করা বা থাকার যে-স্তর তার গণ্ডিটা যেন পেরিয়ে যেতে হচ্ছে ভারতের ধারণায় পৌঁছোতে গেলে। আমরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আমাদের সাহিত্য রচনা করে চলেছি। কিন্তু ভারতীয় চেহারা যেন আছে তার বাইরে কোথাও। এই ধারণায় ভারতীয়ত্ব যেন কোনোভাবে আমাদের ওই বিভিন্ন ভাষার চর্চার মধ্যে শরীরী চেহারা ধারণ করতে পারছে না। পক্ষান্তরে, বহুরূপীর যে-স্লোগানের কথা বলেছি, তার মধ্যে যেন ওই শরীরী চেহারা ধারণ করার সম্ভাবনা কিছু বাড়ছে। কেননা সমস্ত চর্চার প্রসঙ্গ ধরা থাকছে নাট্যকারের নিজের ভাষা-সংস্কৃতির গণ্ডিতে। বিশেষ কোনো একজন হয়তো নিজের ভাষা গণ্ডির বাইরে গিয়েও কাজ করতে পারেন। কিন্তু ওই স্লোগানের অন্তর্গত যে-ধারণা তার জন্যে তাকে নিজের ভাষা-সাংস্কৃতিক সীমা পেরিয়ে যেতে হচ্ছে না। কারণ ভারতের এই ধারণা সে নিজের চর্চার মধ্যেই শরীরে ধারণ করতে পারে। ওই ধারণ করার চেষ্টাই হতে পারে তার এক রকমের অন্বিষ্ট। এই যে ভারতীয়ত্ব শরীরে ধারণ করার কথা, এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। শেক্‌স্‌পিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা কুরোসাওয়ার থ্রোন্ অব্ ব্লাড নামের চলচ্চিত্রটির কথা ভাবা যাক। যাঁরা ছবিটা দেখেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন কোন অর্থে এই ছবিটাকে একটা জাপানি শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কুরোসাওয়া তাঁর ভাষা-সংস্কৃতির গণ্ডির মধ্যে থেকেই এ কাজটা করছেন। কোনো এক অর্থে জাপানত্বের ধারণা এই ছবির শরীরেই ধরা আছে। ওই ছবিটা বানাতে গিয়ে যে-সাংস্কৃতিক বয়ান রচনা করতে হয়েছে শিল্পীকে সেই বয়ানের মধ্যেই বোনা হয়ে গেছে ওই জাপানত্ব।

শরীরে ধারণ করার এই কথাটাকে নির্দিষ্ট উদাহরণ বাদ দিয়ে সাধারণভাবে উপস্থাপিত করতে পারলে আমাদের বোঝার দিক থেকে সুবিধা হবে। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অপ্রচলিত একটা লেখার দিকে তাকানো যাক। 'আলোচনা' নামে ওঁর একটা ছোট্ট বই আছে। নিতান্তই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের লেখা। ওঁর রচনা বৃত্তের যে-সময়টাকে আমরা প্রকৃতির প্রতিশোধ পর্ব বলে চিহ্নিত করতে পারি, এই বই মোটামুটি সেই সময়ের। আরো নির্দিষ্ট করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই লেখাগুলিকে 'ছবি ও গান' যুগের গদ্য রচনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে ছোটো ছোটো মন্তব্যের আকারে লেখা এই আলোচনা। কিছু কিছু বিষয় হিসেবে সাজানো আছে মন্তব্যগুলি। মূল বিষয় আছে মোট ছ-টা। ডুব দেওয়া, ধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রেম, কথাবার্তা, আত্মা, বৈষ্ণব কবির গান। এক একটি প্রসঙ্গ আবার ভাগ করা আছে বিভিন্ন উপপ্রসঙ্গে। এরকম উপপ্রসঙ্গ আছে মোট সাতষট্টিটি। বইয়ের আয়তন সাকুল্যে আটাশ পৃষ্ঠা। কোনো প্রসঙ্গের বিস্তার নয়, সংক্ষিপ্ত মন্তব্যই লেখকের লক্ষ্য। বইটি বিশ্বভারতী রবীন্দ্র রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহ২ -এর অন্তর্গত।

আমার আপাতত লক্ষ্য এই বইয়ের একটি আলোচ্য বিষয়। আজকের চালু কথায় বলতে গেলে সে বিষয়টাকে বলা চলে গ্লোবাল বনাম লোকাল। এক ও অনেক। গ্লোবাল এক, লোকাল অনেক। গ্লোবাল মানে যদি হয় বৈশ্বিক, তাহলে সেটা তো এক হবেই। বৈশ্বিক, সামগ্রিক, সার্বিক, এগুলো সব একের দ্যোতনা বহন করে। অন্য দিকে লোকাল বা স্থানিক, হয়তো আংশিক, এসব জাতীয় শব্দ এক একটা নির্দিষ্ট অংশকে বা স্থানিকতাকে নির্দেশ করে। তাই এইসব শব্দের সাহায্যে অনেক নির্দিষ্টতাকে নির্দেশ করা যেতে পারে। তাই বৈশ্বিক ও স্থানিক, এই দুই বিপরীতমুখী শব্দের জোড় নিয়ে কথা বলা যাক। আমাদের আলোচ্য ভারতীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ভারতীয় সাহিত্য এক, আর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত তার ভিন্ন রূপে সে অনেক। এখন প্রশ্ন এই যে, যে-বৈশ্বিকের কথা হচ্ছে তা কি ওই নির্দিষ্টতা পেরিয়ে যাওয়া অতিক্রমী ধর্ম সংবলিত কোনো ধারণা? না কি তা ওই নির্দিষ্টতার মধ্যে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে বা হয়তো সব ক্ষেত্রেই শরীরী রূপ ধারণ করে মূর্ত চেহারায় প্রকাশিত? বহুরূপীর স্লোগানের পিছনের ধারণা সম্ভবত এই যে, নিজেদের চর্চার মধ্যে সৎ প্রচেষ্টায় সেই ভারতীয়তা অর্জন করে নিজেদের শিল্প-শরীরে তা ধারণ করা। এই সম্ভাবনার কথা তাঁরা হয়তো ভাবতেন। এই ভাবনা কোনো অতিক্রমী ধারণা স্পর্শ করার অতীন্দ্রিয় ভাবনা নয়। নিজেদের জীবনযাপনের বাস্তবতার মধ্যে থেকে এক ভারতীয় বোধকে উপলব্ধি করার ব্যাপার। সমাজ অস্তিত্বের সেই উপলব্ধিজাত বোধের সঞ্চার আছে যে-শিল্পকর্মে তা-ই ভারতীয় বোধে আক্রান্ত। স্থানিক ভাষায়, স্থানিক আঙ্গিকে, স্থানিক রূপারোপে তার সপ্রাণ প্রকাশ যদি হতে পারে তাহলে বৈশ্বিকতা তারই মধ্যে মূর্ত হয়ে ধরা দেবে। আজকের বিশ্বে যে এক বৈশ্বিক টেকনোলজিকাল চেহারার মুখোমুখী আমরা সবাই তার চাপে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের থেকে স্থানিক নির্দিষ্টতা ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। বিশ্ব যেন এগিয়ে চলেছে এক লেপাপোঁছা একমাত্রিক চেহারার দিকে। অথচ এই একমাত্রিকতার মধ্যে স্থান করে নিচ্ছে হাজারো রকমের বৈষম্যজাত ন্যায়-অন্যায়ের অনাচার ও অবিচার। এই একমাত্রিকতার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো সোজাসাপ্টা সারূপ্যের আশ্রয় সন্ধান খুব কাজের কথা হবে বলে মনে হয় না। আমার নানা রকমের পরিচয় আমার শারীরিক মানসিক সামাজিক বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক হতেই পারে। কিন্তু এর যেকোনো একটা বা দুটো পরিচয়ের মধ্যে আমার সবটুকু কিছুতেই ধরা পড়ে না। ওই সবটুকু কথাটার হয়তো কোনো মানেই নেই তেমন করে।

কিন্তু একটা কথা এখান থেকে তা সত্ত্বেও বেরিয়ে আসে। আধুনিক মনের সহযোগে অস্তিত্ব ভাবনার চর্চা করে যেতে হয় নিয়মিত। আর ওই যাকে অস্তিত্ব বলছি তাও ওইভাবে ঠিক স্থির অচঞ্চল কোনো ব্যাপার নয়। নিয়ত পরিবর্তমান এক পটচিত্রের মধ্যে নিজেকে খুঁজেও নিতে হবে আবার তার গায়ে প্রয়োজনে অচেনা রঙের ছোপ পড়তেও দিতে হবে। সদাজাগ্রত মন ছাড়া চৈতন্যময় মানুষের হাতে আর কী আছে। নতুন কোনো বোধের দিগন্ত আমরা সেভাবেই ছুঁতে পারি।

বিশ্ববোধ বা ভারতবোধের মতো কোনো একটা অস্তিত্বের তল নিজেদের চর্চার মধ্যে শরীরী রূপ পরিগ্রহ করা না-করার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের 'আলোচনা'-র অন্তর্গত একটা মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

> বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা, প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্তমান। এক দিনে তাহা আয়ত্ত হয় না। প্রত্যহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশ বৎসর এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিবেন কী করিয়া। বিশ্বের সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভালবাসিতে গেলে বিশ্বজনীনতা থাকা চাই।

বিশ্বজনীনতার শরীরী রূপ ধারণ করার কথা হচ্ছে এখানে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বিশ্বজনীনতা আয়ত্ত করার কথা বলেছেন সে আয়ত্ত করার জন্য বিশ্বের এক কণা জমিও অধিকার করার দরকার পড়ে না। একটু একটু করে অধিকার করতে করতে গোটা বিশ্বই হয়তো একদিন অধিকারে এসে যাবে, কিন্তু তা হয়তো কোনোদিনই আয়ত্তে আসবে না। ওই বিশ্বজনীনতার ভাব ছাড়া আয়ত্ত হয় না। এই ভাব যে শুধু একলা আমার হাতে পেয়ে যাবার জিনিস তাও নয়। দেশ কাল ও সমাজ সংস্থানের বিন্যাসের বড়ো ভূমিকা আছে এখানে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের ভানুমতীর বিমূঢ় প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষ কোন দিকে? ভানুমতীর অভিজ্ঞতার জগতে ভারতবর্ষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। জীবনের যে-গণ্ডিতে তার বসবাস ভারতবর্ষের খোঁজ পেতে গেলে সে গণ্ডি অতিক্রম করে যেতে হয়। ভানুমতীর গণ্ডিতে ভারতবর্ষের কোনো শরীরী অস্তিত্ব ছিল না। থাকবার কোনো আয়োজন করা যায়নি। প্রসঙ্গত আজকের আমরা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই হয়তো ভারতবর্ষের অধিকার হারিয়েছি। আজ সাংবিধানিক সূত্রেই আমাদের কোনো ভারতবর্ষ নেই। আমাদের আছে শুধু ভারত। সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের বলে আমরা আজ যে-দেশে বাস করি তাকে বলে ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ভারত। ভারতবর্ষ আজ আমাদের কাছে বড়োজোর এক অতীত সাংস্কৃতিক ধারণা। হয়তো তা এক ভৌগোলিক ভূখণ্ড।

ভারতীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গে ভারত ধারণার কথা ঈপ্সিতা চন্দও তুলেছেন 'ঢোড়াই চরিত মানস'-এর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় (সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩)। ঈপ্সিতা আর একটি তৃতীয় মডেলের প্রস্তাব করছেন। এই ধারণার পিছনে মূল কথাটা হল শোনা। কোনো সাহিত্য যখন আমরা পড়ছি, তখন আমরা আসলে একটা জগতের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনছি। ছবির বেলায় যেমন আমরা রঙে রেখায় মিলে ছবির টোনের কথা ভাবি, এও প্রায় যেন তেমনি। সাহিত্যকর্মেরও আছে টোন। গোটা ভারত সংস্কৃতির কথায় আমরা তেমন করে ভাবতে পারি একটা ভারতীয় টোনের কথা। এ নিতান্তই এক সাংস্কৃতিক বর্গ। কোনো সংস্কৃতির গর্ভজাত সাহিত্য শিল্পের কাজে আমরা এই বিশিষ্ট টোনের শরীরী রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারি। আমাদের নমস্কারের হাত জোড় করা মুদ্রার কথা ভাবা যাক। অভিবাদন ও অভ্যর্থনার এরকম আরো নানা ভঙ্গি ও মুদ্রার সঙ্গে আমরা পরিচিত। আছে করমর্দনের প্রথা। আছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতেরও প্রথা। আছে নত কোমরে হাতের মুদ্রায় কুর্ণিশের প্রথা। আছে অন্তরঙ্গ আশ্লেষে জড়িয়ে ধরার প্রথা। আছে নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে গুরুজনের পাদস্পর্শের প্রথা। সামরিক মুদ্রায় আছে স্যালুট, সঙ্গে পায়ে পায়ে মিলনের বুটের ধ্বনি। আমরা যদি একদেশদর্শিতায় আক্রান্ত না হই, তাহলে এর কোনোটাকেই আমরা একান্ত ভারতীয় বলে দেগে দিতে পারি না। এইসব মুদ্রার মধ্যে আছে ভিন্ন ভিন্ন টোনের দ্যোতনা। এর সবেরই মধ্যে ভারতীয়তা খুঁজে নেবার অবকাশ আছে। আমাদের সাংস্কৃতিক যাপনের উপরে নির্ভর করবে এর কতটুকু কখন আমরা শরীরী রূপে পেয়েছি বা পাইনি। এটা একটা প্রক্রিয়া।

স্বাধীন ভারতে আমাদের নতুন নেশনের যাত্রাপথের দিনে, সাহিত্য অকাদেমি এবং সঙ্গে আরো সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ললিত কলা অকাদেমি ও সঙ্গীত নাটক অকাদেমি যখন গড়ে উঠছিল তখন একটা সুপ্ত রাষ্ট্রীয় কণ্ঠস্বর কোথাও বাসা বেঁধে ছিল এমন মনে করা অসংগত নয়। তখনকার এই স্বপ্ন অস্বাভাবিক ছিল না হয়তো। নতুন রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এক তাজা জাতীয় জীবন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা কিছু অবাস্তব নয়। এই সুযোগে একটু জাতীয় গৌরবের ধারণাকে আমাদের জনজীবনে চারিয়ে দেবার ইচ্ছেও থাকতে পারে। এইরকম অবকাশেই সম্ভবত ওই অতিক্রমী ভারতের এক ধারণা আমাদের পেয়ে বসতে পারে।

কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের সেই ঊষালগ্নের স্বপ্ন ভেঙে যেতে বেশিদিন লাগেনি। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে এত রকমের নাড়াচাড়া পড়ল যে তাতে অনেক রকমের ভাঙাচোরা জোড়ের দাগ সামনে বেরিয়ে এল। জাতীয় জীবনের চেহারাটা যে অত মসৃণ কিছু না সে কথাটা একেবারে সামনে এসে গেল। ফাটা ছেঁড়া দাগগুলো যত বেরিয়ে

এল, ততই জাতীয় ঐক্যের উপরে আরো জোর পড়ল। এই পরিবেশেই আস্তে আস্তে আমরা ওই অতিক্রমী ভারত ধারণার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতে চাইলাম। ওই ঐক্যবদ্ধ ধারণার একত্বের পায়ে বহুত্বকে বিসর্জন দেবার শুধু আহ্বান বারবার শুনতে পাই তাই না, রীতিমতো তর্জন গর্জনও শোনা যায়। ওই ঐক্যের কথাটা এতে করে কেবল কথার কথায় দাঁড়িয়ে যায়।

ওই যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টার কথা বললাম, সেই কাছাকাছি সময়ে জাতীয় ভাষা কমিশনও গঠিত হয়েছিল। নতুন এক জাতি-রাষ্ট্রের অবয়ব গড়ে তোলার রাষ্ট্রীয় চেষ্টার একটা ধাপ। সেই প্রসঙ্গে এমনকী বুদ্ধদেব বসুর মতো স্বঘোষিত বিবরবাসী এক লেখক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এক প্রবন্ধে বলেছিলেন:

> "মাতৃভাষার বিকাশ ও 'জাতীয়' ভাষার উত্থান– এ-দুই ভারতভূমিতে যুগপৎ সম্ভবপর, কেউ যেন এমন মোহকে ভ্রমক্রমেও প্রশ্রয় না দেন। ভারতবর্ষে একটি 'জাতীয়' ভাষা বা সামান্য ভাষা তৈরি হ'য়ে উঠতে পারে শুধু এই শর্তে যে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার গতিপথ রুদ্ধ ক'রে দেয়া হবে, এবং সেই অবরোধে সহায়তা করবেন তাঁরাই, যাঁদের বলা যেতে পারে সেই-সেই ভাষারই সন্তান"।

কাজেই আমাদের জাতীয়তা একত্বের নয়, বিচিত্রের। এ কথা আমরা কে কবে বুঝব জানি না। এ প্রসঙ্গে এ কথাও খেয়াল রাখা ভালো যে, ওই বৈচিত্র্যেই এই জাতীয়তার স্ফূর্তি।

প্রাচীনদের এক ভাবনার কথা তুলে কথা শেষ করি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শুরু হচ্ছে এক শূন্যতা থেকে। কিছুই ছিল না তখন। নাম-রূপ আকারে প্রকাশের আগে বিশ্ব লীন ছিল হিরণ্যগর্ভে। মৃত্যুরূপ বুভুক্ষায় আবৃত ছিল সব। এই অবস্থা ছিল অব্যাকৃত। মৃত্যু চাইল সমনস্ক হতে। মৃত্যুর কারণে উৎপত্তি হল মনের। (অকুরুত মনঃ)। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের মিলনে সৃষ্টি হল স্থল, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী। এই পৃথিবী সৃষ্টির পরে প্রজাপতি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। প্রজাপতির ক্লান্ত শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল তেজোরূপ রস। এই সেই বিরাট। তস্য শ্রান্তস্য, তপ্তস্য তেজোরসো নিরবর্ততাগ্নি।

এই সৃষ্টি কাহিনি ধাপে ধাপে এগোতে এগোতে সেই বিন্দুতে পৌঁছোল যেখানে প্রজাপতি নিজেকে অনুভব করলেন নিঃসঙ্গ, কেননা তিনিই সেই বিরাট। ওই একলা নিঃসঙ্গতায় তাঁর আনন্দ হল না। স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। তিনি এক দ্বিতীয়ের ইচ্ছা করলেন।

এক থেকে ক্রমে অনেক। কল্পনা করতে খুব কি বাধা হয় যে এসবের পিছনে ছিল আনন্দেরই আকাঙ্ক্ষা। একত্বের সন্ধানের এই এক পথ।

স্বীকৃতি: কম্পারেটিভ্ লিটেরেচার আসোসিয়েশন অব্ ইন্ডিয়া (ক্লাই)-র আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রথম স্বপন মজুমদার স্মারক বক্তৃতা, ২০২১-এর অনলাইন আলোচনার সংশোধিত রূপ।

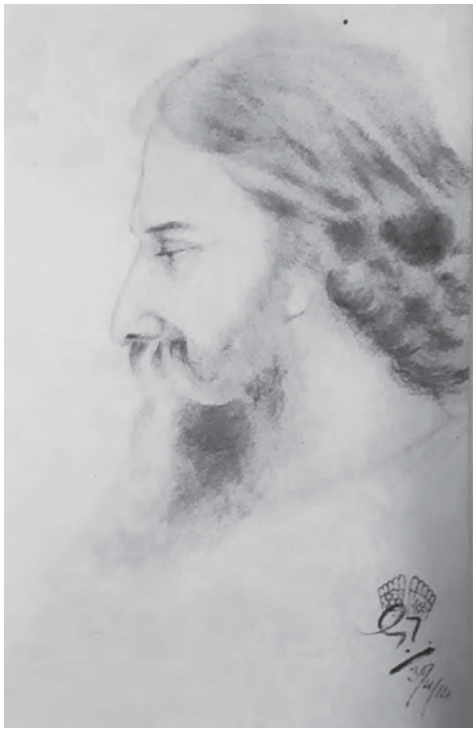

ছবি : গগেন্দ্র নাথ ঠাকুর

গৌরীপদ দত্ত (১৯২৭-২০২০)— বামপন্থী উদ্‌ভাবনশীল মানবদরদী ডাক্তার

অমিয় কুমার বাগ্‌চী

গৌরীপদ দত্ত সম্বন্ধে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন।

যে মানুষ মাটির কাছাকাছি, গৌরীপদ দত্ত (এখন থেকে 'গৌরীদা') সেই ধরনের মানুষ ছিলেন। জন্ম হয়েছিল বর্ধিষ্ণু পরিবারে বাঁকুড়ার জয়পুর গ্রামে। পিতামহ হলধর দত্ত বড়ো ব্যবসায়ী এবং বাবা যতীন্দ্রনাথ দত্ত প্রচুর পসারওয়ালা ডাক্তার। কিন্তু তিনি শুধু বিলাসিতার মধ্যে বড়ো হননি। তাঁর খেলার সঙ্গী ছিল হাড়ি, বাগ্‌দি বাড়ির ছেলেরা এবং তাদের বাড়িতে বিশেষ করে দাইমার বাড়িতে ভদ্রঘরে নিবিদ্ধ খাবার খেতে ভালোবাসতেন। বাবা ছিলেন কংগ্রেস কর্মী, গৌরীদাকে দশ বৎসর বয়সেই কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার করে দিয়েছিলেন। (আমার অধিকাংশ তথ্যের উৎস গৌরীদার অসাধারণ আত্মজীবনী : *কখন আমি বাহির হলাম*। এক অসামান্য সমাজসেবীর জীবন আলেখ্য, প্রকাশক বাঁকুড়া সংহতি, কলকাতা ২০১৫ সাল) তাঁরা সবাই খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, চাদর পরতেন। গৌরীদার দাদু ছিলেন পঞ্জাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল। সে বাড়িতে সাহেবি কেতায় কোট প্যান্ট পরা হত। দাদুর বাড়ি লাহোরে গৌরীদা গিয়েছেন খদ্দরের পোষাক পরে। দাদু জিজ্ঞেস করলেন তোমার কোট কোথায়? গৌরীদা বললেন, 'ট্রেনের জানালার ধারে বসেছিলাম। একটা বাঘ এসে হালুম, করে কোটটা নিয়ে গেল।' জয়পুরে ফেরার পর দাদু পার্সেলে কোট প্যান্ট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গৌরীদা সেসব পরেননি।

গৌরীদা গ্রামে লেখাপড়া শেষ করার পর (গৌরীদা সব জায়গার শিক্ষকদেরই সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেছেন), তিন মাইল দূরে কুচিয়াকোল রাধাগোবিন্দ সিংহ হাই স্কুলে ভর্তি হোন, এবং বোর্ডিংয়ের আবাসিক হোন। সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। বোর্ডিংয়ে খাবার দেওয়া হত সকাল দশটায়। ভাত, তার সঙ্গে হলুদ রঙের একটা তরল পদার্থ, আর তরকারি বলতে ছানসে কুমড়ো আর আলু, আর ছ-মাস আলু আর পোস্ত (পোস্ত নাম মাত্র)। তাই দিয়েই তাঁরা তিন সানকি ভাত খেতেন। তারপরের খাবার একই ব্যঞ্জন দিয়ে রাত দশটায়। যেদিন মৌরলা বা চুনো মাছ হত, তাঁরা চার সানকি ভাত খেতেন। স্বভাবতই এরপর আর কোনো জায়গায় তাঁর খাওয়া নিয়ে অসুবিধা হয়নি।

যতীন্দ্রনাথের কলকাতায় থাকার সময় বন্ধুত্ব হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর (পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়) সঙ্গে। ওঁর গল্প বাড়িতে করতেন। তাছাড়া বাড়িতে অনুশীলন দলের লোকেদের যাওয়া আসা ছিল। সে কারণে তিনি বিপ্লবপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হোন এবং ১৯৪৬ সালে রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি, আরএসপি-তে যোগ দেন। আরএসপি-র সুধীন দাশগুপ্ত নতুন সভ্যদের মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদের শিক্ষণ দিতেন এবং নিজের দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতেন। এই ইতিহাস চেতনা তাঁর বাবার কাছ থেকেও পেয়েছিলেন। তিনিও দত্ত বংশের ইতিহাস এবং আঞ্চলিক ইতিহাস জানার উপরও জোর দিতেন, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের ডোম রাজাদের এবং তাদের বংশধরদের কথাও বলতেন। সুধীন দাশগুপ্ত চা এবং বিড়ি-সিগারেট খেয়েই কাটাতেন। অকালে প্রায় অনাহারে প্রয়াত হন।

গৌরীদা ডেলিগেট হিসেবে আরএসপি-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেন। তখন মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে অনেক পার্টি ছিল (এখনও আছে)— আরসিপিআই, বলশেভিক পার্টি ইত্যাদি। গৌরীদা প্রস্তাব দেন যে এই সমস্ত পার্টি যুক্ত হয়ে এক কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা উচিত। সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে গৌরীদা আরএসপি ছেড়ে দেন। ১৯৪৯ সালে গৌরীদা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। পার্টি তখন অবৈধ ঘোষিত হয়েছে (বি টি রণদিভের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেওয়ার ফলে)। তখন বাঁকুড়ায় 'লাঙল যার জমি তার'

আন্দোলন চলছিল। গৌরীদা আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে সেই আন্দোলনে যোগ দেন। গৌরীদা ধরা পড়েননি। তাঁর মতে পুলিশ চুনোপুঁটি বলে তাঁকে ধরার চেষ্টা করেনি। কিন্তু বোধ হয় সেই অঞ্চলে গৌরীদার নিজের তথাকথিত ছোটো জাতের লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে এবং পারিবারিক পরিচিতির ফলে আশ্রয় পেতে অসুবিধা হয়নি। ১৯৫১ সালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির অন্য বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মতোই বাঁকুড়ার 'লাঙল যার, জমি তার' আন্দোলন থিতিয়ে যায়, তার একটা বড়ো কারণ প্রধান নেতারা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে যান।

১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হলে গৌরীদার নতুন জীবনসংগ্রাম শুরু হয়।

গৌরীদা চাকরির দরখাস্ত দিলেন রাধানগর স্কুলে। সেখানে চাকরি হল না কারণ তাঁর মতো মার্কামারা কমিউনিস্টকে চাকরি দিলে সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁর চাকরি হল সহিসপুর স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হিসেবে। তিনি তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় জানানো সত্ত্বেও, কারণ সে স্কুল সরকারি অনুদান নিত না। বেতন ৯০ টাকা, বাস স্কুলের হোস্টেলে আর খাওয়াদাওয়া ফ্রি। গৌরীদার অঙ্কে অপারদর্শিতা সত্ত্বেও অঙ্ক, সাহিত্য ইত্যাদি পড়িয়ে এবং ফুটবল ভলিবল খেলে ছাত্র এবং শিক্ষকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন।

এরপর তাঁর রামানন্দকাকার উৎসাহে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে গৌরীদা ভর্তি হলেন। সেটা বোধহয় ১৯৫১ সাল। কলেজে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন করা যেত না। সেজন্য তাঁরা স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের শাখা খুলতে পারলেন না, তার জায়গায় Progressive corner নামে একটি সংগঠন খুললেন। প্রথমে থাকতেন পরমেশ্বর বড়ুয়ার আনুকূল্যে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে, পরে ডোভারলেনের সরকারি চাকুরেদের মেসে। তাঁর ভাবি স্ত্রী গৌরী চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হয় যখন Physiology desk-এ উনি গৌরীদার পার্টনার। গৌরীদেবীকে বিএসসি পাশ করার সূত্রে কেমিস্ট্রি পড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণ হয় ১৮ জুন ২০১২। শুরু থেকেই গৌরীদেবী গৌরীদার রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হোক অন্যায়ভাবে অধ্যাপক ডা. হিমাংশু রায়ের বিরুদ্ধে ছাত্রদের হাঙ্গার স্ট্রাইক এতে অভিভাবকদের পুরো সমর্থন ছিল।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করার পর গৌরীদা যোগ দেন খড়দহর বলরাম সেবামন্দিরে— যাঁর অধ্যক্ষ ছিলেন ড. ইন্দুভূষণ বসু, যাঁকে সবাই সশ্রদ্ধভাবে মহারাজ বলত। গৌরীদেবী কয়েকটি চাকরির পরে স্থিতভাবে জগৎ গঙ্গা মাতৃসদনের চিকিৎসকের কাজ পান। গৌরীদা তারপর ড. চিন্ময় ঘোষের প্রোজেক্টে কাজ পাবেন বলে সেবামন্দিরের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর বন্ধু বিশ্বনাথ দাস সে কাজের প্রার্থী বলে কাজটা নেননি। ততদিনে তাঁদের মেয়ে ভাস্বতীর জন্ম হয়েছে। গৌরীদেবীর বেতন ২০০ টাকা।

এরপর উনি Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER) যেটার নাম পরে সুখলাল কার্নানি মেডিক্যাল কলেজ (SSKM) হয়। কিন্তু এখনও পিজি নামেই পরিচিত, সেখানে ড. চুনিলাল মুখার্জির তত্ত্বাবধানে Master of Obstetrics (MO) করার জন্য ভর্তি হন এবং ডিগ্রি পান। পিজিকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল সায়েন্সে উত্তীর্ণ করার কথা হয়েছিল। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক (বোধ হয় মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের অসম্মতির জন্য) তা হয়ে ওঠেনি। এমও চলছিল প্রায় বিনা বেতনে। এরপর গৌরীদেবী যোগ দেন রিষড়ার সেবাসদন হাসপাতালে ৪০০ বেতনে। ততদিনে ওঁদের ওপর তাঁদের পিতৃকুলের দায়ও এসে পড়েছে। তাঁদের মেয়ে ভাস্বতী (কুমকুম) থাকল দাদু-দিদিমার তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কথা না শোনায় গৌরীদার চাকরি বেশিদিন টিকল না। আবার আরম্ভ হল জীবন সংগ্রাম গৌরীদেবীর অল্প মাইনের এখানে ওখানে কাজ এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিস সম্বল।

গৌরীদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল সাহিত্যিক সরোজ আচার্য এবং অরবিন্দ গুহর। গৌরীদা নিজেও প্রচুর কবিতা লিখেছেন এবং কবিতাগ্রন্থও প্রকাশ করেছেন।

পিজিতে গৌরীদার মতো অনেক কমিউনিস্ট ছাত্র এবং শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল গ্রামবাসীদের নিজস্ব চিকিৎসাকেন্দ্রে স্পেশ্যালিস্ট সার্ভিসের ব্যবস্থা করা। সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ডা. নওশের আন্টিয়ার গ্রামসমাজ ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ধারণা তখনই গৌরীদার মনে উপস্থিত হয়েছিল।

ডা. জে চক্রবর্তী প্রস্তাব করেছিলেন একটা নন-প্র্যাকটিসিং হেল্‌থ্ সার্ভিসের যেখানে ডাক্তাররা বেতনভিত্তিতে কাজ করবেন। বিধান রায় সে প্রস্তাব এককথায় নাকচ করে দিয়েছিলেন। জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি বামপন্থী ডাক্তার গৌরীদাকে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য করে নেন। গৌরীদা ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত IMA-র পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

গৌরীদার ভাষায় 'তীর্থ (গৌরীদার আত্মজীবনীতে ব্যবহৃত নাম) সুবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল রাজনীতি সচেতন পশ্চিমবঙ্গেও রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষত বামপন্থী দলগুলি, চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সমাজসেবার অঙ্গ বলেই গণ্য করেছিল। চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে তাদের সমর্থক সংখ্যার বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ অস্ত্র হিসাবে নয় (পৃ. ১৮৭)।' ১৯৭১ সালের আলমাওয়াটা

কনফারেন্স যেখানে সর্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবার আবশ্যিকতা তুলে ধরা হয়, তার আগেই গৌরীদারা আইএমএ-তে কতকগুলি বিষয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে পেরেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে এই দেশে ইংল্যান্ডের মতো ন্যাশন্যাল হেলথ সার্ভিস চালু করা, একটা জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা নীতি এবং দেশে প্রয়োজনীয় ভেষজ উৎপাদন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না। জড়িয়ে পড়লেন গরিব মানুষের জ্বালা যন্ত্রণার শরিক হয়ে। এখানে সংক্ষেপে গৌরীদার কতকগুলি বড়ো পদক্ষেপের কথা বলে নিই। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে যেখানে তিনি ছিলেন Professor of obstetrics and Gynaecology. তাঁর শল্যবিদ্যার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁকে মনে করা হত Master of Mitra's operation যেটা জরায়ুর মুখের কর্কটরোগ সারাতে ব্যবহার হয়। তিনি কলকাতা জনস্বাস্থ্য কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি বাঁকুড়ার কোতুলপুর কেন্দ্র থেকে পরপর তিনবার ১৯৮৭, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবং গৌরীদার ভাষায় মন্ত্রী হতে হতে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি বিধানসভায় Subject Committee of Health and Family Welfare এবং Estimates Committee-র সভাপতি হয়েছিলেন। গৌরীদার অশেষ পরিতাপ ছিল যদিও Subject Committee of Health and Welfare গৌরীদা এবং ডা. অ্যান্টিয়ার পরিকল্পিত গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং গোষ্ঠীভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা প্রশিক্ষণের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভা সেই প্রস্তাব রূপায়ণের কোনো চেষ্টাই করেনি। তার পিছনে সরকারি আমলাদের বাধা ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের বিরোধিতা কাজ করেছিল।

গৌরীদা এবং ডা. নওশের অ্যান্টিয়া দুজনেই National Rural Health Mission-এর Steering Group-এর সভ্য হিসাবে কাজ করেছিলেন, যদিও ডা. নার্‌গিস মিস্ত্রীর (যিনি ডা. অ্যান্টিয়ার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন) তাঁদের দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না যে এই Mission-এর কাজের ফলে সাধারণ মানুষের খুব উপকার হবে। গৌরীদা State Planning Board-এ আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁর সেখানকার একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হল সাঁওতালি ওষুধ এবং ভেষধির উপর একটা কনফারেন্স ডাকা।

গৌরীদার গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ এবং সেখানকার বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যবস্থা অনেকখানি চালু করতে পেরেছিল, যাতে করে কেরালাতে শিশু মৃত্যুর হার প্রায় উন্নত দেশগুলির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল এবং গড় আয়ু ভারতের সব অঙ্গরাজ্যের চেয়ে বেশি হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার দুর্ভাগ্য যে এখানকার বামফ্রন্ট সরকার তাদের বন্ধু সরকারের কাছ থেকে এই শিক্ষা নিতে পারেনি।

এবার আসি গৌরীদার এবং ডা. অ্যান্টিয়ার নতুন ধরনের গ্রামীণ সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং চিকিৎসাবিদ্যা প্রশিক্ষণের কথায়। আমার তথ্যের ভিত্তি হচ্ছে N. H. Antia, G. P. Dutta and A. B. Kasbekar; Health and Medical Care; A People's Movement, Bombay : Foundation for Research in Community Health, 2001.

গৌরীদা যেদিন থেকে জানতে পারলেন যে ডা. অ্যান্টিয়া মহারাষ্ট্রের পান্নিচ গ্রামে একটা গ্রামীণ সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং তৎসংলগ্ন প্রশিক্ষণের প্রকল্প চালাচ্ছেন তখন তিনি সেখানে যেতে আরম্ভ করেন। এই প্রকল্পের একটা বড়ো অংশ ছিল মহিলাদের এই পরিষেবায় এবং প্রশিক্ষণে বিপুলভাবে অংশগ্রহণ। গৌরীদা শুধু এই স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা এবং কাজ করেননি। তাঁর টিমের অনেককে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। গৌরীদার খুব ইচ্ছা ছিল বাঁকুড়াতে পান্নিচির মতো একটা প্রকল্প গড়ে তোলা, সেই স্বপ্ন তিনি রূপায়িত করতে পারেননি।

কিন্তু আমি মনে করি ভবিষ্যতের সমসমাজ গড়ার জন্যে পান্নিচের অনুরূপ পরিষেবা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে তোলা দরকার। সেইজন্যে সংক্ষেপে এর রূপরেখা বর্ণনা করছি।

গোড়াতেই বলা দরকার যে গ্রামের লোকদের বোঝানো দরকার যে সুষ্ঠু স্বাস্থ্যপরিষেবা পাওয়া তাঁদের জন্মগত অধিকার এবং যে পরিষেবা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হচ্ছে সেটা তাদের নিজেদের জিনিস। একেবারে ভিত্তি মূলে থাকবে গোষ্ঠীর স্বাস্থ্যকর্মী, যার দায়িত্ব থাকবে সেই গ্রামের লোকদের প্রতি। এঁরা অসুখ প্রতিরোধের ব্যাপারটাও দেখবেন।

তার ওপরে থাকবেন তালুক বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সহযোগিনী যাঁর কাছে একটি শক্ত ব্যারামের রোগী/রোগিনীরা আসবেন। সহযোগী এবং সহযোগীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। পঞ্চায়েত সমিতি স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র যেখানে ডাক্তার এবং ডাক্তারি ছাত্ররা কাজ করবেন। এবং তার উপরে থাকবে জেলা হাসপাতাল যেখানে কঠিন রোগীদের নিচের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুপারিশ হবে। রাজ্যস্তরের মেডিক্যাল কলেজগুলি বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে। এই স্বাস্থ্য পরিষেবার এবং প্রশিক্ষণের একটা বড়ো সুফল হবে যে প্রতিটি ডাক্তার প্রশিক্ষণের সময়েই গ্রামীণ সমাজের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন এবং গ্রামের লোকেরা তাঁদের হক বুঝে নিতে শিখবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন তথ্যের জন্যে আমি ডা. নার্গিস মিস্ত্রি, ডা. কাজলকৃষ্ণ বণিক, সালিম আহমদুল্লাহ এবং রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জির কাছে কৃতজ্ঞ। অবশ্যই ভুলত্রুটির দায় সম্পূর্ণ লেখকের।

সংকটোত্তর বিশ্ব অর্থনীতি: ভাবনা ও পুনর্ভাবনা

আজিজুর রহমান খান

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের অন্তিম বছরটিকে প্রায় সর্বসম্মতভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নিকৃষ্টতম বছর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। একই সঙ্গে চলমান বছরটি সম্পর্কে আশাবাদ ক্রমশ জনমনে বাসা বাঁধছে। অতিমারী ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারা সম্বন্ধেও চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই।

এই সংকটের পূর্ববর্তী দশকগুলিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ক্রম বিস্তৃতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি ধারা। আমার বিচারে এই ধারা দুটি পরস্পর সম্পৃক্ত এবং এই সম্পৃক্ততার কারণ এই সময়কালের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য।

বিশ্বায়নের কালে মোটামুটিভাবে সর্বত্র বৈষম্য-বিশেষত্ব অভ্যন্তরীণ আয়বণ্টনের বৈষম্য - বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিষয়টি আমি অতীতে এই সাময়িকীতে আলোচনা করেছি। গোঁড়া নব্যধ্রুপদী অর্থনীতি তত্ত্ব অনুযায়ী অবাধ বাণিজ্যের প্রসার হলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এবং আয়বণ্টনের সমতা বৃদ্ধি পায়। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অবাধ বাণিজ্য প্রসারের ফলে প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেও আয়বণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বণ্টনের ক্ষেত্রে দুই শ্রেণির দেশের মধ্যে ফলাফলের পার্থক্যের কারণ তাদের উৎপাদন-উপাদানের তুলনামূলক প্রাচুর্যের পার্থক্য। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমশক্তি প্রচুর এবং পুঁজি অপ্রতুল। অবাধতর বাণিজ্যের ফলে এসব দেশে উৎপাদন ও রপ্তানিতে অধিকতর শ্রমনিবিড় পণ্য ও সেবার অংশ বাড়ে। ফলে শ্রমের চাহিদা বাড়ে এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার পুঁজির মুনাফা বৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুততর হয়। পুঁজি-সমৃদ্ধ ও শ্রম-অপ্রতুল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এই তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত, অবাধতর বাণিজ্যের ফলে এই দেশগুলিতে মজুরিবৃদ্ধি হবে মুনাফাবৃদ্ধির চেয়ে স্বল্প হারে।

অধিকাংশ নব্যধ্রুপদী তত্ত্বের মতো বাণিজ্যতত্ত্বটিও অনেক পূর্বসিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই পূর্ব সিদ্ধান্তগুলি তুলনামূলকভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলির চেয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য অনেক বেশি অবাস্তব। এই কারণে, বিশেষভাবে বাণিজ্যনীতির রূপান্তরকালে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বায়নের প্রতিশ্রুত বৈষম্য নিরসন ঘটেনি। অবাধতর বাণিজ্য নীতির পরিপূরক যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল তা উপেক্ষা করে রাষ্ট্রশক্তি অর্থনীতিতে বিপুল প্রচ্ছন্ন বৈষম্যবর্ধক পুনর্বণ্টন সৃষ্টি করেছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমতামূলক বণ্টনের প্রতিশ্রুতি কেবল যে অপূর্ণ রয়েছে তা নয়, বরং বৈষম্য প্রায় সর্বক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক পূর্বানুমানের সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব কম থাকায় তত্ত্ব-প্রতিশ্রুত বৈষম্যবৃদ্ধি ঘটেছে; পুঁজি সমৃদ্ধ এবং (অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ) শ্রম-অপ্রতুল এই দেশগুলিতে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল মুনাফাবৃদ্ধির হারের তুলনায় নগণ্য। এই অবস্থায় বিশ্বায়নের দ্রুততর প্রবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে এই দেশগুলির পক্ষে পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করে বৈষম্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল। বিশ্বায়নের ফলে কর্মাভাবগ্রস্থ শ্রমিকদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তাদের মধ্যে বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য যথাযোগ্য অবসর ভাতা এই ধরনের ব্যবস্থার উদাহরণ। কার্যত এই দেশগুলি, বিশেষভাবে ইঙ্গমার্কিন পুঁজিবাদী দেশগুলি, সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। বিশ্বায়নের যুগে পুঁজির আন্তর্জাতিক সচলতার ফলে শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতাহ্রাসের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে, তাদের ইউনিয়নগুলির ভূমিকা খর্ব করে, তাদের আয় বৃদ্ধিকে ব্যাহত করেছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে অতি দক্ষিণপন্থী গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলি শ্রমিকশ্রেণির অসহায় ক্ষোভকে ব্যবহার করে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিল। এই প্রবণতার চূড়ান্ত পরিণতিতে ২০১৬ সালে ব্রিটেনের গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের সিদ্ধান্ত জয়লাভ করে এবং তার অব্যবহিতকাল পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। শ্রমিকশ্রেণির হতাশার সুযোগ নিয়ে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি চরম অভিবাসী বিরোধিতা ও অন্যান্য নাতি-প্রচ্ছন্ন বর্ণবিদ্বেষবাদী প্রচারণা অবলম্বন করে মধ্যপন্থী ও বামপন্থী হিসাবে চিহ্নিত দলগুলির কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণির আনুগত্য কেড়ে নিয়েছিল।

এই প্রবণতার সাফল্যের চূড়ান্ত নিদর্শন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চার বছরের শাসনকালে সমস্ত অর্থনৈতিক নীতি ও পদক্ষেপ ধনিকশ্রেণির সম্পদবৃদ্ধিতে প্রয়োগ করেও স্বল্পবিত্ত শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকশ্রেণির উগ্রসমর্থন অক্ষুণ্ণ রাখার নব্যফ্যাসিবাদী কৌশল আমাদের বিমূঢ় বিস্ময় উদ্রেক করেছে। একই প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি ব্রিটেনে, যেখানে উত্তর ইংল্যান্ডের ক্ষয়িষ্ণু শিল্পের দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণি লেবার পার্টির প্রতি তাদের বহু প্রজন্মের আনুগত্য ত্যাগ করে বরিস জনসনের উগ্রজাতীয়তাবাদের ফাঁকা অভিবাসী-বিরোধিতা সমর্থন করেছে।

এই সময়কালে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশেও দক্ষিণপন্থী নব্যফ্যাসিবাদী দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, যদিও তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারেনি। আমার কিঞ্চিৎ সরলীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে এই দেশগুলির তুলনামূলক সাফল্যের প্রধান কারণ এই দেশগুলিতে ইঙ্গমার্কিন দেশের তুলনায় বৈষম্যবৃদ্ধি সীমিত ছিল এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় ছিল।

এই সময়কালে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও বৈষম্যবৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিকতার অবক্ষয় ঘটেছে তবে এই প্রবণতা দুটির কার্যকারণ কালানুক্রম শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় ভিন্ন এবং জটিলতর। এই দেশগুলিতে বিশ্বায়ন-সম্ভূত ত্বরিত উন্নয়নের ফসলের বিপুল বৈষম্যায়িত পুনর্বণ্টন গণতন্ত্র অব্যাহত রেখে সম্ভব ছিল না। ফলে স্বল্প সংখ্যক যে দেশগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যে দেশগুলিতে গণতন্ত্র অঙ্কুরিত হচ্ছিল, সর্বত্র অগণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ছিল অনিবার্য।

বিশ্বায়ন বিরোধিতার শুরু অতিমারী আবির্ভাবের কয়েক বছর আগে মুক্তবাণিজ্যের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের এলোপাথারি আক্রমণ দিয়ে। অতিমারীর আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাত বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়নের গতি ২০২০ সালে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিয়েছে: প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদন শতকরা পাঁচভাগ এবং বিশ্ববাণিজ্য শতকরা নয়ভাগের কিছু বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে। বৃহৎ অর্থনীতি সমূহের মধ্যে একমাত্র চীন ২০২০-এ জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি অনেক কম হলেও- শতকরা ২.৩ হারে - অব্যাহত রাখতে পেরেছে। চীনের রপ্তানি বাণিজ্যও শতকরা ৩.৬ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২০-এর শেষ থেকে কোভিড-১৯ প্রতিহত করার টীকা আবিষ্কার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ট্রাম্পের পরাজয় অতিমারীর ওপর মানবসমাজের বিজয় সম্পর্কে আশাবাদ দৃঢ় করেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির পুরুজ্জীবন সংক্রান্ত হিসাব শুরু করেছে। এই সংস্থাগুলির অভিক্ষেপ অনুযায়ী এই বছরে বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদন ও বাণিজ্য ২০২০-এর নিম্নগতির সম্পূর্ণ না হলেও অধিকাংশ পরিপূরণ করবে। এই নিবন্ধের বাকি অংশে আমি অতিমারি-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতির রূপ সম্বন্ধে কিছু ভাবনা উপস্থাপন করব।

আমার প্রথম অনুমান এই যে বিশ্বায়নের গতি শ্লথ হবে: অবাধ বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক পুঁজি সঞ্চরণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সচলতা কমবে। এই অনুমানের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যাক। শিল্পোন্নত বিশ্বে অদক্ষ এবং স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের অসন্তোষের ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল। পুঁজিবাদী মুনাফা বৃহত্তর সামাজিক লাভ ক্ষতি হিসাবের মধ্যে ধরে না। কোনো দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে সেটা বিদেশ থেকে আমদানি করা মুনাফাবৃদ্ধি করে কিনা তার হিসাব হয় দেশীয় উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে আমদানি ব্যয়ের তুলনা দিয়ে। দেশীয় উৎপাদন বন্ধ করলে সেখানে নিয়োজিত স্বল্প দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মাভাব দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং অন্তর্বর্তীকালীন জীবিকার ব্যয় তার মধ্যে গণ্য হয় না। অথচ সমাজের পক্ষে এই সমস্ত ব্যয় উপেক্ষা করা অসম্ভব। দায়িত্বশীল সমাজে সরকার অবশ্যই এই সিদ্ধান্তের সামাজিক ব্যয়ের ভার অন্তত আংশিকভাবে মালিকদের ওপর করবৃদ্ধি বা অন্য উপায়ে আরোপ করতো। একইভাবে রপ্তানিকারী দেশগুলিতে উৎপাদকরা রপ্তানি ব্যয় কমানোর জন্য অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে যা সামাজিক ক্ষতি বৃদ্ধি করে। পরিবেশ দূষণ এবং বিপদজনক উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যবহার এর উদাহরণ। রপ্তানি ব্যয়ে এই সমস্ত সামাজিক ক্ষতি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ে অংশতও পরিগণিত হলে রপ্তানি মুনাফা কমে যেত। গোঁড়া অর্থনীতিতত্ত্বে এই ধরনের বহিঃপ্রভাবের স্বীকৃতি বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল যদিও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ছিল একান্ত বিরল। অতিমারীপূর্ব দশকগুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ এবং তার রাজনৈতিক ফলশ্রুতি এ বিষয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিশ্বায়নের রাশ টানার একটি দায়িত্বশীল প্রবণতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের পরাজয়ের ফলে বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার ওপর এলোপাথারি স্বৈর আক্রমণ প্রশমিত হলেও বিশ্বায়নের প্রসারের সম্ভাবনা নেই। ডেমোক্র্যাটিক দল এবং জোসেফ বাইডেন ঐতিহ্যগতভাবে রিপাবলিকানদের তুলনায় মুক্তবাণিজ্য সম্বন্ধে স্বল্পোৎসাহী ছিলেন। নির্বাচন প্রচারণা এবং প্রাথমিক নির্বাচনোত্তর নীতি নির্ধারণে বাইডেন সুস্পষ্টভাবে নিম্নবিত্তদের সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন। স্বদল-ত্যাগী অদক্ষ্য ও স্বল্পদক্ষ শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের আনুগত্য পুনরুদ্ধার করা তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহের অন্যতম। ইউরোপ, কানাডা এবং অন্যান্য বন্ধুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের স্বেচ্ছামূলক বাণিজ্য বিরোধিতা লোপ করলেও চীন, ইরান ইত্যাদি দেশের বিরুদ্ধে সমশ্রেণির ব্যবস্থাসমূহ বাতিল করাতে বাইডেনের আশু উৎসাহের সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন, বিশ্বের সামগ্রিক

উৎপাদন বৃদ্ধির সর্ববৃহৎ অংশের উৎস। চীনের এই ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকার প্রভূত সম্ভাবনা। ২০২০-এ বিশ্বের প্রধান অর্থনীতি সমূহের মধ্যে একমাত্র চীন ধনাত্মক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিশ্বায়নের প্রতি "নিষ্ঠা" তাদের প্রায় চারদশকব্যাপী অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু এই বছরে যে নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হচ্ছে তার উন্নয়ন কৌশলে দিক পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে: বিশ্ববাণিজ্যে নিজস্ব রপ্তানির অংশ অক্ষুণ্ণ রেখে উন্নয়নের চাহিদার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ ভোগ ও বিনিয়োগের অংশ বৃদ্ধি করা এই নতুন কৌশলের কেন্দ্রিয় খুঁটি। ইতিমধ্যে আমেরিকা ও চীনের সম্পর্কেও দিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বায়নের কালে চীনের দ্রুত প্রবৃদ্ধির দশকগুলিতে এই সম্পর্ককে বলা হত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক। বর্তমানে এই সম্পর্ক নিরুঙ্কুশ প্রতিযোগিতা : চীনের নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 'আধিপত্যবাদ'-কে প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আমেরিকাও সুস্পষ্টভাবে চীনকে বিশ্বআধিপত্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী হিসাবে পরিগণনা করছে। অতীতের মার্কিন-সোভিয়েট সহাবস্থান নীতির সঙ্গে এই নতুন মার্কিন-চীন সম্পর্ক মৌলিকভাবে ভিন্ন : সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল আমেরিকার সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কখনো অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেনি। কিন্তু চীন একই সঙ্গে আমেরিকার সামরিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় বিশ্বায়ন যুগের অবাধ বাণিজ্যের ধারা অব্যাহত থাকা অসম্ভব।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চলেও বিশ্বায়নের ধারার প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটেন কর্তৃক এই মুক্ত বাজার পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে। একই সঙ্গে ট্রাম্প আমলের বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এলোপাথারি আক্রমণ ইউরোপের মার্কিন নির্ভরতায় চিড় ধরিয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উগ্রদক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদের উত্থানকে প্রতিরোধ করার জন্য অভিবাসন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের পক্ষেও সংরক্ষণনীতি প্রসার করা অনিবার্য।

অতিমারী-উত্তর বিশ্বঅর্থনীতির দ্বিতীয় যে ধারাটির উল্লেখ করব তা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, যা দীর্ঘকাল যাবৎ ক্রমপ্রসারিত হচ্ছিল। কৃত্রিম বুদ্ধি ভিত্তিক বা রোবোটিক প্রযুক্তির প্রচলন বিস্তারের ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে ভয়ভীতি অতিমারীর আগেই প্রচলিত ছিল। অতিমারীর কালে মানবিক সংযোগ এবং স্পর্শ পরিহার করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেড়েছে : খুচরা বাণিজ্যে ইন্টারনেট বিক্রয়ের অংশের বিপুল বৃদ্ধি, পরিবহণ ও আতিথেয়তা সেবাশিল্পে স্পর্শশূন্য পদ্ধতির বিস্তার এবং প্রত্যক্ষ উৎপাদনে রোবট ব্যবহারের বৃদ্ধি এর উদাহরণ। মনে করা হচ্ছে এই সমস্ত পদ্ধতি বহুক্ষেত্রে মুনাফাবৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং এই উপলব্ধি অতিমারী উত্তর কালে তাদের স্থায়ীত্ব এবং বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

অতিমারী উত্তর বিশ্ব, অতীতের তুলনায়, অভিবাসন বিমুখ হবে। আমেরিকা এবং ইউরোপে স্বল্পবিত্ত শ্রমিকদের বিশ্বায়ন বিরোধিতা আরো তীব্রভাবে অভিবাসন বিরোধী। ফসিল-জ্বালানি রপ্তানিকারী যে দেশগুলি অতিমারীপূর্ব সময়ে শ্রম আমদানি চাহিদার প্রধান উৎস ছিল তাদের রপ্তানি আয় ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ; প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের জ্বালানি চাহিদায় ফসিল জ্বালানির অংশ প্রায় প্রতি অভিক্ষেপ অনুযায়ী ক্রমক্ষীয়মান।

আমি গোড়ায় মন্তব্য করেছিলাম যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাক্-অতিমারী সময়ে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তির প্রভাব ক্রমবর্ধমান ছিল। অতিমারীর প্রথম বছরে এই প্রবণতার একমাত্র ব্যতিক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শক্তির অন্তত সাময়িক পশ্চাদপসরণ। ট্রাম্পের পরাজয় মার্কিন গণতন্ত্রের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির কান-ঘেঁষা সক্ষমতা প্রমাণ করলেও তাদের দুর্বলতাগুলিও উন্মোচিত করেছে।

গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীনের পরিবর্তনও অমঙ্গলসূচক। চীন কখনো উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু তার একদলীয় শাসন গত কয়েক দশকে একক ব্যক্তি নেতৃত্বের পরিবর্তে সীমিত যৌথ নেতৃত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। গত কয়েক বছরে শি জিন পিং-এর ব্যক্তি নেতৃত্ব সুদৃঢ় হয়েছে এবং তার ব্যক্তি নেতৃত্বের কালসীমা পরিত্যক্ত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিপীড়ণ দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে নিজের ভূমিকা পরিত্যাগ করে বিশ্বের দুই পরাশক্তির একটি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার নাতিপ্রচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করেছে। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চীনা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য একনিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করছে।

গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের একটি দুঃখজনক উদাহরণ দক্ষিণ এশিয়া। এখানকার দেশগুলির মধ্যে ভারতকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় সাত দশকব্যাপী। গত কয়েক মাসে বিশ্বের তিনটি প্রধান গণতন্ত্র মূল্যায়ন সংস্থা ২০২০ সালের বিশ্লেষণী রিপোর্টে গণতান্ত্রিকতার মাপকাঠিতে ভারতকে অনপেক্ষ এবং তুলনামূলকভাবে পদাবনমিত করেছে।

অতিমারী উত্তরকালে বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে? এই আলোচনা অর্থনৈতিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে; গণতন্ত্রায়নের সমস্যা আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই।

বিশ্বায়নের ধারা স্থিমিত হওয়ার প্রথম কারণ যেটি উল্লেখ করেছি - উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে সামাজিক আয়ব্যয় পরিগণন - তা মঙ্গলজনক। বিশ্বায়নের প্রথম স্রোতে এই

বিষয়টি উপেক্ষা করার ফলে যে বিপুল সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষতি, বিশেষভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, ঘটেছে তার কিছু আলোচনা আমরা করেছি। ভবিষ্যতে এর প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি অনিবার্য এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে শিল্পোন্নত দেশ থেকে পুঁজি বহির্গমন এবং দ্রব্য আমদানি বৃদ্ধির প্রবণতা কমবে। উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় বাড়বে। কিন্তু এর ফলে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস হবে তা অমঙ্গলজনক মনে করার কারণ নেই।

সামগ্রিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত রপ্তানি দ্রব্য (যেমন পরিধেয়বস্ত্র)-এর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণ নেই। এই জাতীয় যে সমস্ত দ্রব্যোৎপাদন শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বন্ধ হয়ে গেছে সামাজিক আয় ব্যয়ও অন্যান্য বহিঃপ্রভাব পরিগণনার ফলে তাতে তাদের তুলনামূলক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ফিরে পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের পরস্পরের তুলনামূলক রপ্তানি সক্ষমতায় পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই ধরনের দ্রব্যের চাহিদা ক্রেতাদের আয়বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে না। বিশ্বায়নের যুগে যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ উন্মুক্ত বাজারের সুযোগ নিয়ে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল তারা ক্রমাগত রপ্তানি দ্রব্যের সংমিশ্রণ পরিবর্তন করে ক্রমশ জটিলতর এবং উচ্চ চাহিদাযুক্ত দ্রব্যের অংশ বৃদ্ধি করে চলেছিল। ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া আলোচিত কারণগুলির জন্য অনেক শ্লথ হবে। তাছাড়া নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত আশাবাদ সেবা রপ্তানি - পর্যটন, কলসেন্টার, প্রত্যক্ষভাবে সীমাবহির্ভূত শ্রমনিয়োগ-ইত্যাদি ক্ষেত্র সমূহে প্রয়োগ করা যায় না; এই সমস্ত ক্ষেত্রে চলমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তন শিল্পোন্নত দেশের বাজারে উন্নয়নশীল দেশগুলির অনুপ্রবেশ ইতিমধ্যেই ব্যাহত করা শুরু করেছে বলে আমার অনুমান।

উন্নয়নশীল দেশগুলি অন্য যে বিশ্বায়ন সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে তা বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত আয়। আপাতবিরুদ্ধভাবে অতিমারীর প্রথম দিকে বহু উন্নয়নশীল দেশে এই প্রেরিত আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। বিশ্লেষকরা এর কারণ হিসেবে নানাধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু কেউ এই কারণগুলির মধ্যে এই প্রবণতাটির স্থায়ীত্বের প্রতিশ্রুতি খুঁজে পাননি। প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থের স্থায়ী নির্ধারক প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা এবং তাদের মজুরির হার। গত বছরে এই দুই-ই হ্রাস পেয়েছে। নিকটবর্তী বা দূরবর্তী ভবিষ্যতে এই প্রবণতা বিপরীতগামী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিষয়টি বিশেষভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ জ্বালানি রপ্তানিকারক দেশ সমূহ থকে প্রেরিত প্রবাসী শ্রমিকদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল তাদের প্রতি প্রযোজ্য।

দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়নের গতিধারার পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি একযোগে বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস এবং বিনিয়োগের বৈদেশিক উৎস হ্রাস দ্বারা আক্রান্ত হবে। অতএব উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির অন্তর্মুখীনতা বাড়াতে হবে। কিন্তু চাহিদার অন্তর্মুখীনতার অর্থ অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার যার জন্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রয়োজন বিনিয়োগে দেশজ আয়ের বৃহত্তর অংশের বরাদ্দ।

এই দুই আপাতবিরোধী কার্য সাধন সম্ভব আয় ও সম্পদের ব্যাপক পুনর্বণ্টন দ্বারা : বিত্তশালী শ্রেণির আয় ও সম্পদ, যার বৃহদংশ সম্ভবত প্রচ্ছন্ন পুঁজি পাচার জাতীয় কর্মে নিয়োজিত, তার একাংশ স্বল্প বিত্তদের আয় বৃদ্ধিতে এবং বিনিয়োগে নিয়োজন। যথাযোগ্য পুনর্বণ্টন ছাড়া উৎপাদনের অন্তর্মুখীনতার অর্থ প্রবৃদ্ধি হ্রাস।

আমার বিচারে স্তিমিত বিশ্বায়নের সম্মুখীন হওয়ার প্রধান সমস্যা এইখানে। বিশ্বায়নের কালে যে বিপুল বণ্টনবৈষম্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বেড়ে উঠেছে তার পরিপূরক হিসাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিকতার যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার অবসান ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অসম্ভব।

আমার ওপরের বক্তব্য এই যে পুঁজিবাদী বাজারের পরিগণনায় যেহেতু বৃহত্তর সামাজিক লাভক্ষতি সংক্রান্ত বহিঃপ্রভাব ধরা পড়ে না তাই বিশ্বায়নের প্রণোদনা সামাজিক স্বার্থে কাম্য প্রণোদনা অতিক্রম করেছিল; সামাজিক লাভক্ষতির যথার্থ পরিগণনা হলে বিশ্বায়নের হার হয়তো কম হত অথবা বিশ্বায়নের প্রকৃতি ভিন্ন হত। বহিঃপ্রভাবকে লাভক্ষতির হিসাবে গণ্য করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অর্থনীতিশাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধান আছে যদিও তাদের প্রয়োগ প্রায়শ রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন হয়।

বহিঃপ্রভাব পরিগণনার অতিরিক্ত কারণে বিশ্বায়নে বাধা সৃষ্টি অমঙ্গলজনক; এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ওপরের আলোচনায় সঙ্কটোত্তর কালে শিল্পোন্নত বিশ্বের আচরণ বিশ্বায়নের অমঙ্গলসূচক সঙ্কোচন ঘটাতে পারে, এই আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই হতে পারে যে তাদের পক্ষেও বিশ্ববাজার থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে প্রাক বিশ্বায়ন যুগের সংরক্ষণনীতিতে ফিরে যাওয়া উচিত। এ বিষয়ে অর্থনীতি শাস্ত্রের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে বিশ্ববাজার যতটুকু উন্মুক্ত থাকে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে তাদের উৎপাদন ও বহির্বাণিজ্য নিজ নিজ তুলনামূলক সুবিধার যথাযথ পরিগণনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজেদের পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাজার উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। যদিও এতকাল উন্নয়নশীল গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্তির দাবিদারদের মধ্যে প্রধানতম দেশগুলির সাম্প্রতিক আচরণ ক্রমশই এই লক্ষ্যের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে। এর প্রধান উদাহরণ বিশ্বআধিপত্য বিস্তারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগী হিসাবে চীনের উত্থানের ক্রমবিস্তৃত স্পষ্টতা এবং চীন প্রতিরোধে আমেরিকার নবতম 'চতুর্ভূজ' কৌশলে জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগদান।

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি?

মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত

অর্থনীতির ভিত ছাড়া সংস্কৃতি কি মজবুত রাজনীতির দেওয়াল হতে পারে?

আমরা যখন এই প্রবন্ধ লিখছি, রাজ্যে তখন বিধানসভা নির্বাচন চলছে– তাই বাংলার রাজনীতি থেকে নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। এই নির্বাচনে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক অনেকগুলো পরিচিত উপাদান মিশেছে, আর তার ওপর রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলগুলির প্রতি বিক্ষোভ তো আছেই। কিন্তু এ বারের নির্বাচনে দুটো বেশ অভিনব উপাদান এই পরিচিত মিশ্রণে সংযোজিত হয়েছে– প্রথমত, সাম্প্রতিক কালে এই প্রথম রাজ্য নির্বাচনে মতাদর্শের দিক থেকে তিনটে খুব আলাদা ধারার রাজনীতির মধ্যে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব– তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, এবং বাম-জোট। এর আগেও তৃণমূল, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে ২০১১ সালে তৃণমূলের এবং ২০১৬ সালে বামফ্রন্টের নির্বাচনী সমঝোতা ছিল। কিন্তু আরো বড়ো কথা, মতাদর্শগতভাবে বিজেপি বাকি দলগুলি থেকে অনেকটা আলাদা। তার একটা দিক অবশ্যই হল হিন্দুত্ববাদ এবং বিভাজনের রাজনীতি। কিন্তু আর একটি দিক নিয়ে তুলনায় আলোচনা কম হচ্ছে– সেটা হল, সাংস্কৃতিক। বিজেপি মূলত উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় একটি দল, যার বাংলার মাটিতে শিকড় খুব গভীর নয়।

কেউ কেউ বলছেন বটে যে, বিজেপি আসলে ঘরে ফিরছে– তার পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘের জন্ম তো এই বাংলার মাটিতেই– কিন্তু সে কথা যদি মেনেও নেওয়া যায়, তবু এই জন্মান্তরে বিজেপি-র রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে 'বাঙালিত্ব' বা 'বাঙালিয়ানা' বলতে আমরা যা বুঝি, তার কিছু মৌলিক বিরোধ আছে। সেই বিরোধের কথা তুলেও অনেকে বলছেন, 'বাঙালিত্বের' অস্তিত্বরক্ষার জন্য বিজেপি-কে আটকানো দরকার। অনেকে আবার আশা করছেন, চরিত্রে মৌলিকভাবে 'বাঙালিত্বের' মিশ্রণ কম হওয়ার কারণেই বিজেপি শেষ অবধি বাংলায় 'বহিরাগত' হয়েই থেকে যাবে, রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের নাগালে আসবে না। এখানে বলে রাখা ভালো যে, 'বাঙালিত্ব' কথাটাকে এখানে সাংস্কৃতিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, আঞ্চলিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। কেউ যেমন বাংলায় জন্মে, বসবাস করে, এবং আঞ্চলিক পরিচিতির দিক থেকে বাঙালি হয়েও বাঙালিত্ব-বর্জিত হতে পারেন, আবার সে রকমই কেউ বাংলার বাইরে (এমনকী বিদেশে) জন্মে বা বাংলার বাইরে বসবাস করে বা আঞ্চলিক পরিচিতির দিক থেকে বাঙালি না হয়েও বাঙালিত্বে সম্পৃক্ত হতে পারেন।

রাজনীতির ময়দানে শেষ অবধি কী হবে, সেই প্রশ্নে ঢুকব না। বরং প্রশ্ন করা যাক, বাঙালিত্ব বলতে কী বোঝায়?

এটা ঘটনা যে, ভারতের সব রাজ্য বা অঞ্চলেরই যেমন নিজস্ব সাংস্কৃতিক চরিত্র ও সামাজিক রীতিনীতি আছে, সে বিষয়ে একটা গর্বও আছে। বাঙালির বাঙালিত্বই হোক, গুজরাতি অস্মিতাই হোক, মারাঠি মানুষই হোক, তামিলনাড়ু থেকে পঞ্জাব, কেরল থেকে কাশ্মীর, অসম থেকে রাজস্থান, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান আর তার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব– এই দুটো দিকই দেখতে পাওয়া যাবে। 'বাঙালিত্ব' নামক বায়বীয় বস্তুটিকে যদি ভেঙে অথবা খুলে দেখা যায়, তা হলে তার কয়েকটা সুনির্দিষ্ট দিকচিহ্ন পাওয়া যাবে। উনিশ শতকের নবজাগরণ থেকে পাওয়া উদার বিশ্ববীক্ষা, বহুত্ববাদে বিশ্বাস, বিজ্ঞানমনস্কতা যেমন তার একটি দিক, তার আর এক দিক হল লোকসংস্কৃতির এক বহমান ধারা, যাতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও দর্শনের উপধারা এসে মিশেছে– যেমন বাউল গান, যাতে আধ্যাত্মিকতা ও প্রেমের সঙ্গে মিশেছে মানবিকতা ও সমন্বয়ী ভাবধারার কোমল স্পর্শ। তেমনই আবার বাংলা ভাষা, ও সেই ভাষাবাহিত সংস্কৃতিও এই বাঙালিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত, সেই সংস্কৃতির মধ্যেই বাঙালিত্বের অন্যান্য চরিত্রলক্ষণগুলি ঢুকে পড়ে। অর্থাৎ, বাঙালিত্ব বস্তুটি মূলত তার সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। নিন্দুকে বলবে যে, অলস, উদ্যোগহীন, মুখেন মারিতং জগৎ চরিত্রটিও বাঙালির মজ্জাগত; অথবা গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী তৈরি করে নিরন্তর কোন্দল

করে চলাও বাঙালিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু, প্রথমত এ হল মূলত বাঁধা মাইনের চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে একটা ছাঁচে ফেলা সামাজিক পর্যবেক্ষণ– তার বাইরে একটা বড়ো শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রে কথাটি খাটে না। আর তা ছাড়া চরিত্রের এই দিকগুলো নিয়ে কেউ গর্ব করেন বলে সন্দেহ হয় না। অতএব, যে বাঙালিত্বের সঙ্গে বিজেপির ভাবধারার চরিত্রগত বিরোধ, এবং যে বাঙালিত্বের অস্ত্রে এই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকানোর কথা ভাবছেন কেউ কেউ, সেটা মূলত সাংস্কৃতিক, ইতিবাচক বাঙালিত্ব।

আমরা জানি যে, 'সংস্কৃতি' কথাটির মধ্যে অনেক কিছু নিহিত আছে– তাই ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনাও থেকে যায়। এক দিকে সংস্কৃতি বলতে যেমন শিল্প সাহিত্য সংগীত এবং সে বিষয়ে রুচি বোঝায়, তেমন আবার কথাটি জীবনদর্শন, মূল্যবোধ, সামাজিক রীতিনীতি, ও আচার-আচরণ ইত্যাদি বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়। তথাকথিত উচ্চমার্গের (যাকে high brow বা elite culture বলা হয়) এবং লোকসংস্কৃতির মধ্যে তফাৎ আছে, তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক শ্রেণির কাছে সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তার বাইরেও সংস্কৃতির একটা বড়ো পরিধি আছে এবং এ সবের মধ্যে সম্পর্ক সব সময়ে অনায়াস সমন্বয়ের বা প্রীতিমূলক সহাবস্থানের, তা-ও নয়। কিন্তু একই কথা খাটে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে– কে ব্যবহার করছেন, কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে, কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার মধ্যে অনেক বৈচিত্র; কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা সাধারণ চরিত্র আছে বলেই তাকে আমরা বাংলা ভাষা বলে বর্ণনা করি। তাই আপাতত এই জটিলতা সরিয়ে রেখে আলোচনার সুবিধার্থে 'বাংলা সংস্কৃতি' বলে একটা কিছু আছে, সেটা ধরে নিয়েই এগোনো যাক।

এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কোন বা কার বাংলা সংস্কৃতির কথা বলা হচ্ছে? যতই হোক, বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে বহু ধারা মিশে আছে, তার কোনটা উচ্চ কোনটা নিম্নমার্গের, কোনটা কালোত্তীর্ণ কোনটা সাময়িক, তা কে ঠিক করবে? আর এই লেখাটিতে যে উদাহরণগুলো দেব, তার থেকে মনে হতে পারে যে, আমরা এক ধরনের নাগরিক এলিট বঙ্গসংস্কৃতিকেই "উচ্চমার্গের" সংস্কৃতি বলছি। এখানে দুটো কথা বলা দরকার। আমরা আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পরিচিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ের থেকে উদাহরণগুলো নির্বাচন করেছি, তাই এই চয়ন নৈর্ব্যক্তিক নয়– যে কোনো ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা সূত্রে আহৃত উদাহরণের মধ্যে তার নির্বাচনে একটা পক্ষপাত থাকতে বাধ্য। তার মধ্যে কোনো শ্রেণিবিভাগ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়– লালন ফকিরের গান আর রবীন্দ্রসংগীত, পাঁচালি আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান, সলিল চৌধুরীর গণসংগীত আর শচীন বা রাহুল দেব বর্মণের আধুনিক গান, পটশিল্প থেকে নন্দলাল বসু, চিত্তপ্রসাদ থেকে গণেশ পাইন– এমন কোনো নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড নেই যাতে এদের মধ্যে গুণমানের (ব্যক্তিগত পছন্দের নয়) তুলনা করা যায়।

কিন্তু, একই সঙ্গে এই কথাটাও বলে রাখা যাক, আমরা মনে করি না যে সব সংস্কৃতি গুণগতভাবে তুল্যমূল্য। অর্থাৎ, নাগরিক সমাজেই হোক বা লোকসমাজে, যেকোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ঘরানার মধ্যে একটা অংশকে যদি উচ্চমার্গের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করতে হয়, অন্য একটা অংশকে প্রাকৃত সংস্কৃতি বলেও চিহ্নিত করতে হবে। সেই শ্রেণিবিভাগের মাপকাঠি কী হবে? এই প্রশ্নটার একটা উত্তর হতে পারে এই রকম – এক, যদি কোনো সংস্কৃতি অর্জন করতে খানিকটা পরিশ্রম বা চর্চা বা সাধনা করতে হয়; দুই, যদি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সেই সংস্কৃতিকে বহমান করার তাগিদ থাকে; এবং তিন, সেই সংস্কৃতি যদি সেই গোষ্ঠীর বাইরে থেকে এসে কেউ যথাযথ চর্চা করেন তার উৎকর্ষ উপলব্ধি করবেন – তবে সেই সংস্কৃতিকে আমরা উৎকর্ষের বিচারে উচ্চমার্গের সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করব। এই লেখায় বহু বার উচ্চমার্গের সংস্কৃতি বা কাছাকাছি গোত্রের শব্দ ব্যবহৃত হবে। যদিও আগের অনুচ্ছেদেই আমরা স্বীকার করেছি যে আমাদের উদাহরণ চয়নের মধ্যে একটা পক্ষপাত আছে, কিন্তু আরো এক বার মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন: আমরা মনে করি না যে আমাদের ব্যবহৃত উদাহরণগুলিই উচ্চমার্গের সংস্কৃতির একমাত্র উদাহরণ। এইখানে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা আমরা নির্ধারণ করলাম, গোটা লেখায় সেই সংজ্ঞা অনুসারেই শব্দটিকে বুঝতে হবে।

এই বারে প্রশ্ন– এই 'সংস্কৃতি' নামক বস্তুটাকে কি রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করা যায়? বিভেদমূলক হিংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে কি গড়ে তোলা যায় এক অদৃশ্য দেয়াল? বাংলা ভাষায় লিখে এই প্রশ্নটা উত্থাপন করলে ইতিহাস অট্টহাস্য করে উঠতে পারে। বাংলাই তো সেই ভাষা, যা একটা নয়, দুটো ভাষা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, আর অসমে। সেই ভাষা আজ রাজনৈতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারবে না? এ ক্ষেত্রে মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি, পূর্ব পাকিস্তান বা অসম, উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রশক্তি ভিন্ন ভাষাকে বঙ্গভাষী জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিতে চাওয়ায়, বাংলা ভাষাকে তার প্রাপ্য গুরুত্বটুকুও না দিতে চাওয়ায়। ভবিষ্যতে কী হবে তা বলা যায় না, কিন্তু বর্তমানে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানে যেভাবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি আগ্রাসন সে তুলনায় কিছুই নয়। এবং, এখনও হিন্দির পিছনে যে রাষ্ট্রীয় মদত, তা প্রচ্ছন্ন। তাতে দখলদারি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু এখনও একাধিপত্য নেই। ফলে, ভাষার বিপন্নতা দিয়ে

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আবেগের সূত্রে বাঁধার অবকাশ পশ্চিমবঙ্গে এখনও নেই।

ফলে, ভাষা বা সংস্কৃতিকে যদি প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে উঠতে হয়, তা হতে হবে ভাষা বা সংস্কৃতির প্রতি গর্বের জায়গা থেকে, অথবা তার ব্যবহারিক উপযোগিতার কারণে। এই প্রশ্নের উত্তর যে যাঁর মতো করে খুঁজতে পারেন, অবশ্যই। আমরা যেহেতু পেশাগত দিক থেকে– এক জন প্রত্যক্ষভাবে, আর অন্য জন খানিক ঘুরপথে– অর্থনীতির চর্চা করি, তাই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব অর্থশাস্ত্রের চৌহদ্দিতে। এখানে গোড়াতেই একটা আপত্তি উঠতে পারে– সংস্কৃতির মতো বিষয়ের সঙ্গে কি অর্থনীতির সম্পর্ক তেল আর জলের নয়? এই দুটো জিনিস আদৌ মিশ খায়? ভ্যান গঘ থেকে ঋত্বিক ঘটক, সাদাত হোসেন মান্টো থেকে জীবনানন্দ দাশ– কে আর কবে বাজারের তোয়াক্কা করে শিল্প তৈরি করেছেন? ক্রেডিট কার্ডের বিজ্ঞাপনের ভাষা ধার করে বরং বলা যায়, কিছু কিছু জিনিস আছে, টাকা দিয়ে যা কেনা যায় না– সংস্কৃতি তো সে রকমই একটা জিনিস। তা হলে, সংস্কৃতির অলৌকিক প্রশ্নটাকে অর্থশাস্ত্রের লৌকিক পরিসরে এনে ফেলা কেন? এই প্রশ্নটার উত্তর লেখার শুরুতেই দিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু, আমাদের আশা, এই লেখা ধাপে ধাপে যেভাবে এগোবে, তাতে নিজে থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, কেন সংস্কৃতির প্রশ্নটাকে অর্থশাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে দেখা জরুরি।

সংস্কৃতির অন্য উপাদানগুলোর কথায় আসার আগে গোড়ায় ভাষার প্রশ্নটাকে তোলা যাক। বাংলা ভাষা নিয়ে গর্বের প্রশ্ন– হিন্দির আগ্রাসন সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ তৈরি করার জন্য নিজের ভাষা নিয়ে যে গর্বটা থাকা একেবারে জরুরি শর্ত। ধরে নিতেই পারি, মাতৃভাষা নিয়ে প্রত্যেক বাঙালির গর্ব আছে। কার গর্বের পরিমাণ কতখানি, সেই বিচারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই– আপাতত ধরে নেওয়া যায় যে, কারও সঙ্গে কারও গর্বের পরিমাণের তুলনা করা যায় না। কিন্তু, সেই গর্বটা তাঁদের ব্যক্তিগত বনাম ব্যবহারিক জীবনযাত্রাকে কতটা প্রভাবিত করছে, সেটা দেখা যেতে পারে। এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো যে, নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা মানেই অন্য ভাষা বা সংস্কৃতির বিরোধিতা করা নয়। এখানেও সমন্বয় আর বিরোধিতা এই দুটি মডেল আছে– "নিজের রাজ্যে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলব না", এই অবস্থানটা যাঁরা নেন তাঁরা মাতৃভাষার প্রতি গর্ববোধ থেকেই গ্রহণ করেন, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এখন নিকটবর্তী রাজ্য থেকে সদ্য আসা এক জন দরিদ্র শ্রমিক, যিনি হিন্দি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না, তাঁর ক্ষেত্রে এটার প্রয়োগ আর যাঁরা সুযোগ সত্ত্বেও বাংলা শেখা বা বলার বা বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান দেখানোর চেষ্টা করেন না (যেমন দোকানের বা পথনির্দেশের সাইনবোর্ডে আদৌ বাংলা না থাকা, বা যিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না, তাঁর সাথে হিন্দি বা ইংরেজিতে কথা বলা) তাঁদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হোক, এটা চাওয়ার মধ্যে একটা বড়ো তফাত আছে। নিজেদের কথা বলতে গেলে বলব যে, আমরা উগ্র প্রাদেশিকতা বা 'আমরা বাঙালি' গোছের মানসিকতা কখনো সমর্থন করি না। আমাদের কাছে বাঙালিয়ানার একটা বড়ো দিক হল পরকে আপন করার অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসিকতা, আপনকে পর করার বিভেদমূলক মানসিকতার ঠিক যা বিপরীত। এবং সাংস্কৃতিক বলয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর খুব বেশি হাত চালানোর পক্ষপাতী নই– কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চা ও ব্যবহার যে কিছু কিছু পরিসরে অনভিপ্রেতভাবে সরে যাচ্ছে, এবং তা নিয়ে কিছু করা আমাদের কাছে পরিবেশরক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের অবস্থানটা পরিষ্কার করে এ বার আসি একটা অন্য প্রশ্নে– বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এই গর্ব করার ক্ষমতাটা কি মানুষের আর্থিক অবস্থানের সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা নয়? রাজ্য থেকে যত মানুষ ভিন্ রাজ্যে দক্ষ, অর্ধদক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যান, তাঁদের কাছে হিন্দিতে কথা বলতে পারা কি একটা বাড়তি যোগ্যতা নয়, যার মাধ্যমে তাঁরা আর একটু ভালো জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখতে পারেন? তেমন মানুষরা কি মাতৃভাষার গর্বে গর্বিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি বয়কট করার ডাকে সাড়া দেবেন? কেউ বলতেই পারেন, এই ধরনের মানুষের কাছে হিন্দি বলতে পারা এক অর্থে একটা 'অ্যাসপিরেশন'। যাঁরা সুবিধাজনক সামাজিক অবস্থানের কারণে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের ফলে ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ, এবং বাংলা-ইংরেজির দ্বিভাষিক পরিমণ্ডল থেকেই জীবিকানির্বাহ করতে সক্ষম, তাঁদের পক্ষে এই অ্যাসপিরেশন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন।

অর্থাৎ, ভাষার মতো সংস্কৃতির একেবারে প্রাথমিক উপাদানটির ক্ষেত্রেও জড়িয়ে যাচ্ছে অর্থনীতির প্রশ্ন। এই প্রশ্নটাকেই আমরা একটু অন্যভাবে পেশ করতে পারি। খোঁজ করতে পারি: ভাষা, বা বৃহত্তর অর্থে অবসরবিনোদনের জন্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে নানা পণ্য আছে (যার মধ্যে সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র, কলা ও কারুশিল্প, যাত্রা-নাটক সবই ধরা যেতে পারে) সেগুলি কি এক ধরনের লাক্সারি গুড বা বিলাসপণ্য? এখানে নৃতত্ত্বের ভাষায় সংস্কৃতিকে জীবনধারণের নানা আচার এই অর্থে নয়, খানিকটা সংকীর্ণ অর্থে অবসর ও বিনোদনমূলক নানা কর্মকাণ্ডের অর্থে বোঝাতে চাইছি। অর্থশাস্ত্রে লাক্সারি গুড-এর সংজ্ঞা এইরকম: মানুষের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে যে যে পণ্য, সেবা, ও পরিষেবার চাহিদা বাড়ে, অতএব উপভোগও বাড়ে, তাকেই বলে লাক্সারি গুড। বলে রাখা ভালো যে, বিলাসপণ্য মানে

'বিলাস' করার উপকরণ নয়– যা-ই আবশ্যক নয়, অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞায় তাকেই বিলাসপণ্য ধরা হয়। সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে আবশ্যক পণ্যের চাহিদা কমে, আর বিলাসপণ্যের চাহিদা বাড়ে। আমরা এই ক্ষেত্রে জানতে চাই যে, সংস্কৃতি কি এমন একটা পণ্য, মানুষের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যার চাহিদা বাড়ে; বা মানুষ যখন একটা সীমার নীচে আয় করে, তখন তার সংস্কৃতি উপভোগ করার সাধ্য থাকে না? সংস্কৃতি বা ভাষাকে যদি রাজনৈতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, তা হলে জানা প্রয়োজন যে, জনসাধারণের কত অংশের পক্ষে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব– কত শতাংশ অস্ত্রটি ব্যবহার করার মতো জায়গায় আছেন, এবং কত শতাংশের কাছে অস্ত্রটির আদৌ কোনো তাৎপর্য আছে। সেই কারণেই বোঝা প্রয়োজন, ভাষা বা সংস্কৃতি অর্থনৈতিক 'পণ্য' হিসেবে ঠিক কোন চরিত্রের।

এই ক্ষেত্রে আরো একটা কথা স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো– 'সংস্কৃতি' বলতে অনেক সময়েই 'হাই কালচার' বা 'উচ্চমার্গের সংস্কৃতি'-কে বোঝানো হয়। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মহলে বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব এবং বাংলাচর্চার আপাত- নিম্নমুখী ধারা নিয়ে আশঙ্কা অবশ্যই সেই 'হাই কালচার'-এর অন্তর্গত। তবে শুধু তাই নয় – বাংলা ভাষার প্রতি মমতা এই বৃত্তের বাইরেও কিছু কম নয়। রাজ্যের বাইরে (দেশে বা বিদেশে) বাংলা বলতে শুনে অন্য বঙ্গভাষীদের আন্তরিক ও উষ্ণ ব্যবহার পাওয়ার বা অযাচিতভাবে উদার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই। তাঁরা অনেকেই সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে উচ্চশ্রেণির মানুষ নন। উচ্চমার্গের সংস্কৃতির কথা বললে অবধারিতভাবে নিম্নমার্গের সংস্কৃতি, বা বিগত এক জমানার পরিভাষায় 'অপসংস্কৃতি'-র কথা উঠতে বাধ্য। আমরা আমাদের বক্তব্যের দিক থেকে কোনটা উচ্চমার্গ, আর কোনটা নিম্নমার্গ, সেটা কী করে ঠিক হবে, এই সমস্যাজনক ব্যাপারটার মধ্যে বেশি ঢুকব না – বরং নিরপেক্ষভাবে, ভাষার শ্রেণিবিভাগের মতো এদের মার্জিত (বা তৎসম) আর প্রাকৃত, এই অর্থে ব্যবহার করব।

আলোচনা যখন অর্থশাস্ত্রের চৌহদ্দিতে ঢুকেই পড়েছে, তখন চাহিদা আর জোগানের প্রসঙ্গে না ঢুকে উপায় নেই। কোনো অঞ্চলে, যেমন ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে, উচ্চমার্গের সংস্কৃতি বস্তুটির চাহিদা আর যোগান কি নির্ভর করে সেই অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধির উপর?

যদি বাজারের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই সেই পণ্যের যোগান নির্ধারিত হয়, তবে সন্দেহ নেই, তার কিছু নির্দিষ্ট শর্ত থাকবে। ভালো গুণমানের সিনেমা-থিয়েটার তৈরি করতে হলে তার একটি ফিক্সড কস্ট বা নির্দিষ্ট বাঁধা খরচ আছে। ভালো বই ছেপে বার করার জন্যও বাঁধা খরচ আছে, আবার যত ছাপা হবে, সেই অনুপাতে খরচও আছে। ভালো ছবি প্রদর্শনীর জন্য গ্যালারি প্রয়োজন, ভালো গান-বাজনার জন্য ভালো মানের প্রেক্ষাগৃহ, রেকর্ডিং স্টুডিয়ো ইত্যাদি প্রয়োজন। অর্থাৎ, উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক পণ্যের যোগানের জন্য অর্থ প্রয়োজন। তার জন্য বেশ কিছু অর্থবান ব্যক্তি প্রয়োজন, আবার বেশ কিছু গুণী ব্যক্তিও প্রয়োজন, যাঁরা অন্য কোনো পেশায় না গিয়ে সাংস্কৃতিক পণ্য নির্মাণের কাজটি করবেন। উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক পণ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক এক্সটার্নালিটিজ়-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে– অর্থাৎ, তেমন পণ্য তৈরির জন্য তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক গুণী মানুষের প্রয়োজন হয়। কিছু মাঝারি মেধার লোক জোগাড় করতে পারলেই একটি টিভি সিরিয়াল তৈরি করে ফেলা যায়, কিন্তু ভালো মানের নাটক তৈরি করার জন্য উৎকৃষ্ট মেধার প্রয়োজন পড়ে।

চাহিদার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কেমন? লেখার শুরুতে হিন্দির বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা ব্যবহারের চাহিদার ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, জীবিকার কারণে যাঁরা হিন্দির উপর নির্ভরশীল, তাঁদের পক্ষে মাতৃভাষার প্রতি গর্বকে তার ব্যবহারের চাহিদায় রূপান্তরিত করা কঠিন। এই কথাটাই একটু বৃহত্তর অর্থে যাবতীয় উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক চাহিদার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় কি? একটা ন্যূনতম আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে, সংস্কৃতির পিছনে সময় বা অর্থ ব্যয় করার মানে হল, বেঁচে থাকার অন্য কোনো জরুরি উপাদানের জন্য সময় বা অর্থ কম ব্যয় করতে পারা। কথাটা সবার ক্ষেত্রেই সত্যি – শ্রম ও অবসরের মধ্যে সময়ের বণ্টন (যাকে পরিভাষায় 'লেবার-লিজ়ার ট্রেড অফ' বলে) অর্থশাস্ত্রের একেবারে মৌলিক বিষয়গুলোর একটা। বস্তুত, কার্ল মার্কস কমিউনিজম-এর সর্বোচ্চ স্তরের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে যে কল্পনাটি ব্যবহার করেছিলেন, তার মূল কথা ছিল বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় আরোপিত শ্রমের বিভাজন এবং আর্থিক অনটনের দায়ে শ্রম ও অবসরের মধ্যে পছন্দসই ভারসাম্য বেছে নেবার বিলাসিতা থাকে না। কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় এই টানাপোড়েন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ সকালে শিকার, বিকেলে মাছ ধরা, সন্ধেবেলা শিল্প সমালোচনা করতে পারবে, এবং এদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না - অর্থাৎ অবসর যাপনের সময়ে রুজিরুটিতে টান পড়ার কথা ভাবতে হবে না। কিন্তু, সে বাস্তব এক ভিন্ন সাধনার ফল। আমরা যে দুনিয়ায় থাকি, সেখানে কিন্তু, অর্থনৈতিকভাবে একটি সীমারেখার নীচে থাকা মানুষের কাছে উচ্চমার্গের সংস্কৃতিকে বেছে নেওয়ার অর্থ, সটান রুজিরুটিতে টান পড়া। অর্থাৎ, আয় একটি ন্যূনতম স্তরে না পৌঁছোলে উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক পণ্যের চাহিদা তৈরি হয় না। কাজেই, একে বিলাসপণ্য না বলে উপায় নেই।

চাহিদা আর যোগানের অঙ্কটাকে এক সঙ্গে দেখলে উচ্চমার্গের

সাংস্কৃতিক পণ্যের বাজারের ছবিটা কেমন হবে? যত ক্ষণ না জনসংখ্যার একটা বড়ো মাপের হাতে যথেষ্ট আয়ের সংস্থান হবে, তত ক্ষণ অবধি উচ্চমার্গের সাংস্কৃতিক পণ্যের চাহিদা তৈরি হবে না। এবং, চাহিদা না থাকার কারণে যথেষ্ট জোগানের পরিস্থিতিও তৈরি হবে না। তার ফলে সাংস্কৃতিক পণ্যের বাজারে যা তৈরি হবে, তা হবে জনপ্রিয় কিন্তু প্রাকৃত শ্রেণির। অর্থাৎ, টুনির মা, টুম্পাসোনা, অথবা বেদের মেয়ে জ্যোৎসনা। অনেকে এই ধরনের ধরনের সাংস্কৃতিক পণ্যের ভোক্তা হওয়ার জন্যে লাভ অর্জন করতে দাম বেশি ধার্য করার দরকার হবে না। তাই এই পণ্য উপভোগ করার ব্যয়ও কম, ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল হলেও তার চাহিদা থাকে।

প্রশ্ন হল, মানুষের আয় বাড়লেই কি প্রাকৃত সাংস্কৃতিক পণ্যের চাহিদা কমে আর মার্জিত সাংস্কৃতিক পণ্যের চাহিদা বাড়ে? প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষের হাতে সময় যেহেতু সীমিত, তাই একটার চাহিদা বাড়লে অন্যটার চাহিদা কমবে। ফলে, আয় বাড়লে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা বাড়বে কি না, এই প্রশ্নের জবাব অনেকাংশে নির্ভর করছে আয় বাড়লে প্রাকৃত সংস্কৃতির চাহিদা কমে কি না, তার উপর। অর্থাৎ, প্রাকৃত সংস্কৃতি কি সস্তার জিনিসের মতো অর্থনীতির ভাষায় ইনফিরিয়র গুড বা নিকৃষ্ট পণ্য– উপভোক্তার আয় বাড়লে যে পণ্যের চাহিদা কমে? ঘটনা হল, আয় বাড়লে যেমন বিড়িসেবী মানুষ সাধারণত সিগারেট খেতে আরম্ভ করেন, বা বাংলা মদ্যের উপভোক্তা হয়ে ওঠেন স্কচ হুইস্কির রসিক, প্রাকৃত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমন কথা বলা মুশকিল। যিনি আশৈশব 'প্রেম জেগেছে আমার মনে বলছি আমি তাই' শুনে যুবক হয়েছেন, আয় বাড়লেই তিনি 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে' শুনতে আরম্ভ করবেন– অভিজ্ঞতা বলে, ছবিটা ঠিক সে রকম নয়। সংস্কৃতি চরিত্রে আঠালো– লাগলে পরে ছাড়ে না!

তবে, ক্ষেত্রবিশেষে ছাড়েও বটে। উচ্চমার্গের সংস্কৃতির একটা সঙ্গপ্রভাব (যাকে পরিভাষায় পিয়ার এফেক্ট বলে) থাকতে পারে– অর্থাৎ, অবস্থার উন্নতির ফলে আমি যে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে প্রবেশ করেছি, সেই শ্রেণিতে অন্যদের মধ্যে যদি উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা থাকে, তবে নিজেকে সেই শ্রেণির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আমার মধ্যেও উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা তৈরি হতে পারে। এটা আরো বেশি প্রকট হয় পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, নতুন আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে যদি উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা থাকে, তবে আমি নিজের সন্তানের মধ্যে সেই সংস্কৃতির প্রতি আসক্তি তৈরিতে সচেষ্ট হব, যাতে সে এই শ্রেণিতে আরো স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে।

অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির প্রতি চাহিদার জন্য উপভোক্তার আর্থিক সচ্ছলতা থাকাটা জরুরি শর্ত, কিন্তু যথেষ্ট শর্ত নয়। অন্য ভাষায় বললে, উচ্চমার্গের সংস্কৃতির জন্য চাহিদা তৈরি হতে গেলে অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে উপভোক্তাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হতে হবে– কিন্তু, সামগ্রিকভাবে আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেই যে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির চাহিদা তৈরি হবে, এমন কোনো কথা নেই। তার জন্য প্রয়োজন একটা অন্য জিনিসের– আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চমার্গের সংস্কৃতির একটা যোগসূত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ, কোনো একটি সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্র যদি এমন হয় যে, তার আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চ সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত– কেউ আর্থিকভাবে, লৌকিকভাবে সফল হতে চাইলে তৎসম সংস্কৃতিতে অংশ না নিয়ে তার কোনো উপায় থাকবে না– তা হলে সেই সমাজে আর্থিক সচ্ছলতার জরুরি শর্ত হবে তৎসম সংস্কৃতিতে অধিকার। তেমন সমাজে আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তৎসম সংস্কৃতির চাহিদা বাড়বে। তেমন একটা গোটা সমাজের কথা কল্পনা যদি না-ও করা যায়, দুটো পেশাকে পাশাপাশি রেখে ভাবলে হয়তো ছবিটা বুঝতে খানিক সুবিধা হবে। গ্রুপ থিয়েটারে এক জন নাট্যকর্মীকে যদি তাঁর পেশার শীর্ষ পৌঁছোতে হয়, তবে তাঁকে তৎসম সংস্কৃতিতে সড়গড় হতেই হবে– নচেৎ তাঁর সামাজিক মূলধনই গড়ে উঠবে না। কিন্তু কেউ যদি প্রোমোটিং পেশার শীর্ষে পৌঁছোতে চান, তাঁর সামাজিক মূলধনের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক বা উস্তাদ আবদুল করিম খাঁর 'যমুনা কি তীর'-এর সম্পর্ক নেই– এই বিষয়গুলিতে বিন্দুমাত্র দখল না থাকলেও তিনি তাঁর পেশার, এবং আর্থিক সমৃদ্ধির শীর্ষে উঠতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষের উদাহরণকে যদি সমাজের স্তরে নিয়ে এসে দেখা যায়, তা হলে আর্থিক সমৃদ্ধি ও উচ্চমার্গের সংস্কৃতির সম্পর্কটি বোঝা সম্ভব।

অথবা, ভাষা বা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যদি এমন কোনো খণ্ডজাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, যেখানে এই ভাষাগত পরিচিতি হয়ে উঠতে পারে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক সহযোগিতার যোগসূত্র, তা হলেও সংস্কৃতি আর আর্থিক সমৃদ্ধির মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। একটা কাল্পনিক উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, পশ্চিমবঙ্গের পরিসরে এমন একটা ভাষাভিত্তিক খণ্ডজাতীয়তাবাদের জন্ম হল, যেখানে বাঙালি শুধুমাত্র বাঙালির সঙ্গেই ব্যবসায়িক আদানপ্রদান করবে, শুধুমাত্র বাঙালিকেই চাকরি দেবে। এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা প্রয়োজন, এমন কোনো খণ্ডজাতীয়তাবাদের প্রতি আমাদের নৈতিক সমর্থন নেই– যে কোনো পরিচিতির ভিত্তিকেই কাউকে কোনো ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়াকে, অথবা কাউকে কোনো বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়াকে আমরা অন্যায় বলে মনে করি। এবং, এই ধরনের ব্যবস্থা যে আর্থিক ভাবে কুশলী হতে পারে না, সে কথাও নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কিন্তু, কঠোর ভাবে কাউকে বাদ

দেওয়া যদি না-ও হয়, শুধু বাঙালি পরিচিতির কারণে কিছু বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়, তবে বাঙালি পরিচয়টিকে লালন করার সঙ্গে– বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান হওয়ার সঙ্গে– আর্থিক সমৃদ্ধির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

লেখার শুরুতে যে প্রশ্নটা ছিল, তাতে ফিরে যাই– ভাষা বা সংস্কৃতি কি রাজনৈতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে? লেখায় যে সম্ভাবনাগুলো আলোচনা করলাম, তা এই রকম– এক, যদি রাষ্ট্রক্ষমতা জোরজবরদস্তি অন্য কোনো ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়, তা হলে ভাষা প্রতিরোধের অস্ত্র হতে পারে; এবং দুই, যদি ভাষা বা সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট চাহিদা থাকে, তা হলেও অন্য কোনো ভাষা বা সংস্কৃতির সামাজিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের আলোচনা গড়িয়েছে মূলত দ্বিতীয় সম্ভাবনার খাতেই। আমরা দেখেছি, ভাষা বা সংস্কৃতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার উপায় বাংলাভাষী বহু মানুষেরই নেই। কিন্তু, এত ক্ষণ যে প্রশ্নটাকে চেপে ধরা হয়নি, তা এই রকম: ভাষা বা সংস্কৃতিকে যে 'অবাঙালি' আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, বা তা করা প্রয়োজন, এই কথাটা অনুভব করেন কত জন? পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখলে স্বীকার করতেই হয়, খুব বেশি মানুষ সেই প্রয়োজন অনুভব করেন না।

কেন, সেই উত্তরের একটা আভাসমাত্র এই লেখায় থাকুক। স্বাধীনতার আগে থেকেই হরেক কারণে বাংলা ভাষার সঙ্গে, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনীতির যোগসূত্র ক্ষীণতর হয়েছে। বাংলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে ভিন ভাষাভাষীদের হাতে। এবং, অর্থনীতি আর সংস্কৃতি চলেছে দুটি ভিন্ন রুটের রেললাইনের মতো– একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো যোগসূত্র নেই। মূলত যে দ্বিভাষী, প্রকৃত অর্থেই বিশ্বনাগরিক বাঙালি নিজেদের অধিকার কায়েম করেছে বঙ্গসংস্কৃতির উপর, বঙ্গ অর্থনীতির কলকবজার সঙ্গে তাদের দূরত্ব বিপুল। অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন উচ্চ সংস্কৃতি ক্রমশ সাধারণ মানুষের আরো দূরবর্তী হয়েছে।

এই দূরত্ব ঘোচানোর চেষ্টা এলিট বঙ্গকূল বহু কাল করেনি। উচ্চ প্রেক্ষাগৃহ থেকে সংস্কৃতিকে কারখানার গেটে, আর হাটবারের মাঠে নিয়ে যেতে আগ্রহ দেখায়নি। বরং, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান বা ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি যে রামা কৈবর্ত আর হাসিম শেখের জন্য নয়, এটা ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের সময় মুসলমানদের তুলনায় দূরে সরে থাকা নিয়ে কালান্তর-এ যা লিখেছিলেন, এই মুহূর্তে 'সংস্কৃতিমান এলিট বাঙালি' আর 'প্রাকৃত বাঙালি'র দ্বিত্ব সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে– এত দিন যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছি, আজ সঙ্কটের কালে তাদের ভাই বলে ডাকলেই চলবে না। উলটোটাও হয়নি। কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আন্তরিক প্রচেষ্টা (যেমন, লোকসংগীতের ক্ষেত্রে মাদল বলে দলটি) সত্ত্বেও সাধারণ নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে লোকসংস্কৃতির যে সমৃদ্ধ ধারা তার থেকে দূরে সরে থেকেছে। এখন 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' বলে আর কী হবে।

'সংস্কৃতিমান বাঙালি' আপাতত স্বখাতসলিলে নিমজ্জমান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই লেখাটির প্রথম খসড়া পড়ে মনীষিতা দাশের অভিমত আমাদের বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে।

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে

অসংগতি

অরুণ সোম

মস্কো, ১১ আগস্ট ১৯৯২

... আমলা মহোদয়
    ততক্ষণে হাতে নিয়েছেন
লাল চামড়ায় মোড়া
    আমার পাসপোর্টখানা
হাত পড়ে গেছে
    বুঝি-বা বোমায়
        কাঁটাভরা কোনো শজারুর গায়ে
যেন কোনো ক্ষুর—
    দু-মুখেই যার ধার।
যেন হাত পড়ে গেছে
    গোটা বিশ হুলধারী
পাঁচ হাত লম্বা
    গোখরো সাপের গায়ে।
এটা পড়ো,
    পড়ে হিংসেয় মরো
সোভিয়েত দেশের আমি
    এক নাগরিক।

১৯২৯ সালে ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি লিখেছিলেন সোভিয়েত পাসপোর্টের ওপর কবিতা।

সোভিয়েত পাসপোর্ট। বাইরের মলাট আগাপাশতলা লাল, ওপরে সোনার জলে ছাপা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতীকচিহ্ন কাস্তে-হাতুড়ি, ভেতরেও সেই রাষ্ট্রীয় প্রতীকচিহ্ন, তার তলায় এক পৃষ্ঠায় অধিকারীর নাম, জন্মতারিখ, জন্মস্থান, ইস্যুর তারিখ, স্থান, মেয়াদ ইত্যাদি— এক পৃষ্ঠায় রুশিতে, অন্য পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাপ।

১৯২৯ সালের পাসপোর্টের চেহারা নয়, একবছর আগেরকারও নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে যায় তারও অনেক পরে। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে ইস্যু করা ছাড়পত্র— তারও এই চেহারা। যে-দেশের কোনো অস্তিত্ব নেই তার পাসপোর্ট? বিদেশের অনেক আমলার চোখ কপালে উঠে যাবে একেবারে অন্য কারণে: তন্নতন্ন করে খুঁজলেও রাশিয়া বা রুশ ফেডারেশন নামটির সন্ধান মিলবে না এর মধ্যে। মেয়াদ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। আবারও চমক।

আভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট নামে এদেশে প্রত্যেক বয়স্ক নাগরিকের জন্য আবহমানকাল ধরে যে-পরিচয়পত্র চলে আসছে তাও সোভিয়েত ইউনিয়নের। যে-দেশের কোনো অস্তিত্ব নেই, তার নাগরিক?

সবই লাল— যেমন ভেতরে, তেমনই বাইরে— অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুই পরিচয়পত্রেরই এই রং— এমনকী পরবর্তীকালে প্রতীকচিহ্ন এবং দেশের নাম পালটালেও ওই লাল রং থেকেই গেল। অবশ্য এতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। রুশিরা আবহমানকাল ধরে লালের ভক্ত। রুশিদের কাছে লাল এক অর্থে সুন্দরও বটে। রেড স্কোয়ার অর্থই সুন্দর স্কোয়ার, তার রং লাল, ক্রেমলিনেরও তাই। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

আজকের রাশিয়ায় অন্তত যত্রতত্র যা চোখে পড়ছে, তা কেবলই অসংগতি আর অসংগতি। মস্কোর দক্ষিণ অঞ্চল থেকে লেনিন্স্কি প্রস্পেক্ত (লেনিন অ্যাভিনিউ— শহরের দীর্ঘতম পথ) ধরে বাসে যেতে যেতে চোখে পড়ে বুলভারের মাঝখানে নিরেট ইস্পাতের তৈরি পাঁচ-ছ তলা উঁচু এক বিশাল মনুমেন্ট— সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই পরিচিত প্রতীক চিহ্ন— সঙ্গে বিরাট ইস্পাতের হরফে লেখা স্লোগান— "সোভিয়েত ইউনিয়ন— শান্তির রক্ষাদুর্গ'। ডান পাশে এককালের জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (পূর্ব জার্মানি) দূতাবাসের দালান— অনেক দিন হল অখণ্ড জার্মানির সম্পত্তি। আর একটু এগোলে বাঁ-ধারে হাভানা রেস্তোরাঁ— উঠে গেছে রাশিয়ার মাটি থেকে "হাভানা' নামটি— আছে শুধু রেস্তোরাঁ লেখাটা। অথচ বাস্তবকে উপেক্ষা করে উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ওই মনুমেন্টটা। ওই স্লোগান। সেনাবাহিনীতে, পার্লামেন্ট ভবনে, এমনকী যে সংবিধান আদালতে কমিউনিস্ট পার্টির বিচার চলছে সেখানেও বিচারকমণ্ডলীর মাথার উপর ঝুলছে কাস্তে-হাতুড়ি প্রতীকচিহ্ন।

গত মাসের শেষে মস্কোর প্রসিকিউটর অফিস থেকে আদালতের যে-কাগজ আমার স্ত্রী পেয়েছে, সেখানেও ওই ছাপ এবং লেখা— সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রসিকিউটর অফিস।'

রাশিয়ার টাঁকশাল থেকে ছটি মুদ্রার একটি সেট বেরিয়েছে— প্রতিটি এক রুবল মানের— বার্সেলোনা ওলিম্পিক্স-এর স্মারক মুদ্রা। সেটটার সরকারি দাম ১৪৫০ রুবল— বাইরে অন্তত চার গুণ বেশি। মুদ্রার গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে মুদ্রিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর সেই পরিচিত প্রতীকচিহ্ন। তবে এখানে সরকারকে একটি চালাকি খাটাতে হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে বাজারে ছাড়া হলেও মুদ্রার গায়ে প্রবর্তনের সময় মুদ্রিত হয়েছে ১৯৯১ সাল। কিছু বলার নেই— তখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল।

এসবই প্রতীকধর্মী। মনে করিয়ে দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলেও দেশের মানুষ মানসিকতার দিক থেকে সেখান থেকে খুব-একটা দূরে নেই। সোভিয়েত সমাজের ওপর আধুনিক বাজার অর্থনীতি চাপানোর যত চেষ্টাই হোক-না-কেন, পরিবর্তনের তেমন সুফল ফলছে কোথায়? দোকান কর্মচারী থেকে শুরু করে সরকারি আমলা, আইন প্রণয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, বিচারকমণ্ডলী, প্রচার মাধ্যম সকলেরই সেই পুরোনো মনোভাব— কাজের ধারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে।

দ্রব্যমূল্য অন্তত চল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পেলে কী হবে আজও সরকারি দোকানে ক্রেতাকে লাইনে দাঁড়িয়ে জিনিস কিনতে হয়। কারণ? সেই ঘাটতি। পরন্তু আরো কয়েকটি নতুন উপসর্গ— দোকান কর্মচারীর সংখ্যাল্পতা। কাউন্টারে তাড়া তাড়া নোট গুনে এঁটে উঠতে পারছে না— সময় লাগছে অনেক। সরকারি দোকানের সংখ্যা কমে যাবার ফলে একই কাউন্টারে মুদির দোকানের সামগ্রী থেকে মনিহারি পর্যন্ত সবই বিক্রি হচ্ছে।

কালবিরুদ্ধ হলেও এখনও টিকে আছে সোভিয়েত ব্যবস্থা।

অনিশ্চয়তা

মস্কো, ২৪ নভেম্বর ১৯৯২। স্থিরতা নেই কোথাও আজকের মস্কোর জীবনযাত্রায়। পরিবর্তন দ্রুত চলছে— এত দ্রুত যে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা কঠিন।

মস্কোর পাতাল রেলের গোর্কি পার্ক স্টেশন থেকে বেরিয়ে বিশাল চত্বরটার ওপর ফুলের দোকান। আমার মস্কোবাসের জীবনে বরাবর দেখে অভ্যস্ত। এই পথে কারো সঙ্গে দেখা করতে হলে ওই দোকানের সামনে সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দেশ করতাম। সেদিনও এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার স্থির করেছিলাম ওই জায়গায়। যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে দেখি ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেছে বৃত্তাকার সেই কাচের দোকানঘরটা। দু-দিন আগেও সেটা ওখানে ছিল। চত্বরটা ঘিরে এখন খোপ খোপ দোকানপাট আর পসারির মেলা। ভাগ্য ভালো এককালে দোকানটা যেখানে ছিল তারই কাছাকাছি আন্দাজ করে বন্ধু অপেক্ষা করছিল। সেও অবাক।

সেই একই অঞ্চলে সম্প্রতি আরো একটি পরিবর্তন দেখে আরো বেশি বিস্মিত হয়েছিলাম। ওই ফুলের দোকানের পরেই ছিল একটা সাধারণ শৌচাগার। পেরেস্ত্রৈকার আমলে সেটার আধুনিকীকরণ হয়, মিউজিক সিস্টেমও বসানো হল সেখানে, তবে ঢুকতে গেলে দক্ষিণা দিতে হত। "প্রগতি প্রকাশন' বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ওই অঞ্চলে তেমন আর যাতায়াত ছিল না। কিন্তু বেশ কিছুকাল পরে চত্বর পেরিয়ে সেই শৌচালয়ের দিকে পা বাড়াতে দেখি সেখান থেকে টাটকা রুটির সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। বেসরকারিকরণের সুযোগে কবে যে সেটা বেকারিতে পরিণত হয়েছে তা জানা ছিল না এতদিন।

এমন পরিবর্তন হামেশাই ঘটছে। যে-কিওস্ক থেকে খবরের কাগজ কিনতাম একদিন সকালে গিয়ে দেখি সেখানে বিক্রি হচ্ছে নানারকম বিদেশি পণ্য— পেপসি, কোক, চকোলেট আরো কত কী। এ তো ভালো! শহরের কোনো কোনো জায়গা থেকে রাতারাতি বেমালুম লোপাট হয়ে যাচ্ছে খবরের কাগজের কিওস্ক। মালিক সকালে এসে দেখে জায়গা ফাঁকা— কে বা কারা খোপটাই সরিয়ে নিয়ে গেছে রাতের বেলায়। রাতারাতি রং-চং করে খানিকটা দূরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে খুলে বসেছে মনিহারি দোকান।

কিয়েভ্স্কি স্টেশনের কাছে বড়ো দোকানটাতে ঢুকলাম— ভাবলাম যদি চাল-ডাল কিছু পাওয়া যায়। এখানেও ভেতরে ঢুকে অবাক হওয়ার পালা। বিশাল দোকানঘরের মধ্যে দুটি সারিতে খোপ খোপ দোকান— চটকদার জুতো, হালকা আর কড়া পানীয়। দামি দামি খাদ্যদ্রব্যের সমারোহ— অধিকাংশই বিদেশি, পিলে-চমকানো দাম।

সোভিয়েত আমলে দোকানে পণ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য না থাকলেও অনেকখানি জায়গা জুড়ে তৈরি হত এক-একটি দোকানঘর— হয়তো ক্রেতাদের লাইনে দাঁড়াতে সুবিধা হবে বলে। এখন বেসরকারিকরণের ধাক্কায় সেই সুপারমার্কেট ধরনের দালানগুলি কমার্শিয়াল শপ-এর ভোগে লাগছে। একটি, দুটি করে দোকানঘরের এককোণে ঠাঁই নিতে নিতে শেষকালে পুরো জায়গাটারই দখল নিয়ে ফেলছে। গত একবছর হল ছাঁটাই হতে হতে যে গুটি কয়েক সরকারি দোকান কর্মচারী বহাল ছিল তারাই কো-অপারেটিভের নাম করে সেগুলি হস্তগত করে কমার্শিয়াল শপকে ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। দু-পক্ষেরই লাভ— নতুন দোকানগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে কো-অপারটিভ, তথা সম্পত্তির মালিকরা।

জিনিসপত্রের দামেরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। একই চাল সেদিন ছিল ৫৬ রুবল/কিলোগ্রাম, পরদিন ৫৭, অন্য এক পাড়ার দোকানে ৬৭, একই দালানের আর এক দোকানে ৭২, একই ব্রান্ডের সিগারেট কোনো দোকানে ৬০, কোনো দোকানে ৯০ রুবল/প্যাকেট।

সরকারি ডাক পরিবহণ— সেখানেও নিত্য-নতুন মাশুল নিত্য-নতুন ভাড়া। ডাকমাশুল গত ছয় মাসের মধ্যে চারবার বাড়ল— মোট পাঁচ গুণ। পরিবহণ ভাড়া পঞ্চাশ কোপেক থেকে এক রুবল হয়েছে গত ছয় মাসে। মাস খানেকের মধ্যে তিন হবে। পাতাল রেলের ভাড়ার জন্য মাত্র কয়েক মাস আগে চালু হয়েছিল পঞ্চাশ কোপেকের বিশেষ ধাতব টোকেন, তা বাতিল করে মাস খানেক আগে চালু হল প্লাস্টিক টোকেন। তাও পালটাবে হয়তো। এখন শোনা যাচ্ছে প্লাস্টিক টোকেনের দাম এক রুবলের বেশি পড়ে যাচ্ছে, পড়তায় পোষাচ্ছে না, তাই তার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো স্টেশনে ঢোকার মুখে একটা লম্বা চোঙার ভেতরে এক রুবলের নোট ফেলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎশক্তি নিয়ন্ত্রিত প্রবেশপথের গেটে টোকেন ফেলে ঢুকতে গেলে যে বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয় তার সাশ্রয় হল। আদিম প্রথা। কিন্তু আরো একটি স্যুভেনিরের সংখ্যা বাড়ল। ধাতব টোকেনের মতো এটিও একটি স্যুভেনির হয়ে গেল।

কিন্তু সব অনিত্যের মধ্যেও একটিই নিত্য, চিরস্থায়ী, যার সঙ্গে বাজারের টিকি বাঁধা— সবুজ ডলার— চির সবুজ, স্ফীত হতে হতে অতিকায় দানবের আকার ধারণ করে গ্রাস করে ফেলছে রাশিয়ার বাজার, তার ক্ষুধার সঙ্গে তাল রেখে নিত্য বাড়ছে বাজারদর।

সর্বনাশা ডিসেম্বর

মস্কো, জানুয়ারি ১৯৯৩। সেদিন চমকে উঠেছিলাম মস্কোর লেনিন অ্যাভিনিউয়ের দক্ষিণ প্রান্তে একের পর এক বাজির ফোয়ারা আকাশে উড়তে দেখে। ৩০ ডিসেম্বর, সময়টা অসময়— সন্ধ্যা ৭-৩০ টা।

একটি সোভিয়েত ঐতিহ্য ছিল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উৎসব উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা সাতটায়, একই সময়ে দেশের বড়ো বড়ো শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর পর তোপ দেগে রংবেরঙের হাউইয়ের ফুলঝুরি ছেড়ে জনসাধারণকে অভিনন্দন জানানো। সোভিয়েত রাজনৈতিক উৎসবগুলি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ায় ইদানীং সেনাবাহিনী বা নৌবাহিনীর উৎসব ছাড়া আর কোনো উৎসব উপলক্ষ্যেই এরকম আতসবাজি ছাড়া হয় না।

এই হাউইগুলি উড়ছে একই জায়গা থেকে। নটা বাজতে তখনও ঢের দেরি, বর্ষবিদায় বা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে এরকম বাজি ছোঁড়ার রেওয়াজ নেই এদেশে। তা ছাড়া আজ ৩১ ডিসেম্বরও না। তা হলে?

রাস্তায় কৌতূহলী জনতার ভিড়। কারণটা জিজ্ঞেস করতে সকলে এক বাক্যে বলে উঠল আজ ৩০ ডিসেম্বর— সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের সত্তর বছর পূর্তি উৎসব। না সরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে না, কিছু স্থানীয় উৎসাহী উদ্যোক্তার এই আয়োজন। কিন্তু এ তো অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান। মাত্র সত্তর বছর পরমায়ু।

ডিসেম্বর একটি উল্লেখযোগ্য মাস রাশিয়ার ইতিহাসে। ১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাশিয়া বেলোরাশিয়া ও উক্রাইনার উদ্যোগে প্রথম গঠিত হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ— পৃথিবীর ইতিহাসে এক অতুলনীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোক্তা ওই তিন প্রজাতন্ত্রেরই প্রধান প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ ভেঙে দিয়ে গঠন করলেন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের কমনওয়েলথ। সে-বছর বড়োদিনের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম এবং শেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচ্যোভ্‌কে হটিয়ে দিয়ে ক্রেমলিনের কর্তা হয়ে বসলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েল্‌ৎসিন।

ভবিষ্যৎ মিউজিয়াম কর্মীরা সম্পূর্ণ সুবিচার করবেন যদি ক্রেমলিনে গর্বাচ্যোভের অফিসঘরের ঘড়ির কাঁটা ১৯:৩২ মিনিটে থামিয়ে রেখে ঘরটাকে তাঁরা একটি স্মৃতিকক্ষে পরিণত করেন। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঠিক এই মুহূর্তে কাস্তে-হাতুড়ি লাঞ্ছিত লাল সোভিয়েত পতাকা নামিয়ে দেওয়া হয়, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেন। অনেকটা যেন পিতৃভূমির তর্পণ উপলক্ষ্যেই ঠিক ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দূরদর্শনে দেখানো হল মিখাইল গর্বাচ্যোভের ওপর তিন ঘণ্টার একটি দলিলচিত্র। সমাপ্তি ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বরের সেই দিনটি দিয়ে। ছবির বহুলাংশ জুড়ে ধ্বনিত হয়েছে ইউনিয়ন রক্ষার জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্টের নিষ্ফল হা-হুতাশ।

ডিসেম্বরের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ Terra— প্রকাশ ভবন কর্তৃক প্রকাশিত সংকলনগ্রন্থ— "যে জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল না।' সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন ও তার পতন সম্পর্কে স্তালিন, ত্রোৎস্কি থেকে শুরু করে সাখারভ্‌, সোল্‌জেনিৎসিন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশ্লেষণধর্মী রচনার একটি সংকলন এটি। এ ছাড়াও স্থান পেয়েছে সেইসব অগণিত সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা যাঁরা জন্মেছিলেন এমন একটা দেশে, যে-দেশ আর নেই। আছে সেইসব রুশি-উক্রাইনীয়-আর্মেনীয়-তাজিক আর উজবেকদের মোহভঙ্গের কাহিনি, যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সোভিয়েত মহাজাতি গঠনের, যাঁরা নব উদ্ভূত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে আজ অবাঞ্ছিত।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর থেকেই পরিবর্তন ঘটল আরো

একটি সোভিয়েত ঐতিহ্যের। গত কয়েক দশক হল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নববর্ষের রাত্রে সোভিয়েত জনগণকে অভিনন্দন জানাতেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধার। রাত বারোটার কয়েক মিনিট আগে বেতার ও দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হত তাঁর ভাষণ। তাঁর ভাষণের শেষ কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেমলিনের ঘণ্টা রাত বারোটা ঘোষণা করে পুরাতন বর্ষকে বিদায় জানিয়ে নতুন বর্ষকে আহ্বান করত।

সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান সরে যেতে ১৯৯১ সাল থেকে জাতির উদ্দেশে অনুরূপ ভাষণ দিয়ে আসছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর রাতে নয়, ৩০ ডিসেম্বর। বেছে বেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের দিনটিতে।

ভোজের টেবিল সাজিয়ে বসার সামর্থ্য রাশিয়ার আজ অনেকেরই নেই, তাই হয়তো সংগত কারণেই প্রেসিডেন্ট নববর্ষের শুভেচ্ছাবাণী প্রদানের সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যদিও কারণ ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, পুরাতন ও নতুনের এই সন্ধিক্ষণটিতে মানুষকে চাপা উত্তেজনার মধ্যে রাখা তাঁর অভিপ্রায় নয়।

অনেকের মুখে এই উপলক্ষ্যে শোনা যাচ্ছে চুটকি গান:

নতুন বছর করছি বরণ,
নেই কো তাতে রুশি ধরন—
মিখাইল নিল ভোদ্‌কা কেড়ে,
বরিস দিল ভাত মেরে।

ছবি : মিতালি দে

শ্রমিক কৃষক সংহতির নতুন সম্ভাবনা

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

বামপন্থী রাজনীতির ইতিহাসে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন, সম্ভাবনা এবং সমস্যা সম্পর্কে গত একশো বছর বা তারও বেশি সময় জুড়ে বিস্তর আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়েছে। সেই রাজনীতির অনুশীলনে কৃষকের বৈপ্লবিক চেতনা এবং সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মত ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার কথা সুপরিচিত। এ দেশের অভিজ্ঞতাতেও তার নানান দৃষ্টান্ত আছে। তবে এ কথা বলা চলে যে, স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে কৃষক আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনের ধারা চালিত হয়েছে মোটের ওপর দুটি স্বতন্ত্র খাতে। বিশেষ বিশেষ সময়ে, রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডে তথা রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে বড়ো রকমের টানাপোড়েনের মুহূর্তে বিভিন্ন বর্গের আন্দোলন একই সঙ্গে জোরদার হয়ে উঠলেও, শ্রমিক ও কৃষকদের একযোগে আন্দোলন গড়ে তোলার নজির আমরা কমই দেখেছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, গত সেপ্টেম্বর মাসে সংসদে পাশ হওয়া তিনটি কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ক্রমশ যে ভাবে শ্রমিক সংগঠনগুলির যোগসূত্র তৈরি হয়েছে, যে ভাবে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলি যৌথ কর্মসূচির দিকে এগিয়েছে, তাকে কেবল গুরুত্বপূর্ণ বললে কম বলা হবে, এই সংযোগের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠতে পারে। সেই উদ্যোগ কত দূর সফল হবে, আমরা জানি না। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক সংহতির, অন্তত সমন্বয়ের যে সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে তাকে ঐতিহাসিক বললে অত্যুক্তি হয় না।

এই উদ্যোগকে একটা শক্তপোক্ত কর্মসূচির রূপ দিতেই মার্চ মাসের গোড়ায় মুখোমুখি আলোচনায় বসেছিলেন কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এক দিকে পঞ্চাশটির বেশি কৃষক সংগঠনের সম্মিলিত মঞ্চ– সংযুক্ত কিসান মোর্চা, গত নভেম্বরে কৃষি আইনের প্রতিবাদে আন্দোলনের প্রয়োজনে যার জন্ম, এবং অন্য দিকে দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন– ভারতীয় জনতা পার্টির অনুগামী বিএমএস স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে নেই। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, কৃষক এবং শ্রমিকরা যৌথভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তুলবেন। প্রধানত পাঁচটি দাবিতে এই আন্দোলন গড়ে তোলা হবে: কৃষি আইন বাতিল, নির্ধারিত কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক দাম (এমএসপি) দেওয়ার আইনি নিশ্চয়তা, সেপ্টেম্বরে সংসদের পাশ করানো শ্রম আইন প্রত্যাহার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ বন্ধ করা এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বিল প্রত্যাহার।

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-কৃষক যৌথ আন্দোলনের এই উদ্যোগ দানা বেঁধে উঠলেও, তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। সেই প্রস্তুতিপর্বের কয়েকটি মুহূর্তের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ২০১৬-১৭ সালেই মোদী সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের একটা সমন্বয় মঞ্চ তৈরি করার কথা ভাবা হয়েছিল। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে বামপন্থী কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলি 'মজদুর কিসান সংঘর্ষ যাত্রা' এবং যৌথ সমাবেশের আয়োজন করে, সেখানে কেবল সম্মিলিত দাবিপত্র রচনার কথাই বলা হয়নি, ধারাবাহিক যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি রচনার প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। সেই কর্মসূচি বেশ কিছুটা এগিয়ে যায় গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে, অতিমারি পরিস্থিতির মধ্যেই। ৭ আগস্ট কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সম্মিলিত মঞ্চ 'ভারত বাঁচাও দিবস' পালনের ডাক দিলে সারা ভারত কিসান সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি (এআইকেএসসিসি) তাকে সমর্থন জানায়, আবার এআইকেএসসিসি সদ্য-পাশ-হওয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে ২০ সেপ্টেম্বর 'রেল রোকো রাস্তা রোকো' কর্মসূচি পালনের আয়োজন করলে ট্রেড ইউনিয়ন মঞ্চ তাতে শামিল হয়। ২০ নভেম্বর দু-তরফের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মুখোমুখি আলোচনায় বসে কৃষকদের 'দিল্লি চলো' অভিযানে এবং শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটে পারস্পরিক সমর্থন জানান। এর পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে শ্রমিক ও কৃষকদের আলোচনা ও সহযোগিতার নানা উদ্যোগ চলতে থাকে, যা কেন্দ্রীয় স্তরে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করে, আবার সেই প্রচেষ্টা

থেকে নিজেরাও শক্তি সংগ্রহ করে। এই ধারাবাহিক উদ্যোগই মার্চের গোড়ায় একটা নতুন মাত্রা অর্জন করেছে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, এ যাবৎ সমন্বয়ের উদ্যোগ সীমিত ছিল প্রধানত দুই তরফেরই বামপন্থী সংগঠনগুলির মধ্যে, কিন্তু গত কয়েক মাসে তার পরিধি প্রসারিত হয়েছে, বিশেষত কৃষক আন্দোলনের আয়োজক পঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের অনেক সংগঠন বামপন্থী রাজনীতির বাইরে থেকেও ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অন্য দিকে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে দলীয় পরিচিতির সীমা অতিক্রম করে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ধারা নতুন নয় বটে, কিন্তু তারা এখন যে ভাবে সম্পন্ন কৃষকদের সঙ্গেও একযোগে বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হচ্ছে, তার মধ্যে যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। আবার সেই কারণেই দুই তরফের মধ্যে এবং তাদের নিজেদের অন্দরমহলেও নতুন নতুন দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা আছে। মনে রাখতে হবে, সমন্বয়ের এই উদ্যোগ একটি চলমান প্রক্রিয়া, তার মধ্যে নানা টানাপোড়েন আছে ও থাকবে। যৌথ আন্দোলন কোথায় কতটা দানা বাঁধবে, তার কর্মসূচি ও দাবিদাওয়া শেষ পর্যন্ত ঠিক কেমন দাঁড়াবে, কোথায় কোন দিকগুলিতে বেশি জোর পড়বে, দুই তরফের চিন্তা ও কাজ কত দূর মিলবে, দুই তরফের নিজের নিজের অভ্যন্তরীণ সংগঠন বা গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই বা কতটা মতৈক্য থাকবে, কৃষক এবং শ্রমিক সংগঠন ছাড়া আরো নানা বর্গের দাবি ও আন্দোলন এর সঙ্গে যুক্ত হবে কি না– এই সমস্ত প্রশ্নই প্রাসঙ্গিক এবং আগে থেকে কোনো প্রশ্নেরই পাকাপাকি উত্তর দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, দেওয়ার কথাও নয়। প্রক্রিয়াটি চলছে, চলবে। সেই চলার পথে হয়তো শ্রমিক ও কৃষকদের দাবিপত্রের আরো অনেক বিবর্তন ঘটবে। সেটা খুবই সঙ্গত। প্রয়োজনীয়ও বটে।

এই বিবর্তনের দুটি দিক নিয়ে আলাদা করে কথা বলা দরকার। প্রথমত, ফেব্রুয়ারির শেষের দিক থেকে কৃষক সংগঠনগুলির ভাষ্যে উঠে এসেছে একটি আহ্বান: কয়েকটি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদাতারা যেন কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি-কে ভোট না দেন। তাঁদের প্রতিনিধিরা এই আহ্বান জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সফর করেছেন। অর্থাৎ, কৃষকদের নির্দিষ্ট দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে তোলা আন্দোলন সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতির ময়দানে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে চাইছে। এটাও লক্ষ করবার বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে নির্বাচনী রাজনীতির বহুমুখী প্রতিযোগিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষক আন্দোলনের নেতারা– অন্তত তাঁদের একটি অংশ– শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি-কে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করছেন, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা জোটগুলির মধ্যে থেকে নিজেদের পছন্দ বেছে নেওয়ার দায়িত্ব তাঁরা ভোটদাতাদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। পঞ্জাবের এক কৃষক নেতার ভাষায়, "আমরা ভোটারদের এই দল বা সেই দলকে ভোট দিতে বলব না। আমরা কেবল বলব বিজেপি-কে ভোট না দিতে, কারণ তারা নিজেদের কৃষক-বিরোধী দল হিসেবে চিনিয়ে দিয়েছে, এবং নির্বাচনে তাদের একটা শিক্ষা দেওয়া কৃষকদের কর্তব্য।"

খেয়াল করা দরকার যে, কৃষকদের এই 'বিজেপি-কে ভোট নয়' দাবিটিতে শ্রমিক সংগঠনগুলি সরাসরি শামিল হয়নি। তার একটা বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে, দলীয় রাজনীতির সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের যোগসূত্র ঐতিহাসিক ভাবেই কৃষক সংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি জোরদার, তাই নির্বাচনী রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের পারস্পরিক টানাপোড়েনের জটিলতার কথাও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে মাথায় রাখতে হয় অনেক বেশি, যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সিআইটিইউয়ের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে 'বিজেপি-কে ভোট নয়' প্রচারে যোগ দেওয়া কেবল কঠিনই নয়, এই প্রস্তাবটিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক বাদপ্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যত অ-সম্ভব। এখানেই রাজনীতির বাস্তবিকতার (অ্যাকচুয়ালিটি) গুরুত্ব। ভারতের মতো দেশে রাজনৈতিক বাস্তব সর্বত্র এক রকম হতে পারে না, সুতরাং রাজনীতির কর্মসূচিতেও বিভিন্নতা অনিবার্য। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে চাই যে, সেই বিভিন্নতার মধ্যেও একটি স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট যোগসূত্র আছে, তার নাম– বিজেপি-র বিরোধিতা।

দ্বিতীয়ত, কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-কৃষক যৌথ কর্মসূচির এই উদ্ভবের পিছনে একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছে কর্পোরেটতন্ত্রের বিরোধিতা। ভারতীয় অর্থনীতিতে অতিকায় কর্পোরেট পুঁজির প্রভাব বেড়ে চলেছে বহু দিন ধরেই, বিশেষত গত তিন দশকে 'আর্থিক সংস্কার'-এর সুবাদে সেই প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। কিন্তু বর্তমান শাসকরা যেভাবে এবং যত দ্রুত সেই প্রভাবকে একটা চরম ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের রূপ দিতে তৎপর, সেটা অভূতপূর্ব। পুঁজির স্বার্থে শ্রম আইন সংশোধনের চেষ্টা চলছিল কয়েক দশক ধরেই, এই সরকার অতিমারির অবকাশে সংসদে সেই সংশোধন হাসিল করে ফেলেছে। আবার, কৃষি আইন সংস্কারের খুঁটিনাটি নিয়ে অনেক তর্ক আছে, বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে সেই সংস্কারের ফলাফলও আলাদা, কিন্তু গত কয়েক মাসে কৃষক আন্দোলন ও তা নিয়ে সওয়াল-জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব লাভ-লোকসানের হিসেবনিকেশ ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে একটি সাধারণ বা সামগ্রিক প্রশ্ন: এই সংস্কারের ফলে কি ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা কর্পোরেট পুঁজির দখলে চলে যাবে? কৃষি আইনের বন্দনা গাইতে গিয়ে সরকারি ও সরকার-অনুগামী প্রচারকরা

নিজেদের অজান্তেই এই আশঙ্কাটিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, নব্বইয়ের দশকের আর্থিক সংস্কারের খোলা হাওয়া এত দিনে কৃষিতেও এসে পৌঁছোল। ঘটনা হল, তিন দশকের অভিজ্ঞতায় দেশের সাধারণ মানুষ দেখে এসেছেন যে, ওই সংস্কারের ফলে বড়ো ব্যবসায়ীদের সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তর বেড়েছে। তাতে যে সকলেই বৈপ্লবিক ক্ষোভে প্রজ্বলিত হয়েছেন, এমন কথা মনে করার কারণ নেই। অনেকেই সংস্কারের এই স্বরূপটিকে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের ভুবনটি যে বড়ো পুঁজির সাম্রাজ্যে পরিণত, এই ধারণা মানুষের মনে পাকাপোক্ত হয়েছে। ভারতের কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণনের ব্যবস্থাটি এখনও অনেকাংশে সেই সাম্রাজ্যের বাইরে। পুঁজি নিজের স্বার্থে এবং নিয়মে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাইছে, মোদী সরকার তার পরম সহায়। নয়া কৃষি আইন এই সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রকরণ। এই আইনগুলির মাধ্যমে সরকার এক দিকে কৃষিব্যবস্থায় বিনিয়োগ, সহযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণের দায় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে এবং অন্য দিকে সেই ব্যবস্থাটিকে পুঁজির হাতে– কার্যক্ষেত্রে বড়ো পুঁজির হাতে– তুলে দিচ্ছে। কর্পোরেটতন্ত্রের এই দিগ্বিজয়ের ফলে শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষকদের ওপরেও প্রবল চাপ নেমে আসছে। তার প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে দুই পক্ষ পরস্পরের হাত ধরতে চাইছে, সেটা স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত।

লক্ষ্য করা দরকার, কর্পোরেটতন্ত্র শব্দটিতে নিহিত আছে বর্তমান জমানার রাষ্ট্রচরিত্র। আগের অনুচ্ছেদের সূত্র ধরে বলা যায়– রাষ্ট্রের চালকদের ওপর কর্পোরেট পুঁজির প্রভাব নতুন নয়, কিন্তু মোদী সরকারের আমলে সেই প্রভাব যেভাবে নিরঙ্কুশ দখলদারির রূপ নিতে চাইছে, রাষ্ট্র যেভাবে কর্পোরেট পুঁজির কুক্ষিগত হয়ে উঠছে, সেটা নতুন। এটাই কৃষি আন্দোলনের বৃহত্তর এবং গভীরতর উৎস। পঞ্জাব হরিয়ানার সম্পন্ন কৃষকরা এই আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছেন, তার কারণ– রাষ্ট্রক্ষমতার পরিসরে তাঁদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তা এ-বার কর্পোরেট পুঁজির গ্রাসে হারিয়ে যেতে বসেছে। এক অর্থে কর্পোরেটতন্ত্রের অশ্বমেধের ঘোড়ার সামনে সম্পন্ন কৃষকরাই শেষ সীমান্ত। সংগঠিত শ্রমিক-কর্মীদের প্রতিরোধ অনেক আগেই খর্ব হয়েছে, সেটা শ্রম আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে গত কয়েক মাসে সীমিত ও দুর্বল প্রতিবাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কৃষকদের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে পারলে আধিপত্য সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই ঘোড়সওয়াররা এতটা মরিয়া।

প্রতিরোধের নতুন সীমান্ত তৈরি করার প্রয়োজনও তাই অত্যন্ত বেশি। সেই প্রয়োজন মেটানোর উপায় একটাই– কর্পোরেটতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বর্গের মধ্যে সংহতি এবং সমন্বয় সাধন। শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের নতুন উদ্যোগে তার একটা প্রাথমিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেখানেই এই উদ্যোগের প্রকৃত গুরুত্ব। সম্ভাবনাটিকে কার্যকর করে তুলতে পারলে বড়ো পুঁজির স্বার্থবাহী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা যায়, ভারতীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য যা এখন কেবল জরুরি নয়, অপরিহার্য। সেই সংগ্রামকে প্রচলিত অর্থে বামপন্থী বলে অভিহিত করা যাবে কি না, তা নিয়ে বড়ো রকমের তর্ক থাকতে পারে। এই মুহূর্তের শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের প্রসঙ্গেও সেই তর্ক অনিবার্য। তার প্রথম কারণ এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সরব সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রচলিত অর্থে বামপন্থার পথিক নয়। কিন্তু সেই প্রশ্ন সরিয়ে রেখে এবং বামপন্থার ধারণাটিকে অনেক দূর প্রসারিত করেও বলা যায়, ট্রেড ইউনিয়নগুলি সামগ্রিকভাবে যতটা বামপন্থী অবস্থান থেকে কর্পোরেট আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইছে, কৃষকরা সেই অবস্থানে নেই। বস্তুত, এই আন্দোলনে যে কৃষকরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের একটা বড়ো অংশই নিজেদের কৃষি-পরিসরে ক্ষমতার অধিকারী, খেতমজুর, ছোটো চাষি, এমনকী মাঝারি চাষিদের ওপরেও তাঁদের দাপট প্রবল। তাঁদের সঙ্গে বামপন্থাকে সরাসরি মেলানো কঠিন। কিন্তু 'মেলানো' না গেলেও যে এক ধরনের সমন্বয় সম্ভব হতে পারে, সেই সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই প্রতিরোধের নতুন সীমান্ত নির্মাণ করা যেতে পারে, গত কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ দেয়।

আর এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জোর দিয়ে বলা দরকার যে, বামপন্থী রাজনীতিকে তার প্রচলিত সীমার বাইরে অনেক দূর অবধি নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে, অন্য নানা ধরনের আন্দোলনের দিকে হাত বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের (সোশ্যাল মুভমেন্ট) সংযোগ এখনও দুর্বল। অথচ মানবাধিকার আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন ইত্যাদি নানা ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সংযোগ সাধনের স্বাভাবিক কারণ আছে, প্রয়োজনও আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্প্রতিক কিছু লক্ষণ রীতিমত আশাপ্রদ। একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে বামফ্রন্টের প্রকাশিত খসড়া ইস্তাহারে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অধিকারকে স্বতন্ত্র ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবটি কেবল ঐতিহাসিক নয়, তা এক নতুন ইতিহাসের সঙ্কেতও দেয়। লক্ষ্য করার বিষয় এটাই যে, এক দিকে সর্বগ্রাসী কর্পোরেট পুঁজির অভিযান এবং অন্য দিকে সর্বগ্রাসী সংখ্যাগুরুবাদের অভিযান– দুইয়ের সম্মিলনে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের বিপদ যত বাড়ছে, সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার তাগিদে বহু দিক থেকে বহু প্রতিস্পর্ধী আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগও বাড়ছে সেই অনুপাতে। ক্রমশ সেই সব সুযোগের সদ্ব্যবহারও হচ্ছে, যার ফলে রাষ্ট্রচালকরা দৃশ্যতই

উত্তরোত্তর শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। এই বিভিন্ন আন্দোলন এবং তাদের রাজনৈতিক আদর্শ বা ভিত্তিভূমি এক নয়, এক হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা মৌলিক সাযুজ্য আছে– তারা যে যার অবস্থানে দাঁড়িয়ে ওই সর্বগ্রাসী আধিপত্যবাদকে প্রতিহত করতে চাইছে। এই সাযুজ্যই তাদের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের প্রধান হাতিয়ার। আধিপত্যের প্রবলতাই তার বিরোধী শক্তিগুলির সংহতিকেও জোরদার করে তুলছে। পরিভাষায় যাকে 'দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া' (ডায়ালেকটিকাল প্রসেস) বলে, এটি তারই একটি নজির।

দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ধর্ম হল– যে শক্তিগুলি তার অঙ্গ, ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তারাও পরিবর্তিত হয়ে চলে, পরিবর্তিত হতে থাকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। সেটা কোনো পূর্বনির্ধারিত সূত্র অনুযায়ী ঘটে না, বরং বিভিন্ন শক্তির আচরণ নিরন্তর একে অন্যকে প্রভাবিত করে। যেমন, আজ যে কৃষকরা সরকারি কৃষি নীতির বিরোধিতায় সংগঠিত ও সক্রিয় হয়েছেন, শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করেছেন, ভিন্ন এবং দূরবর্তী রাজ্যে এসে নির্বাচনী রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সরাসরি সেখানকার নাগরিকদের বিজেপি-কে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন, এই কর্মকাণ্ড এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। সেই পরিবর্তন কোনো আকস্মিক বা অলৌকিক রূপান্তর নয়, কিন্তু তাঁরা নিজেদের সমস্যাকে যে ভাবে বোঝেন, বাইরের পৃথিবীকে যে চোখে দেখেন, তা সম্ভবত একরকম থাকবে না, কারণ তাঁরা একে অন্যের দৃষ্টি, চিন্তা ও চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হবেন। এই বিবর্তন কেমন হবে, কতটা হবে, তা আবার অনেকাংশে নির্ভর করবে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে, অন্য নানা প্রতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে, বামপন্থী বা বৃহত্তর জনবাদী রাজনীতির সঙ্গে ওই কৃষকদের কর্মকাণ্ডের কতটা সংযোগ তৈরি হয় তার ওপর। ভারতের বামপন্থী রাজনীতি একেবারে আক্ষরিক অর্থে একটি পথসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবি : মিতালি দে

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই: ইতিহাসের শিক্ষা

রজত রায়

কার্ল মার্কস তাঁর The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte বইটি শুরুই করেছেন নিচের মন্তব্য দিয়ে :

> Hegel remarks somewhere that all great world-historic facts and personages appear so to speak twice. He forgot to add: the first time as tragedy, the second time as farce. Caussidiere for Danton, Louis Blanc for Robespierre, the Montagne of 1848 to 1851 for the Montagne of 1793 to 1795, the nephew for the uncle.

ইতিহাসের কী সত্যিই পুনরাবৃত্তি হয়? হলে, তা কি প্রহসন হিসাবে দেখা দিতে বাধ্য? মার্কস যদিও তাঁর যুক্তির সপক্ষে বেশ কয়েকটি নজির পেশ করেছেন, কিন্তু তাই বলে কি প্রাকৃতিক নিয়মের মতো তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই একইভাবে খাটবে? ইতিহাসের দিকে আমরা বার বার ফিরে তাকাই, কারণ অতীত আমাদের বর্তমানের সামনে একটা আয়না ধরে দেয়। অতীত ও বর্তমানের প্রতিতুলনা করে মনে করিয়ে দেয়, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সময়ের মোকাবিলা করা ভালো। আর সেটা না করতে চাইলে ইতিহাস তার প্রতিশোধ নিতে পারে, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তি সবসময় যে মার্কস বর্ণিত প্রহসন হয়ে আসবেই, তা না-ও হতে পারে। বরং তা অতীতের মতোই আর একটি বড় ট্র্যাজেডির আকারও ধারণ করতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানিতে হিটলারের উত্থানের সময়ের ঘটনাবলী এখন একশো বছর আগের অতীত। কিন্তু ওই সময়ের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে মনে হতেই পারে যে এটা অতীত হলেও তার ছায়া বর্তমানের উপর পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু সেই ধারণাকে স্থির সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করার আগে যাচাই করে দেখে নেওয়া দরকার। তাই ফিরে যেতে হবে ১০০ বছর আগের জার্মানি তথা সমগ্র ইউরোপের ইতিহাসের পাতায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) কে বা কারা শুরু করেছিল, কেন করেছিল– সে সব প্রশ্ন সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায়। কারণ, তা কলেজপাঠ্য ইতিহাসেই পাওয়া যায়। তবু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার। যেমন, যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত বুঝে যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে জার্মানির প্রধান কাইজার (সম্রাট) দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁর সময়ে জার্মান পার্লামেন্টে (রাইখস্ট্যাগ) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা থাকলেও তাঁদের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। কাইজার মনোনীত চ্যান্সেলর সরকার পরিচালনা করত, কিন্তু তার অস্তিত্ব পুরোপুরি কাইজারের উপর নির্ভর করত। কাইজার দেশত্যাগ করার পরে রাইখস্ট্যাগ-এর সদস্যরা একত্র হয়ে একটা সরকার গঠন করে। যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করতে তারা ভাইমার শহরে মিলিত হয়ে একটি নতুন সংবিধান রচনা করে, তাই সেই সরকার ইতিহাসে ভাইমার রিপাবলিক নামে পরিচিত। ভাইমার রিপাবলিক গঠিত হওয়ার দু-দিন পরে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়, এবং বিজিত রাষ্ট্র হিসাবে ১৯১৯ সালে এই ভাইমার রিপাবলিক ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ যেহেতু জার্মানির মাটিতে হয়নি, তাই জার্মানির মানুষ এই পরাজয় মেনে নিতে পারছিল না। তারা মনে করছিল, রাজনীতিকরা যুদ্ধ শেষ করতে রাজি হয়ে তাদের বিখ্যাত সেনাবাহিনীকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। ফলে, ভাইমার রিপাবলিক জার্মান নাগরিকদের কাছে খুবই অপ্রিয় হয়ে যাত্রা শুরু করে। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থদণ্ড দিতে রাজি করানো হয় (৬.৬ বিলিয়ন পাউন্ড), তা ছাড়া আলশাস ও লোরেন প্রদেশ ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে হয়। শর্ত চাপানো হয়, জার্মানি সামরিকীকরণ করতে পারবে না। অর্থাৎ, এক লক্ষের বেশি সেনা থাকবে না, যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান তৈরি করতে পারবে না। সেই সঙ্গে মহাযুদ্ধের নৈতিক দায় স্বীকার করতে হবে। চার বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে জার্মানির ২০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। তার সঙ্গে বেহাল অর্থনীতি, শিল্প ও কৃষি ধুঁকছে, তার মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া এই কঠোর শর্তাবলী ভাইমার রিপাবলিককে কার্যত নিঃস্ব করে দেয়। তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে বাড়তি নোট ছাপিয়ে

বাজারে ছাড়তে থাকে। যা অচিরেই বিপুল মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দেয়। যুবকদের মধ্যে বেশ কয়েক লক্ষের কোনো রোজগার নেই, পরাজয়ের গ্লানির সঙ্গে চরম আর্থিক কষ্ট গোটা দেশের মানুষের উপর। শ্রমিকরা ক্রুদ্ধ। রাশিয়ায় বলশেভিকদের সফল অভ্যুত্থানে উদ্বুদ্ধ জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে একবার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ভাইমার রিপাবলিক প্রাক্তন সেনাদের নিয়ে গড়া এক উগ্র দক্ষিণপন্থী আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে কমিউনিস্টদের সহজেই দমন করে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দুই শীর্ষ নেতা ও নেত্রী কার্ল লাইবনেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবার্গ প্রাণ হারান তাতে। অন্যদিকে, বিপ্লব, নৈরাজ্য ইত্যাদির আশঙ্কায় জার্মান পুঁজিপতিরা দক্ষিণপন্থীদের মদত জোগাতে আগ্রহী হয়ে পড়ে।

জার্মানির এই দুঃসময়ে ১৯২০ সালে National Socialist German Workers Party (জার্মান ভাষায় যার সংক্ষিপ্ত আকার দাঁড়াল Nazi Party) বা নাৎসি পার্টি আসরে অবতীর্ণ হল। নাৎসিরা ঘোষণা করল ১) ভার্সাই চুক্তি বাতিল করতে হবে, ২) জার্মানির সেনাবাহিনীকে আবার গড়ে তুলতে হবে, ৩) ভাইমার রিপাবলিককে সরাতে হবে, ৪) কমিউনিস্টদের বিনাশ করতে হবে, ৫) ইহুদিদের সব ধরনের পদ থেকে সরাতে হবে এবং ৬) সন্ত্রাসের পালটা সন্ত্রাস চালাতে হবে। নাৎসিদের এই ঘোষণাপত্র তখনই জার্মানির সর্বত্র ছড়ায়নি, ছড়াল ১৯২৩ সালের নভেম্বরে Munich Putsch বা Beer Hall Putsch নামে কুখ্যাত ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর। হিটলার বন্দী হয়ে আদালতে বিচার চলাকালীন আত্মপক্ষ সমর্থনে এক নতুন শক্তিশালী জার্মানি গঠনের যে যুক্তিবিস্তার করে, তা নাৎসিদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে।

কিন্তু ১৯২৩ সাল থেকেই ভাইমার রিপাবলিক কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে শুরু করায় বেহাল অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে থাকে। কলকারখানায় উৎপাদন বাড়তে থাকে। জার্মান মুদ্রা মার্কের দামও বাড়তে থাকে। ১৯২৮ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। তাই নাৎসিরা এই সময় পর্যন্ত জনমতকে নিজেদের দিকে বিশেষ টানতে পারছিল না। কিন্তু ১৯২৯ সালর ২৪ অক্টোবর ওয়াল স্ট্রিটে শেয়ার বাজারে ধ্বস নেমে আমেরিকায় চরম আর্থিক মন্দা (Great Depression) শুরু হল, অচিরেই যার ধাক্কা এসে পড়ল ইউরোপে। সেই ধাক্কায় জার্মানির অর্থনীতি আবারও তলিয়ে যায়। এর আগে মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বার্ষিক কিস্তিতে যে বিপুল অর্থ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকাকে মেটাতে হচ্ছিল, তাতে দেশে শিল্প ও কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য কোনো অর্থই ভাইমার রিপাবলিকের হাতে উদ্বৃত্ত থাকছিল না। সেই বাধা সরিয়ে অর্থনীতিতে গতি আনতে ভাইমার রিপাবলিক আমেরিকার কাছ থেকে একটা বড়সড় ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকায় গ্রেট ডিপ্রেশন শুরু হওয়ায় তারা ওই ঋণ আদায়ে চাপ দিল। ফলে, জার্মান অর্থনীতি এতটাই পঙ্গু হয়ে পড়ে যে গণহারে বেকারি, অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন ছাঁটাই, মেহনতী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষমতা সরকারের ছিল না।

১৯২৩ সালে নাৎসিদের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০০ জন। ধাপে ধাপে বেড়ে ১৯২৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৫০,০০০ জন। এই সময় জার্মানির পার্লামেন্টেও নাৎসিদের আসনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯২৮ সালে রাইখস্টাগে কমিউনিস্টরা ছিল ৫৪ জন, স্যোশালিস্টরা ১৫৩ জন, আর নাৎসিরা মাত্র ১২ জন। পরের বছর ১৯২৯ সালে নাৎসিরা বেড়ে ১০৭ হল, তার পরের বছর ১৯৩০ সালে ১৮৭ জন, ১৯৩২ সালে ২৩০ এবং ১৯৩৩ সালে ২৮৮ জন হল। স্যোশালিস্টরা এই সময়ে কমে ১২১, কমিউনিস্টরা ১০০ আসনে দাঁড়ায়।

ভাইমার রিপাবলিকের সংবিধানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা হলেও তাতে যথেষ্ট ভুলত্রুটি ছিল। প্রথমত, নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মানুযায়ী যে দল যত ভোট পাবে, সেই হারে পার্লামেন্টে তার জন্য আসন বরাদ্দ হবে। ফলে কোনো দলের পক্ষেই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, ৬০০ এর সামান্য বেশি আসনের পার্লামেন্টে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হতে পারায় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কোয়ালিশন অনিবার্য হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও হিটলার কী করে পারল? তার উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ওই সময়ের জার্মানির শ্রমিকশ্রেণির দুই পার্টির দিকে। জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাট দল (জার্মান ভাষায় সংক্ষেপে SDP) ও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি (KPD)। এসপিডি ১৮৬০-এর দশক থেকে সক্রিয় এবং জার্মানির শ্রমিকশ্রেণির সবচেয়ে শক্তিশালী দল। ১৯২৮ সালে হিটলারের নাৎসিরা যখন পার্লামেন্টে মাত্র ১২টি আসন পেয়েছিল, তখন এসপিডি পেয়েছিল ১৫৩টি আর কমিউনিস্টরা ৫৪টি আসন। এই নাৎসিরাই ১৯৩২ সালে বেড়ে হয় ২৩০। ভোটের হার দেখলে ১৯২৮ সালে নাৎসিরা মাত্র ২.৬ শতাংশ পেলেও চার বছরের মধ্যে ১৯৩২ সালে ৩৭.৪ শতাংশ ভোট টানতে সমর্থ হয় এবং দেশের ক্ষমতা দখলে উদ্যত হয়। এই অবস্থায় স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মনে হয় একমাত্র শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধি দুই দল যদি জোটবদ্ধ হয়ে নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবেই হিটলারের উত্থান ঠেকানো সম্ভব হতে পারত। ইতিহাস বলে, তা হয়নি। কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রী এসপিডি-র সঙ্গে জোট বাঁধা তো দূরের কথা, তাদেরই সবচেয়ে বড়ো শত্রু বলে আক্রমণের অভিমুখ করল। কেপিডি এই এসপিডি-কে সোশ্যাল ফ্যাসিস্ত বলে অভিহিত

করে দাবি করল যে তারা স্বৈরতন্ত্রী ফ্যাসিস্তদের চাইতেও হাজার গুণ বেশি খারাপ।

এ নিয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই যে জার্মান কমিউনিস্টরা স্তালিনের নির্দেশে চালিত হচ্ছিল, এবং স্তালিন তার নিজের দেশের স্বার্থরক্ষায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্যবহার করছিল। যে সময় হিটলার ক্ষমতায় আসে, অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে, তখন স্তালিনের প্রধান মনোযোগ ছিল নিজের পার্টি থেকে ট্রটস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ প্রমুখকে কোনঠাসা ও শেষ করে দিয়ে দলের মধ্যে নিজের ক্ষমতা ও আধিপত্য নিরঙ্কুশ করা। পরে ১৯৩৫ সালে কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোশ্যালিস্ট এবং আরো বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে যৌথ ফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য স্তালিনের অনুমোদন পেয়ে জর্জি দিমিত্রভ আহ্বান জানালেও ততদিনে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংস হয়ে গেছে। এটা ঠিক যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের (এসডিপি) বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের রাগের সঙ্গত কারণ ছিল। শ্রমিক শ্রেণির পার্টি হলেও এই দল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধকে সমর্থন করে, যুদ্ধ শেষে সরকারে অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধ সম্পর্কে এসপিডির এই মনোভাবের কারণেই রোজা লুক্সেমবার্গ ও কার্ল লিবনেখট ১৯১৫ সালে এসপিডি ছেড়ে নিজেদের 'স্পার্টাকাস লিগ' তৈরি করে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন শুরু করে জেলে যান। পরে ১৯১৯ এর গোড়ায় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি (কেপিডি) গঠন করেন। তার অল্পদিন পরেই একপ্রকার বিনা প্রস্তুতিতেই কমিউনিস্টরা বার্লিনে ক্ষমতাদখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। রোজা লুক্সেমবার্গ ও কার্ল লিবনেখট নিহত হন। যে হেতু তখন জার্মানির ক্ষমতায় ভাইমার রিপাবলিক, এবং সেই সরকারে সোশ্যালিস্টরাও ছিল, তাই কমিউনিস্টরা এসপিডির সঙ্গে কিছুতেই হাত মেলাতে রাজি ছিল না। শ্রমিক শ্রেণির দুই শক্তিশালী পার্টির মধ্যে অনৈক্যের সুযোগে হিটলার শক্তিবৃদ্ধি করে চলছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তার ক্ষমতা দখল করা সহজসাধ্য ছিল না। ভাইমার রিপাবলিকের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট দেশ শাসনের দায়িত্ব দিয়ে একজন চ্যান্সেলরকে নিয়োগ করে থাকে। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। তার কিছুদিন পরেই রাতের অন্ধকারে রাইখস্টাগে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে একজন ডাচ যুবক ধরা পড়ে। সে প্রাক্তন কমিউনিস্ট, মানসিক ভারসাম্যহীন কিন্তু যে তৎপরতার সঙ্গে হিটলার এই অগ্নিকাণ্ডকে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা উল্লেখযোগ্য। এ নিয়ে নানা মহলেই প্রশ্ন ছিল। অনেকের মতে, হিটলার কমিউনিস্টদের নিকেশ করতেই রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের চক্রান্ত করেছিল। যাই হোক, হিটলারের কথায় হিণ্ডেনবুর্গ দেশে জরুরি অবস্থা জারি করল। সেই রাতেই কয়েক হাজার কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হল। এর পর পরই হিটলার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করবে।

বামপন্থী মহলে জর্জি দিমিত্রভের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গড়ার ডাক নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। যেটা বলা হয় না, তা হল দিমিত্রভ এই আহ্বান করেন ১৯৩৫ সালে, কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশনের শুরুতে রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে। ততদিনে কিন্তু জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় আসীন এবং দিমিত্রভ সেই রিপোর্টে জানাচ্ছেন যে ইতিমধ্যেই জার্মানিতে ৪২০০ ফ্যাসিবিরোধী মানুষকে (তার মধ্যে কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্রাট, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, উদারপন্থী খ্রিস্টান সবাই রয়েছে) হত্যা করা হয়েছে। অস্ট্রিয়ায় খুন করা হয়েছে ১৯০০ মানুষকে। জার্মানিতে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩,১৭,৮০০ এবং আহত হয়েছে ২,১৮,৬০০ জন। দিমিত্রভ মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এই পরিসংখ্যান নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

দেখাই যাচ্ছে যে কমিউনিস্টরা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সোশ্যাল ফ্যাসিস্ত বলে অভিহিত করে তাদের সত্যিকারের ফ্যাসিস্ত শক্তির চাইতেও বেশি বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে হিটলারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট তৈরি করতে রাজি না হলেও তাদের চিনতে ভুল করেনি। তাই ক্ষমতায় এসেই হিটলার এই দুই পক্ষকেই নিকেশ করতে শুরু করে।

তবে শ্রমিকশ্রেণির দুই পার্টির ঐক্য না হওয়ার সমস্ত দায় দিমিত্রভ সরাসরি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। তিনি দাবি করেন:

> Fascism was able to come to power primarily because the working class, owing to the policy of class collaboration with the bourgeoisie pursued by the Social-Democratic leaders, proved to be split, politically and organizationally disarmed, in face of the onslaught of the bourgeoisie. And the Communist Parties, on the other hand, apart from and in opposition to the Social-Democrats, were not strong enough to rouse the masses and to lead them in a decisive struggle against fascism.

একই বক্তৃতায় অন্যত্র দিমিত্রভ কিছুটা স্বীকারোক্তির সুরে বলেন:

> Was the victory of fascism inevitable in Germany? No, the German working class could have prevented it.
>
> But in order to do so, it should have achieved a united anti-fascist proletarian front, and forced the Social-Democratic leaders to discontinue their campaign against the Communists and to accept the repeated

> proposals of the Communist Party for united action against fascism.

ফ্যাসিবাদের প্রতীক হিটলারের নাৎসিরা প্রধান শত্রু? নাকি, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা (যাদের সোশ্যাল ফ্যাসিস্ত বলত কমিউনিস্টরা)? কে সবচেয়ে বড়ো বিপদ? নাকি, উভয়েই সমান বিপদ? এই প্রশ্নগুলি অমীমাংসিত রেখেই কমিউনিস্টরা তাদের লড়াই একইসঙ্গে দুই ফ্রন্টে চালাবার চেষ্টা করল। বাস্তবে কিন্তু কমিন্টার্নের নেতৃত্বে (স্তালিনের অঙ্গুলিহেলনে) হিটলারের উত্থানের সময় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি (কেপিডি) কিন্তু এই লাইনে চলেই সোশ্যালিস্টদের (এসডিপি) সঙ্গে কিছুতেই হাত মেলাতে রাজি না হয়ে একলা চলার নীতি গ্রহণ করেছিল। পরিণতিতে শ্রমিক শ্রেণির দুই শক্তিশালী পার্টি ময়দানে থাকা সত্ত্বেও হিটলারের নাৎসি পার্টি ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯৩৫ সালে স্তালিনের নির্দেশে কমিন্টার্ন পুরো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট গড়ার ডাক দেয়। তখন বলা হয়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (প্রধানত ইউরোপের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও লেবার পার্টিগুলিদের নিয়ে গঠিত) এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন) একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে থাকা অন্যান্য শক্তি (যেমন, নৈরাজ্যবাদীরা, ক্যাথলিকরা এবং অসংগঠিত শ্রমিকরা) যোগ দিতে পারবে (দিমিত্রভের রিপোর্ট, সপ্তম কংগ্রেস, কমিন্টার্ন)। দেখা যাচ্ছে, এতদিন সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করতে উৎসাহ না দেওয়ার পরে এবার সেই জার্মান কমিউনিস্টদেরই কড়া সমালোচনা শুরু করল কমিন্টার্ন।

কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিন্টার্নের সেক্রেটারি জেনারেল দিমিত্রভ বলেন:

> Our comrades in Germany for a long time failed to fully reckon with the wounded national sentiments and the indignation of the masses against the Versailles Treaty; they treated as of little account the waverings of the peasantry and petty bourgeoisie; they were late in drawing up their program of social and national emancipation, and when they did put it forward they were unable to adapt it to the concrete demands and to the level of the masses. They were even unable to popularize it widely among the masses.

রুশ বিপ্লবের পরে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিতে কমিন্টার্ন স্থাপনার পরে সেখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা থাকলেও সহজবোধ্য কারণেই সেখানে রুশ নেতাদের আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তাই জার্মানির মতো বহু দেশের কমিউনিস্ট পার্টিই কমিন্টার্নের মাধ্যমে রুশ নেতাদের নির্দেশ ভক্তি সহকারে মেনে চলত। ফলত, যদি জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের ভুলের জন্য দোষী ঠাওরাতে হয়, তা হলে কমিন্টার্নকেও সে জন্য দোষী ঠাওরাতে হত। কিন্তু কমিন্টার্ন এবং রুশ নেতারা বেমালুম সে কথা এড়িয়ে যান।

আরো একটি কথাও এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়।

হিটলার চ্যান্সেলর হলেও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে পারছিল না প্রেসিডেন্ট পদে হিণ্ডেনবুর্গ থাকায়। তবে রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের পরে গোটা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করাতে হিণ্ডেনবুর্গকে রাজি করাতে বেগ পেতে হয়নি। আগের বছরগুলি থেকেই হিটলারের সশস্ত্র ঝঞ্ঝাবাহিনীর সঙ্গে দেশের নানা জায়গায় শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনীর সংঘর্ষ চলছিল। হিটলার এই আইনশৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে হিণ্ডেনবুর্গের হাত থেকে বেশিরভাগ ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে উদ্যোগী হল। সে জন্য সংবিধান সংশোধন করতে পার্লামেন্টের ৭০ শতাংশ সদস্যের সমর্থন আদায় করতে হত। নাৎসিদের নিজেদের ছিল ৩০ শতাংশ ভোট। তবে কমিউনিস্টদের অনেকে আগেই ধৃত, বাকিদের অনেককেই ঝঞ্ঝাবাহিনী দিয়ে ভয় দেখিয়ে, উৎকোচ দিয়ে সংবিধান সংশোধন করে হিটলার ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়। এর পরে হিণ্ডেনবুর্গ মারা গেলে হিটলার আর প্রেসিডেন্ট পদে না গিয়ে নিজেকে ফ্যুরার (দলপতি) হিসাবে ঘোষণা করে।

হিটলার জার্মানির একচ্ছত্র শাসক হয়ে ওঠায় কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, বুদ্ধিজীবি, ইহুদিরা অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। কমিউনিস্টরা অনেকেই পালিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় আশ্রয় নেয়। হিটলার যত বেশি করে ইউরোপের অন্যান্য দেশে শক্তিবিস্তার করবে, ততই সেই সব দেশের (পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকশ্লোভাকিয়া, ইতালি ইত্যাদি) কমিউনিস্টরাও সেই দেশে পালিয়ে আশ্রয় নেবে। এই প্রসঙ্গে এটাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার যে হিটলারের হাত থেকে পালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে আশ্রয় নেওয়া জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিবিরোধী মানুষদের অনেককেই কিন্তু পরে স্তালিনের নির্দেশে সাইবেরিয়ায় বন্দিজীবন যাপন করতে হয়েছে, বা ঘাতকবাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে, তথ্যপ্রমাণ সম্বলিত অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সময়কালে স্তালিনও দলের মধ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে একের পর এক গণহারে ধরপাকড়, গুপ্তহত্যা, মস্কো ট্রায়ালের মতো সাজানো বিচারের (যেখানে অত্যাচারের মাধ্যমে গুপ্তপুলিশের সাজানো অভিযোগ সম্বলিত স্বীকারোক্তি আদায় করাই সমাজতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থা বলে জাহির

করা হয়।) আয়োজন করা হয়। স্তালিনের সমসাময়িক প্রায় সব নেতাকেই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, জার্মানির হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সেই ব্যাপক সন্ত্রাসের সময় ১৯৩৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে আশ্রয় নেওয়া অন্তত ৮৪২ জন জার্মান ফ্যাসিবিরোধী মানুষকে গ্রেফতার করার তথ্য মস্কোয় অবস্থিত কমিন্টার্নের কর্মসমিতির জার্মান প্রতিনিধি সংগ্রহ করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির (কেপিডি) তিন পলিটব্যুরো সদস্য সহ বেশ কয়েকজন নেতা ছিলেন। একই অবস্থা হয় আশ্রয় নেওয়া অন্য দেশের কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রেও। অনেক পরে বন্দিজীবন যাপন করতে গিয়ে ইউজেনিয়া গিনসবার্গের দেখা হয় একজন জার্মান কমিউনিস্ট মহিলার সঙ্গে। সেই মহিলার শরীরে গেস্টাপোর অত্যাচারের চিহ্নের পাশেই এন কে ভি ডি (সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশ)-র অত্যাচারের চিহ্নও দেখেছিলেন।

শুধুই কমিউনিস্টদের নয়, নিজের দেশের বিজ্ঞানীদের মতোই ভিন দেশ থেকে আশ্রয় নেওয়া বিদেশি বিজ্ঞানীরাও সোভিয়েত ইউনিয়নে এসে বাঁচতে পারেননি। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জগত থেকে এ নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছিল, আইনস্টাইন নিজে ১৯৩৮ সালের ১৬ মে স্তালিনকে চিঠি লেখেন। স্তালিন জবাব দেননি। মস্কো ট্রায়ালে একের পর এক রুশ নেতা নিজেদের দোষ কবুল করে স্বীকারোক্তি করায় আন্তর্জতিক দুনিয়ায় অনেকেই বিভ্রান্ত হন। আঁদ্রে জিদ, এইচ জি ওয়েলস, বার্নার্ড শ-র মতো অনেকেই সেই দলে ছিলেন। শ'র মতো কেউ কেউ তো আবার নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নারকীয় কাণ্ডও বিশ্বাস করতে পারেননি। ব্রেটল্ট ব্রেখটের মতো জার্মান কবি-নাট্যকারও সেই দলে ছিলেন। ১৯৪১ সালে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার আগে ব্রেখট অল্প কদিনের জন্য সে দেশে ঘুরতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বহু জার্মান ফ্যাসিবিরোধী কর্মীর গ্রেফতার হওয়ার খবর জানতে পারেন। আরও জানতে পারেন যে সোভিয়েত কর্তারা জার্মান কমিউনিস্টদের গড়া থ্যেলমান ক্লাব ও লাইবনেখট স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ক্যারোল নেগেরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আর সোভিয়েত লেখক, ব্রেখটের বন্ধু ও মার্কসবাদ চর্চার শিক্ষক ত্রেতিয়াকভকে গুলি করে মারা হয়েছে। তখন তিনি তাঁর মনের কথা একটি কবিতায় প্রকাশ করেন–

Is the People Infallible?

1. My teacher,
   Big, friendly,
   Has been shot, condemned by a people's court.
   As a spy. His name is damned.
   His books are destroyed. Talk about him
   Is suspect and hushed.
   Suppose he is innocent?

2. Some of the people have found him guilty.
   The Kolkhozes and the factories of the workers,
   The most heroic institutions in the world,
   Have seen an enemy in him.
   Suppose he is innocent?
   ....

5. To speak of enemies who may be sitting in the people's courts
   Is dangerous, for the courts need their authority.
   To demand papers on which guilt is proved black on white
   Is foolish, for there must be bo such papers.
   Criminals hold proofs of their innocence in hand.
   The innocents often have no proofs.
   Suppose he is innocent?

6. What five thousand have built, one can destroy.
   Among fifty who are condemned,
   One can be innocent.
   Suppose he is innocent?

Suppose he is innocent How could he go to his death? (ব্রেখটের এই কবিতার অংশটি রুশ ঐতিহাসিক Roy Medvedev এর Let History Judge, pp. 479-480 থেকে নেওয়া।)

আগের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ফ্যাসিবাদী শক্তি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় এলে কী কী বিষয়ে এগোতে পারে, দেশবাসীকে কোন পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে, তার যে পাঠক্রম হিটলারের জার্মানিতেই তৈরি হয়েছিল। তার একটা ঝলক দেখে নেওয়া যেতে পারে। কে জানে, হয়তো সেই অভিজ্ঞতা আমাদের নিজেদের জীবনে কাজে লেগে যেতে পারে। নাৎসিরা ক্ষমতায় এসে আশ্বাস দিল–১) গ্রেট ডিপ্রেশন জনিত কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশবাসীকে তারা সাহায্য করবে, ২) ভার্সাই চুক্তি বাতিল করবে, ৩) আবার জার্মান সেনাবাহিনী গড়ে তুলে জার্মানির পুরনো গৌরব ফিরিয়ে দেবে। নাৎসিদের প্রচারযন্ত্র তখনকার দিনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত তাদের বক্তব্য দেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিতে পারত। সে জন্য তারা লাউডস্পিকার, স্লাইড শো, ফিল্ম সবই কাজে লাগাত। এ ছাড়া সহজ ভাষায় প্রচুর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের কথা প্রচার করত।

মহাযুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে আর্থিক দুরাবস্থার জন্য সাধারণ মানুষ যখন ক্রোধে ফুঁসছিল, তখন নাৎসিরা এ সমস্ত কিছুর জন্য ইহুদিদের দায়ী করে প্রচার চালিয়ে গিয়েছিল। এবার ক্ষমতায়

এসে হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ ব্যবস্থা নিতে শুরু করল। প্রথমত, তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হল। তাদের ব্যবসা কেড়ে নেওয়া হল। চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। সেই সব ব্যবসা (বিশেষ করে ছোটো ব্যাবসা) ও চাকরি দেওয়া হল জার্মান নাগরিকদের। তাদের পোশাকে হলুদ তারা (স্টার অব ডেভিড) রাখা বাধ্যতামূলক করা হল, আর পাসপোর্টে বিশেষ করে তাদের ইহুদি পরিচয় লেখানো বাধ্যতামূলক করা হল। এর পর ইহুদিদের ধাপে ধাপে প্রথমে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, পরে মৃত্যুশিবিরে ফাইনাল সল্যুশনের জন্য পাঠানো হবে। যার পরিণতিতে ৬০ লক্ষ ইহুদি হিটলারের জমানায় প্রাণ হারাবে।

ইহুদিনিধন যজ্ঞ শুরুর প্রস্তুতিপর্বে জার্মানদের কাছে ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো ছিল একটা দিক। এর অন্য দিকটি হল নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা। নর্ডিক (মুখ্যত ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের দেশগুলির মানুষকে নর্ডিক জাতি বলে চিহ্নিত করা হয়) মানুষদের শরীরের গড়ন ঋজু, দীর্ঘ, চুলের রঙ সাধারণত হালকা সোনালী বলে ধরে নিয়ে দাবি করা হতে লাগল যে নর্ডিকরাই জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু হিটলারের ফরমান– রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য নর্ডিকরা নিম্নলিখিত শ্রেণির মানুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে না। এরা হল– ১) ইহুদি, ২) জিপসি, ৩) শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪) স্বভাবগত অপরাধী। এই রক্তের বিশুদ্ধতার প্রসঙ্গ আবারও ফিরে আসবে। তবে তার আগে নাৎসি শাসনে সমাজে মেয়েদের স্থানটা কীভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, তা জানা জরুরি। নাৎসিরা জার্মান মেয়েদের তিনটি ভূমিকায় গণ্ডিবদ্ধ করে দিয়েছিল। ১) তারা সন্তান উৎপাদন ও লালনপালনে মন দেবে, ২) তারা রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকবে এবং ৩) চার্চে যাবে। কিন্তু ছেলেদের মতো বাইরের কাজ তাদের জন্য নয়। সাফ বলে দেওয়া হয়েছিল, মেয়েরা গৃহকর্মের মধ্যেই থাকবে। তারা আর্য রক্ত বহন করবে। বেশি বেশি করে সন্তান উৎপাদন করবে। প্রথম মহাযুদ্ধে অসংখ্য জার্মান সেনার প্রাণহানির কারণে জার্মানির জন্মহার বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। তাই দুটি সন্তানের জন্ম দিলে নাৎসি রাষ্ট্র তাকে আয়রন ক্রস, চারটি সন্তানের জন্ম দিলে রুপোর মেডেল, আটটি সন্তানে সোনার মেডেল দিতে শুরু করে। (প্রসঙ্গত, একই অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নেও হয়েছিল। সেখানে বহু সন্তানের জননীকে হিরোইন অব সোভিয়েত ইউনিয়ন মেডেল দেওয়া হত।) এই সঙ্গে মেয়েদের মদ্য পান ও ধুমপান অনুমোদন করা হত না। হাই হিল জুতো ও ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক পরাও অনুমোদন করা হত না। আর জোর দেওয়া হত নাৎসি চিন্তাধারা প্রচারের ওপর। বলা হত, মেয়েরা সন্তানদের নাৎসি আদর্শে গড়ে তুলবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হত যে তারা আর্য হবে, নাৎসি পার্টির সদস্য হবে, বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ নেবে এবং পরিবারের দেখাশোনা করবে। হিটলারের এই ফরমান অনুযায়ী নাৎসি সরকার প্রথমেই মহিলাদের বাইরের জগতের সব কাজ থেকে সরিয়ে দিয়ে বাড়িতে পাঠায়। বিশেষ করে শিক্ষিকাদের ও সরকারি অফিসের কর্মীদের। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে চলার পরে জার্মানির ছেলেরা অধিকাংশই সামরিক বাহিনীতে চলে যাওয়ায় মেয়েদের আবার বাইরের জগতে বেরোতে দিতে বাধ্য হয় সরকার। তখন অনভ্যস্ত মেয়েদেরই সমরাস্ত্র নির্মাণ কারখানা, অন্যান্য অত্যাবশকীয় পণ্য উৎপাদনের কারখানায় ও কৃষিকাজে লাগাতে হয়। হিটলার ইউথে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও নেওয়া হত। সেখানে নাৎসি মতাদর্শ শিক্ষার সঙ্গেই ঘরের কাজকর্ম ও সন্তানপালনের আদর্শ পদ্ধতি শেখানো হত। আর ছেলেদের শেখানো হত প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর উপায় এবং নাৎসি মতাদর্শ।

যেকোনো চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির মতোই নাৎসিরাও ক্ষমতায় এসে স্কুল কলেজে শিক্ষার পঠনীয় বিষয়গুলি নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। ১৯৩৫ সালের একটি মেয়েদের স্কুলের রুটিন দেখলে একটা ধারণা তৈরি হতে পারে। সপ্তাহে ছয় দিনের প্রতিদিনই প্রথম ঘণ্টায় জার্মান ভাষা শিক্ষা, দ্বিতীয় ঘণ্টায় একেক দিন একেকরকম– সোমবার ভূগোল. মঙ্গলবার ইতিহাস, বুধবার সঙ্গীত, এইভাবে পরের তিনদিনও। তৃতীয় ঘণ্টায় জাতি ও তার বিশুদ্ধতা সপ্তাহে চারদিন, বাকি দু-দিন নাৎসি মতাদর্শ। চতুর্থ পিরিয়ডে প্রতিদিনই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও গণিত, এবং শেষ পিরিয়ডে সন্তান উৎপাদনের বিজ্ঞান (Eugenics), যা আদতে কীভাবে পরবর্তী প্রজন্ম উন্নতমানের হয় যে দিকে লক্ষ্য রেখে নরনারীর সঙ্গী নির্বাচনের একটা চিন্তা ও চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে রাখতে হবে, নাৎসিরা আগেকার সব ইতিহাসের বই বাতিল করে তার জায়গায় নিজেদের মনোমত ইতিহাস অবশ্যপাঠ্য করেছিল। সমস্ত ইহুদি শিক্ষক শিক্ষিকাকে তারা এসেই বরখাস্ত করেছিল। একই সঙ্গে দেশের সমস্ত শিক্ষককে নাৎসিদের তৈরি German Teachers' League এর সদস্য হতে বাধ্য করা হয়।

শিক্ষার জগতকে নিয়ন্ত্রণে আনার সঙ্গেই নাৎসিরা ধর্মীয় জগতের দিকে তাকায়। জার্মানির ৯০ শতাংশের বেশি মানুষই খ্রিস্টান। তাদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক যেমন ছিল, তেমনই প্রটেস্টান্টরাও ছিল। হিটলারের ভয় ছিল, এই ধর্মীয় যাজকরা সাধারণ মানুষকে নাৎসিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললে বিপদ হতে পারে। বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিকদের মাথার উপর ধর্মগুরু হিসাবে পোপ থাকায় ইচ্ছা করলে তারা জার্মানি সহ অন্য অনেক

দেশের খ্রিস্টান ভক্তদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করতে পারে। তাই হিটলার প্রথমেই পোপের সঙ্গে এক চুক্তি করে, যা অনুযায়ী রোমান ক্যাথলিকদের গির্জা, স্কুল ও সংঘবদ্ধ জীবনযাপনে নাৎসিরা নাক না গলানোর অঙ্গীকার করে। অন্যদিকে পোপও রাজনীতি থেকে দুরে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু প্রটেস্টান্টদের সেরকম কোনো সংঘবদ্ধ ধর্মীয় জীবন ছিল না। সব প্রটেস্টান্ট নাৎসিরা চার্চ সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করার জন্য একটি সরকারি বিভাগ খুলে বসে। সব প্রটেস্টান্ট চার্চ ও ভক্তদের জার্মান চার্চ নামে নতুন একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ করা হয়। এর পর থেকে ওই সব চার্চে নাৎসিদের স্বস্তিকা পতাকা, যাজকদের নাৎসি ব্যাজ সহ আলখাল্লায় দেখা যেতে লাগল।

নাৎসিরা ভয় দেখিয়ে, বলপ্রয়োগ করে কাজ হাসিল করার সঙ্গেই নানা কথা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়মিত প্রচার করে যেত। এ জন্য তখনকার দিনের সবচেয়ে আধুনিক প্রচারযন্ত্র রেডিয়োর ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশি। অভাবক্লিষ্ট মানুষ যারা রেডিও কিনতে পারত না, তাদের জন্য জনতার রেডিয়ো (People's Radio) নামে এক রিসিভার পাওয়া যেত, যা দিয়ে নাৎসিদের প্রচার, হিটলারের ভাষণ শুনতে পেলেও বিবিসি-র মতো বিদেশি রেডিয়ো সম্প্রচার শুনতে পেত না। নাৎসিরা বেশিরভাগ সংবাদপত্র দখল করে এবং বিরোধী সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করে দেয়। গোয়েবলসের প্রচারদফতর থেকে নিয়মিত ওই সব সংবাদপত্রে নির্দেশ যেত কী করতে হবে তা নিয়ে। এ ভাবে প্রচারমাধ্যমকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার সুবাদে নাৎসিরা ক্রমাগত তাদের শত্রুদের দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের মন সাময়িকভাবে হলেও বিষিয়ে দিতে সক্ষম হল। তার পর শুরু হয় শত্রুনিধন পালা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ, হিটলারের জার্মান বাহিনী যুদ্ধে সম্পুর্ণভাবে পরাজিত, হিটলার মৃত, নাৎসি বাহিনী অবলুপ্ত (যদিও নয়া নাৎসিরা পুনরুত্থানের চেষ্টায় আবারও সক্রিয় জার্মানিতে ও ইউরোপের অন্যত্র)। কিন্তু যে ঘৃণা, জাতিদ্বেষ, শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী নীতি নিয়ে আজকের দিনে রাজনৈতিক শক্তি মাথা তুলেছে এবং ক্রমশই শক্তিসঞ্চার করছে, তা জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতারোহনের আগের মুহূর্তগুলির কথা মনে পড়ায়। আমাদের দেশেও দেখতে পাচ্ছি, কীভাবে ঘৃণার রাজনীতি, দেশের মানুষের আর্থিক কষ্টের জন্য এক নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয়ের মানুষকে দায়ী করা ("ওরা উইপোকার মতো আমাদের দেশকে কুরে কুরে ধ্বংস করছে" জাতীয় মন্তব্য রাষ্ট্রনেতাদের মুখে), সাধারণ মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া (প্রতিটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা দেওয়ার কথা) ছাড়াও দেশকে আত্মনির্ভর করার কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে, ঠিক যেমনটি বলা হয়েছিল জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে। হিটলারের জার্মানি যেভাবে ক্ষমতায় এসেই ইহুদিদের নাগরিকত্ব, সম্পত্তি, ব্যবসা, চাকরি সব কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছিল, এখানেও এনআরসি, নতুন নাগরিকত্ব আইন ইত্যাদি হাতিয়ার করে দেশের এক শ্রেণির মানুষের নাগরিকত্ব, জীবন ও জীবিকা অপহরণের প্রস্তুতিপর্ব চলছে। তা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকে বলতে শুনি, এ সব ভয় অমূলক। 'ওরা' অতকিছু করবে না। সত্যিই তো, আশঙ্কা যদি অমূলক হয়, তা হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু বাস্তবটা কি তাই? সংবিধানে প্রদত্ত কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার ৩৭০ ধারা একটা কলমের খোঁচায় বাতিল করে দেওয়া থেকে শুরু দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একের পর এক নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থানকে লঘু করে ক্রমাগত সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা, দেশের ফেডারেল কাঠামোর তোয়াক্কা না করে রাজ্যগুলির ক্ষমতা ক্রমাগত খর্ব করে চলা, সমাজে নারীকে ক্রমশই বাইরের জগত থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ফেরৎ পাঠানোর প্রচেষ্টা, মেয়েদের কী ধরনের পোশাক পরা উচিত, সে ব্যাপারে বিধান দেওয়া– এরকম অজস্র নজির আমাদের নাৎসিদের ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতা দখলের দুই বছর পরে ১৯৩৫ সালে কমিন্টার্নের অধিবেশনে এ বিষয়ে দিমিত্রভ যা বলেছিলেন, তা প্রনিধানযোগ্য:

> In our ranks there was an impermissible underestimation of the fascist danger, a tendency which to this day has not everywhere been overcome. A case in point is the opinion formerly to be met with in our Parties that "Germany is not Italy," meaning that fascism may have succeeded in Italy, but that its success in Germany was out of the question, because the latter is an industrially and culturally highly developed country, with forty years of traditions of the working-class movement, in which fascism was impossible. Or the kind of opinion which is to be met with nowadays, to the effect that in countries of "classical" bourgeois democracy the soil for fascism does not exist. Such opinions have served and may serve to relax vigilance towards the fascist danger, and to render the mobilization of the proletariat in the struggle against fascism more difficult.

একশো বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে তার অনুরণন স্পষ্ট। এখনও জোর গলায় দাবি করা হচ্ছে, বাংলার সমাজের দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক,

প্রগতিশীল চিন্তার ঐতিহ্য রয়েছে, এখানে বিভেদের রাজনীতি, ঘৃণার রাজনীতি শিকড় গাড়তে পারবে না। কিন্তু বাস্তবচিত্র কী তাই? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, রামকৃষ্ণের বাংলার মানুষ নিজেকে যে জাত-ধর্ম-জাতপাতের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে দেখতে ও দেখাতে ভালবাসে, তার মধ্যে নিহিত প্রবল ফাঁকি এখন ধরা পড়ে যাচ্ছে। এই মনোভাব যে সমাজের এলিট শ্রেণির একাংশের কথা, অর্থাৎ সংখ্যার বিচারে দুর্বল, কিন্তু গলার জোরে প্রবল, সে কথা এতদিন স্বীকার করা হচ্ছিল না। এখন তো দেখাই যাচ্ছে যে জাতপাত ও ধর্ম নিয়ে ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠই নন, তাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে যুক্তিবাদী বিচারকে ডুবিয়ে দিতে সোচ্চার। হিটলারের সময় যদি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হিসাবে রেডিও নাৎসিদের প্রচারের বাহন হয়ে থাকে, তা হলে এখন সোশ্যাল মিডিয়া শাসক বিজেপি দলের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার। সেই সঙ্গে এখানেও সংবাদমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের লাগাম পরানোর কাজ তো চলছেই। ফলে, সামাজিক রাজনৈতিক পরিসরে ক্রমাগত ঘৃণার রাজনীতি ছড়ানোর কাজ চলছেই। নিশ্চয়ই আরও কিছু রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে, যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই ফ্যাসিস্ত শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে আগ্রহী। তাই বলে একশ বছর আগের ভুল হবে প্রধান শত্রু বাছতে?

সমসাময়িক ভারতে কে প্রধান শত্রু, তা নিয়ে কারও কোনো সংশয় থাকার কথা নয়।

ছবি : মিতালি দে

নির্বাচনী যাত্রাপালা

মালবী গুপ্ত

যে-যাত্রাপালায় পশ্চিমবঙ্গের কুশীলবরা গত কয়েক মাস ধরে ঝলমলে পোশাক, ঢাল তলোয়ার, কাড়া নাকাড়া এবং অবশ্যই নানা রঙের মুখোশ নিয়ে ভোটের রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন। না, শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সে পালায় যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও কুশীলবরা হরদম উড়ে আসছেন, যাচ্ছেন। এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজ্যের জেলায় জেলায় প্রায় ডেলি প্যাসেঞ্জারের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। সবার মুখে প্রতিশ্রুতির খই ফুটছে। গরিব গুরবো মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষায় নতজানু হচ্ছেন, গণতন্ত্রের সেইসব বিষম পূজারীরা।

উপায়ই বা কী? আসলে ভোট যে বড়ো বালাই। যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে ওই ভোটের নামাবলী গায়ে জড়িয়েই তো ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে, না কি 'উৎসব'-এ যোগ দিতে হয়। হ্যাঁ, কেউ কেউ তো ভোটকে 'গণতন্ত্রের উৎসব' বলেন কিনা। বস্তুত, শহরে গ্রামে দেওয়ালে দেওয়ালে সচিত্র লিখন, নানা রঙের দলীয় পতাকা, ফেস্টুন, প্রচারকদের জন্য সুসজ্জিত তোরণ, মঞ্চ, এখন আবার নানা বাদ্যি নিয়ে নাচতে নাচতে নেতা মন্ত্রীদের 'রোড শো' - সবমিলিয়ে সর্বত্র একটা উৎসব উৎসব আবহ তৈরি হয় বটে।

কিন্তু কোনো উৎসবের মঞ্চ থেকে কি এমন মারমুখী হুঙ্কার শোনা যায়? নাকি এতো কুৎসিত ভাষায় পরস্পরের প্রতি এতো ঘৃণা ও বিদ্বেষ, ছড়ানো যায়? তাছাড়া উৎসবই যদি হবে, তাহলে চতুর্দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, সমর্থক বা নেতাদের রক্তে পশ্চিমবঙ্গের মাটি এমন ভিজে ওঠে কেন? ভারতের অন্যত্র এমনটা না ঘটলেও এ রাজ্যে সেই আবহ মুহূর্তে বদলে গিয়ে সহিংসতার রূপ নেয়। ইতস্তত স্বজন হারানোর হাহাকার গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরে। তখন আর যাইহোক, আমাদের রাজ্যে ভোটকে গণতন্ত্র নয়, 'সন্ত্রাসের উৎসব' বললে বোধহয় সত্যের খুব একটা অপলাপ হয় না।

দশকের পর দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে বিরামহীন নির্বাচনী সন্ত্রাসের সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত। সে বাম ডান যে দলই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকুক না কেন। ক্ষমতায় টিকে থাকাই হোক কিম্বা ক্ষমতা দখল - লক্ষ্যে পৌঁছোতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ভয় দেখানো, মারধোর করা, লুঠপাট, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, ও 'লাশ ফেলা'-র ঐতিহ্য বাংলা যুগ যুগ ধরে সযত্নে লালন করে চলেছে। সে লোকসভা বিধানসভা যাইহোক, নির্বাচনে স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে, গণতন্ত্রের হত্যাকারী হয়ে ওঠায় কেউই কখনো পিছপা হয় না দেখি।

বাঙালির 'বিস্মৃত জাতি' হিসেবে বেশ খ্যাতি আছে। তাই কেউ কেউ হয়তো, ভোটে এমন হিংসা বা এমন হত্যা আগে ঘটেনি বলে পিঠ চুলকোতে পারেন। কিন্তু নিজেদের স্মৃতি একবার খুঁড়ে দেখলে বেদনা না জাগুক, পাতায় পাতায় রক্তের দাগ তাঁদের হয়তো শিহরিত করবে। যে দাগ হয়তো সে বহন করে চলেছে তার জন্ম লগ্ন থেকেই। আসলে ভারতের স্বাধীনতার সূচনা কালে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তে ভেজা মাটি থেকে জন্ম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের, কে জানে সেই সহিংসতার বীজটি হয়তো সেদিনই এই নবীন রাজ্যের বুকে প্রোথিত হয়েছিল।

বছরে বছরে সেই বীজ নানা ফুল বেলপাতার নৈবেদ্যে আরো পুষ্ট হয়ে আজ মহীরুহ হয়ে উঠেছে। রাজা এসেছে, রাজা গেছে, কিন্তু কেউই সেই বীজটিকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা দূরে থাক, চিন্তাতেও আনেনি। বরং সংসদীয় গণতন্ত্রের হাত ধরে এ রাজ্যে যখনই নির্বাচনের ঘণ্টা বেজেছে, তখনই শাসক ও বিরোধী দল আস্তিন গুটিয়ে এক অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়েছে। আর সেই যুদ্ধ জয়ের একটি উপায় হিসেবে ওই সহিংসতার অস্ত্র হাতে তুলে নিতে কেউই দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। তাই নির্বাচনের সময় এলেই কেবল মনে হতে থাকে, যুযুধান পরস্পর প্রতিপক্ষের হাতে আবার কত না জানি নিরপরাধ লোকের প্রাণ যাবে। কত সন্তান, স্বামী আর পিতা হারানোর শোকে, অসহায় মা বাবা, স্ত্রী আর পুত্র কন্যাদের বুক চাপড়ানো কান্নায় রাজ্যের দিগন্ত বিদীর্ণ হবে।

কিন্তু প্রশ্ন তো জাগতেই পারে - ভারতের অন্য রাজ্যে হানাহানি ছাড়া, রক্তপাতহীন ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে, পশ্চিমবঙ্গে এত হিংসার ঘনঘটা কেন? হতে পারে, বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ বা অন্যান্য বহু রাজ্যের মতো অত

জাতপাত বা ধর্ম চর্চায় বাংলার গ্রামীণ জীবন ততটা আবর্তিত হয় না। কিন্তু এখানে দেখা গেছে, সেই সমাজ চিরকালই কোনো না কোনো আগ্রাসী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। হতে পারে আগে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল জমিদারি শাসনের হাতে, পরবর্তীতে তা চলে যায় রাজনৈতিক দলের কাছে। কাজের সূত্রে গত কয়েক দশক গ্রাম বাংলায় ঘোরার সুবাদে দেখেছি, স্থানীয় শাসক দল তথা পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের মাধ্যমে দলীয় রাজনীতি গ্রামীণ জীবনকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা, তাদের চাওয়া পাওয়া, সরকারি নানা প্রকল্প ও কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে কতটা ওতপ্রোত জড়িত থাকে।

কিন্তু দুর্নীতি যখন সেই চাওয়া পাওয়ার হিসেবে গরমিল ঘটায়, স্থানীয় ক্ষমতাসীনের বঞ্চনা ও প্রতারণার ক্ষেত্রগুলি জনজীবনে যখন ক্রমপ্রসারিত হতে থাকে, তখনই সেই আপাত শান্ত গ্রামীণ সমাজেও ক্ষোভের কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। এবং ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা সেই ক্ষোভের আগুন তাদের অধিকার দাবি করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। সমাধানের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পের দিকে হাত বাড়াতে চায়। আর তখনই সেই হাত একপক্ষ ভেঙে দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়, তো অন্যপক্ষ সেই হাত ধরার চেষ্টা করে। একপক্ষ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে, আর অন্যপক্ষ ক্ষমতালাভের স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষায় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। যে দ্বন্দ্ব আজন্ম প্রতিবেশির গলায় ছুরি বসিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। আর নির্বাচন যেহেতু সেই ক্ষমতালাভের দিকনির্দেশক হয়ে ওঠে, তাই মনে হয়, ভোট এলেই রাজ্যে ওই অবাঞ্ছিত সন্ত্রাস নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

তবে বাংলায় বিগত সাত আট দশকের পাতা ওলটালেই দেখা যায়, তেভাগা আন্দোলন, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ, খাদ্য আন্দোলন কিম্বা নকশাল আন্দোলন - সে সামাজিক বা রাজনৈতিক যে আন্দোলনই হোক না কেন সবেতেই হিংসা ঢুকে পড়েছে। কখনো তা জনগণের হাত ধরে, কখনো বা রাষ্ট্রের হাত ধরে। কোনো আন্দোলনের সহিংসতা তো সাধারণ রাজ্যবাসীকেও ভীত সন্ত্রস্ত করেছে।

আজ আর হয়তো সেই ধরনের কোনো আন্দোলন বঙ্গবাসীর জীবনকে আন্দোলিত করে না। তবে হিংসা তার চলার পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। তাই এখন গণতান্ত্রিক অধিকারের হাত ধরে যখন রাজ্যে এক একটি রাজনৈতিক পালাবদলের চেষ্টা বা বদল হয়, তখনও দেখি সেই সহিংসতার হাত ধরতে কসুর করে না কেউই।এবং যে ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা আগ্রাসনের কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসী ক্রমশ মাথা নত করে চলেছে, তার থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথও যেন সে আর খুঁজে পায় না।

তাই বাঙালিকে আজ 'রাজনীতি সচেতন'-এর বদলে, বোধহয় রাজনৈতিক আগ্রাসন বা আধিপত্যবাদের ক্রীড়নক বললে অত্যুক্তি হবে না। যে আধিপত্যবাদের কাঁধে বন্দুক রেখেই শাসক - বিরোধীদলের এতো দড়ি টানাটানি। তাছাড়া সব রাজনৈতিক দলই যখন তোলাবাজি, গুন্ডাগিরি, চুরি, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি নানা অপরাধে অভিযুক্ত 'অপরাধী'-দের কোলে তুলে নেয়, তখন ওই কুশীলবরা যে নিছক শুধু হরিনাম জপতে জপতে ভোট যুদ্ধের বৈতরণী পার হবে না - তা বলাই বাহুল্য।

তবে আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, কী কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, কী বামফ্রন্ট বা বর্তমান তৃণমূল সরকার - কোনো আমলেই, কোনো দলের নেতা মন্ত্রীরা কখনো ওই ভোট রাজনীতির সহিংসতার সক্রিয় প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করেননি। বরং প্রত্যেকটি দল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিংসা দিয়ে হিংসার কাঁটা তোলার চেষ্টা করেছে। পারস্পরিক বদলা নেওয়ার সেই কলুষ অনুশীলন অদ্যাবধি ঘটেই চলেছে।

অথচ পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের ধ্বজা উড়িয়ে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন, 'বদলা নয়, বদল চাই' বলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদটি অলঙ্কৃত করলেন, দেখলাম তাঁর সেই আশ্বাসবাণীর অচিরেই মৃত্যু ঘটল। তিনি গভীর অভিনিবেশে তাঁর পূর্বসূরিদের কিছু অপকর্ম ও অদৃশ্য দুষ্ট-নীতির অনুসরণও করে চললেন। তবে কিছু বদল তিনি নিশ্চয়ই ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আমলেও ভোট সহিংসতার চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। এবং তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ায়, এখন নিজেই আর মাটিতে পা রাখতে পারছেন না।

কথায় বলে, যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ। এই আপ্তবাক্যের সত্যতা নিয়ে বোধহয় কোনো দ্বিমত নেই। যদিও লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত অজানাই থাকছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে এবার কোন শাসকের আর্বিভাব ঘটতে চলেছে। তবে পুরোনো বা নতুন, যিনিই সেই আকাশে উদিত হন না কেন, বাংলা নতুন বছরে তাঁর কাছে একটাই প্রত্যাশা থাকবে – যদি তিনি সত্যিই গণতন্ত্রী হন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে এই রক্তক্ষয়ী সহিংসতার রাজনীতির অবসান ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন। যদি দলমত নির্বিশেষে রাজ্যবাসীর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠতে চান, তবে দলীয় আধিপত্যবাদ বা আগ্রাসনের আস্ফালন থেকে ভীত সন্ত্রস্ত জনজীবনকে অবশ্যই মুক্তি দেবেন।

তাহলে হয়তো ভবিষতে আর হুমকি দিয়ে, গায়ের জোরে, মেরে ধরে নয়, কাজের জোরেই নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন তাঁদের ভোট বাক্সে আপনিই গিয়ে জমা হবে। এবং রাজ্যের খানিক কালিমালিপ্ত গণতন্ত্রও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। তাহলে হয়তো পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি এখন হৃত গৌরব হওয়া সত্ত্বেও, 'অধিকার সচেতন', 'রাজনীতি সচেতন'-এর শ্লাঘাটুকু অন্তত ধরে রাখতে পারবে।

ভোট-বৈশাখ

শুভময় মৈত্র

"আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে
কানে কানে প্রশ্ন করো তুমি কোন দল
রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসার আগে
প্রশ্ন করো কোন দল তুমি কোন দল"

বাংলা বছর শুরুর এই লেখায় কবির নাম না লিখেই শুরু করা যাক। মূল যে বিষয় নিয়ে আলোচনা, তার প্রেক্ষিত এবারের কোন্দল-কামী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। অন্য চারটি রাজ্যেও নির্বাচন হচ্ছে। কিন্তু সেখানে কে কোন দল, তা নিয়ে হইচই অনেক কম। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি ভোট রসিক, আর বিশ্বজুড়ে তাদের সংখ্যা তেইশ কোটির বেশি। সুতরাং যদি কেউ অনুমান করেন যে অন্তত কোটি খানেক মানুষ নন্দীগ্রাম নিয়ে মত্ত, তাহলে সে সমীক্ষা যুক্তিযুক্ত। এই সংখ্যা অনেক নামি ফুটবল কিংবা রাগবি ম্যাচের টেলিভিশন দর্শকের থেকে বেশি। ফুটবল চলে দেড় ঘণ্টা, কিন্তু এই নিয়ে আলোচনা চলছে গত প্রায় দু-মাস ধরে। পরম ক্ষণ আরো দিন পনেরো। ফলপ্রকাশের জন্যে আকুল অপেক্ষা। ম্যান-ডে'স কত খরচা হল সে চিন্তা বাড়িয়ে লাভ নেই। যাঁরা ধর্মঘটে কর্মদিবস নষ্ট হবে বলে হা হুতাশ করেন, কোভিড তাঁদের আচ্ছা ধাক্কা দিয়েছে। তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে যোগ করা যাক এবারের নির্বাচনে নষ্ট হওয়া মাস তিনেক। কোভিডে ইশকুল বন্ধ, কিন্তু জনসভা নয়। সমাবেশ মঞ্চে কুশীলব এবং চেয়ার ভরুক কি না ভরুক, তার থেকেও বেশি দর্শক। রোদ্দুরে কে আর মাঠে যায়? তার থেকে বৈঠকখানা ভালো। সেই পথে দূরদর্শী সংবাদমাধ্যমের পুষ্টিকর মুনাফা। নিন্দুকদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এমন সম্পদ সৃষ্টিকারী নির্বাচনকে বলে কিনা সার্কাস! মিল কিংবা পার্থক্য লিখতে গেলে মাঝে উল্লম্ব রেখা টানতে হবে। মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে সার্কাসে দর্শক সংখ্যা অনেক কম। অন্যদিকে রাজ্যের রাজারাণী স্থির করায় উৎসাহের অভাব নেই। সে ভবিষ্যৎবাণী এখন রাশিবিজ্ঞানকে রান্নাঘরে পৌঁছে দেবে। তবে দলবদলের ট্র্যাপিজে এই নির্বাচনে গণতন্ত্রের গতি বাড়ল, নাকি তার সদ্গতি হল সেটা বুঝতে মে দিবসের আগামীকাল। মার্কিনী গণতন্ত্র ট্রাম্পের দয়ায় আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। ক্যাপিটল আর নন্দীগ্রাম পাশাপাশি। তবে ফচকেমি না মেরে গণতন্ত্র সংজ্ঞায়িত করতে গেলে পশ্চিম ইউরোপ, নর্ডিক দেশগুলি, কিংবা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের কথা বলতেই হবে। সেখানে সার্কাস সার্কাসেই, গণতন্ত্র গণতন্ত্রে। দুটো মিশিয়ে ফেলার জো নেই। আর মিলে গেলে যেটা মুশকিল, তখন বারবার শোনা যাবে ডেমোটোক্র্যাসি কিংবা "ফ্লড" অর্থাৎ ভুলে ভরা ডেমোক্র্যাসি নিয়ে সমালোচনা। সেটা সুদে আসলে যখন পুরোপুরি একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র কিংবা ফ্যাসিবাদী জায়গায় পৌঁছোবে, তখন চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয়ে "সার্কাসের" জোকারকে বড়ো জোকার বলবেন, নাকি দ্য গ্রেট ডিক্টেটরের "জোকারকে", সে ধন্দ মেটানো বড়ো মুশকিল।

নির্বাচনী সার্কাসে আবার ফিরব। আপাতত সার্কাসের তাঁবুতে উঁকি মারার আগে টেপের বিষয়টা সামলানো যাক। নির্বাচন কালে একই দিনে দুটি কথোপকথন। একটিতে মমতা এবং প্রলয়, অন্যটিতে মুকুল এবং শিশির। সময়ের রেখাচিত্রে যদি দেখেন, তাহলে এই দুটি টেপকাণ্ডে কুশীলবদের অতীত এবং বর্তমান বিশ্লেষণে সিপিআই(এম), কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি সব দলের প্রতিনিধিকেই খুঁজে পাবেন। শুধু চতুর্থ মাত্রাকে প্রসারিত করতে হবে গত তিন দশক। তবে এই দুই টেপের সময়োচিত উন্মোচন নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে তা এক্ষুনি বোঝা শক্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গে আসবে রিচার্ড নিক্সনের কথা। রিপাবলিকান এই প্রেসিডেন্ট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন ডেমোক্র্যাটদের কৌশল গোপনে জেনে নেওয়ার জন্যে। ধরা পড়ে পদত্যাগ করতে হয় নিক্সনকে। সত্তর দশকের শুরুর এই ঘটনা অতি পরিচিত ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নামে। এইখানে একটা মজার ব্যাখ্যা হল নিক্সন নাকি মনে করতেন

যে একমাত্র তাঁর মতধারাই মার্কিন সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক, সুতরাং ডেমোক্র্যাটদের হারানোর জন্যে যেকোনো পথ নেওয়া যায়। এ এক জটিল মনস্তত্ত্ব। গোটা বিষয়টাকে বিধাননগর কিংবা কেশপুর কেন্দ্রের প্রেক্ষিতে ভাবলেও বুঝতে পারা যায় যে যুগে যুগে দখলদারির মাধ্যমে আমজনতার মঙ্গল কারা করতে চান। এমনই আর একটি ঘটনা ইউক্রেনে। সংবাদপত্র ইউক্রেইন্সকা প্রাভদা। তার সাংবাদিক জর্জিয়ে গংডজ-কে অপহরণ করে খুন করা হয় ২০০০ সালে। খবর প্রকাশিত হয় যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট লিওনিদ কুচমা নাকি এর সঙ্গে জড়িত। প্রেসিডেন্টের কিছু কথোপকথন রেকর্ড করছিলেন তাঁরই দেহরক্ষী মেজর মায়কোলা মেলনিচেঙ্কো। বছর দশেক পরেও যদিও সব কিছু ভালোভাবে প্রমাণ হয়নি। এরকম গৌরী লঙ্কেশ সংক্রান্ত খবর ভুলে থাকলেই রাজনীতির মঙ্গল। আসলে সমাজবিজ্ঞান তো পিথাগোরাসের উপপাদ্য নয় যে চাহিলেই প্রমাণ করা যাবে। তবে ইউক্রেনে বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় কুচমা-র। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখা কিংবা থ্রিলার ছাপা হয় কম। ফলে এই দু-টেপ-গেট হয়তো এই নির্বাচনের পরেই ভুলে যাবেন মানুষ। কিন্তু দুটিই যে নির্বাচনী কৌশল সংক্রান্ত, একথা মনে রাখতে হবে।

জনসমক্ষে টেপ যেমন এক আধটা, গালি কিন্তু প্রচুর। গালি যিনি দিলেন, আর গালি যিনি খেলেন, তাদের অবস্থান পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ গালির দেওয়া নেওয়ায় নিউটনের তৃতীয় সূত্রের অঙ্গীকারটুকু থাকবেই। সত্যি কথা বলতে কি, গালির বিষয়টা জনগণের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। এর দুটো দিক আছে। এক হল গণমাধ্যমে খারাপ কথা বলাকে আমাদের সংস্কৃতি মান্যতা দেয় না। কিন্তু খারাপ কথা বলা হলে তার প্রচার অসাধারণ। লেখায় কয়েকটি তারা কিংবা বিন্দু, শব্দে কুউউউউ কিংবা বিপ, এসব দেখনদারি পেরিয়ে মন্দ হলে মন্দ কি? খারাপ কথা তো আমরা নিজেদের মধ্যে বলেই থাকি। বিশেষ করে বন্ধুমহলে খারাপ ভাষায় কথা বলাটাই দস্তুর। আজকে যদি ছোটোবেলার পাড়া কিংবা ইস্কুলের বন্ধুদের কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দেখেন, সেখানে যে আলোচনা হয় তার মধ্যে অশ্লীলতা থাকে আঠারো আনা। আর এই নির্দোষ কথাবার্তা মূলত মজার। অন্যদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে গালির দুটো ভাগ। একটা ব্যাঙ্গার্থে, যেটা তুলনায় কম। কারণ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ব্যবহার করে বিপক্ষকে কথায় কাটার মত ধুরন্দর রাজনীতিবিদের অভাব। সেই কারণেই তো সান্ধ্যকালীন বিতর্কে কলতলার ঘনঘটা। দ্বিতীয়টায় একেবারে সার্বজনীন ভাষা সন্ত্রাস। মেরুকরণ সাফল্যমণ্ডিত করতে ভাষা সন্ত্রাসের জবাব নেই। বঙ্গ রাজনীতিতে অন্য যেকোনো দেশ বা রাজ্যের তুলনায় ভাষণের প্রাবল্য বেশি। আমরা বেশি বকি। এবং কাজের অপ্রতুলতার কারণে শোনার লোকের অভাব হয় না। ছোটোবেলায় শিক্ষকেরা বলতেন "বেশি ইংরিজি লিখলে বেশি ভুল হবে"। সেই মুশকিলটাই আজকের রাজনীতিতে প্রকট। এতো বেশি বলছেন, এবং সব সময়েই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করায় তাঁদের এতটাই উৎসাহ, যে ভাষা সন্ত্রাস বেড়ে যাচ্ছে। যাদের নন্দীগ্রামে নির্বাচনে তৃণমূল বা বিজেপি-র এজেন্ট হতে হয় না, তাদের ঘরে বসে শুনতে ভালোই লাগছে। খাপছাড়া-র ছয় নম্বর কবিতার মতো আমরা বলছি,

> গালি তারে দিল লোকে
> হাসে নিধু আড়চোখে;
> বলে, "দাদা, আরো বলো, কান গেল জুড়িয়ে।"

ব্যস্তানুপাতের অঙ্ক বাস্তবসম্মত, তাই ভাষা সন্ত্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই কমছে সৌজন্য। আগে অসৌজন্য ছিল না এমন নয়, তবে সৌজন্যেরও অভাব ছিল না। সেটা বোঝার জন্যে দুটি উদাহরণ দিতে হবে। এক যাদবপুর ইলেকট্রনিক্সের প্রথম বর্ষ, সাল ১৯৮৮। ক্লাসে ৪২ জন্য ছাত্র। সেই ভোটে জিতবো নিশ্চিত। হারলাম ২৫-১৭-তে। ভাবতেও পারিনি নিজের বন্ধুদের মধ্যে এভাবে হারতে হবে। মনের দুঃখে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে লাইব্রেরিতে পড়তে চলে গেলাম। পড়া কি আর হয়? বরং চোখের জলে মিলম্যান-হ্যালকিয়াসের দু-একটা ছাপানো অক্ষর ধেবড়ে গেল। হঠাৎ দেখি পিঠের ওপর আলগা থাপ্পড়। বিরোধী পক্ষের একদল বন্ধু এবং দাদা। "অরে তুই তো ফাটিয়ে দিয়েছিস। তোর দল কোনোদিন এই ডিপার্টমেন্টে দশটার বেশি ভোট পায়নি। চল চল চা খেয়ে আসি"। সত্যেনদার ক্যান্টিনে মিনিট দশেক কাটানোর পর বুঝলাম গলার কাছে দলা পাকানো কান্নাটা ভ্যানিশ। কারণ মন ভালো করা ভাষা সন্ত্রাস। দ্বিতীয় উদাহরণ ২০০১ নির্বাচন। কলকাতা দূরদর্শনে একদম শুরুর দিকের নির্বাচনী সমীক্ষা। ভোটগননার দিনে সকালবেলার তথ্য দেখে অনুমান করতে হবে কে জিততে চলেছেন। আমার কাজ স্টুডিয়োর বাইরে বসে গণকযন্ত্র সহযোগে খুব তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষা। সেবার সকলে ভেবেছিলেন মমতা ব্যানার্জী বোধহয় জিতেই গেলেন। যাই হোক, একটু বেলা গড়াতে ফলাফল পরিষ্কার। শুরুর দিকেই আসনের ভাগ দেখে রাশিবিজ্ঞানের এক নামজাদা অধ্যাপক বললেন আর অঙ্ক কষতে হবে না, বলে দাও বামফ্রন্ট দুশো। বামফ্রন্ট ১৯৯টি আসন পেয়েছিল। সেদিন রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্যে এসেছিলেন সিটু নেতা চিত্তব্রত মজুমদার। কিছু পরে ঢুকলেন সইফুদ্দিন চৌধুরী। কিছুদিন আগেই দল ছেড়েছেন। বামফ্রন্টের বিরোধী। প্রথমেই চিত্তব্রতবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন "অভিনন্দন কমরেড"। প্রাণখোলা হাসি মুখে নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে হাত

মেলালেন চিত্তব্রতবাবু। আজকে যখন আমরা গভীর গবেষণায় আবিষ্কার করছি যে দল ভেঙে বেরিয়ে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা বাড়ে, তাই বাড়ে অসৌজন্য, তখন কিন্তু এই ঘটনাগুলো মনে পড়ে যায় বার বার। রাজনীতির অতলে হিংসার ফল্গুধারা তো থাকেই, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু রাজনীতিতে তত্ত্ব এবং পড়াশোনার অভাব যখন আকাশ ছোঁয়, যখন আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের জন্যে রাজনীতি পেশা হয়ে ওঠে, তখন সৌজন্য খুব বেশি জায়গা পায় না।

যে প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানেই আবার ফেরা যাক। এবারের নির্বাচনে কতটা সনাতনী রাজনীতি, আর কতটা সার্কাস? সার্কাসের কথায় বিশেষভাবে আসে ডিগবাজী। তার যোগান যথেষ্ট। সামনে পেছনে ডিগবাজীও আছে। অর্থাৎ প্রথমে তৃণমূল থেকে বিজেপি। সেখানে জায়গা না পেয়ে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন। আবার কিছুদিন পরে সফলতার সঙ্গে বিজেপি-তে যোগদান, এবং প্রার্থীপদ লাভ। জেতেন কিনা তা অবশ্য বুঝতে সেই দোসরা মে। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মানতেই হবে যে সার্কাসের চিত্রনাট্যে যে চমকে দেওয়ার ব্যাপার থাকে, বঙ্গের দলবদলে তা ক্লিশে। সকলেই জানেন যে কিছু নেতা দলবদল করবেন। তাঁদের নামও আগে থেকে জানা। শুধু প্রশ্ন হল তাঁরা কবে দলবদল করবেন, এটুকুই। তার অনেকটাই নির্বাচনের আগে সারা হয়ে গেছে। ভোটফলের পর আবার সেরকম ঘটনা ঘটতেই পারে। অর্থাৎ গত দশ বছরের অনুশীলনের শেষে আমরা এখন অভিজ্ঞ। ডিগবাজীর সার্কাসে পশ্চিমবঙ্গ আর পিছিয়ে নেই। দলবদলের সূচক থাকলে কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, ইত্যাদি ইত্যাদি রাজ্যের সঙ্গে আমরা সমমানে। আরো গভীরে গিয়ে নির্বাচনের সঙ্গে সার্কাস মেলালে মালিক, কুশীলব এবং দর্শকদের কথায় আসতেই হবে। রাজনৈতিক দলের যাঁরা শীর্ষে, তাঁরা দল চালান। আর অনুগামীরা কুশীলব। মালিকের নির্দেশে খেলা দেখাতে হয়। যেমন একটি সংস্থা তার নিয়ম কানুন নির্দিষ্ট করে, সেটা মেনে চলতে হয় কর্মচারীদের, আমাদের দেশের রাজনীতিতেও মাথা বিক্রি করতে হয় রাজনৈতিক দলে। ভালো ভাষায় তাকে বলে রাজনৈতিক অনুশাসন। সেটা মানতে পারলে তবেই তো গুছিয়ে শাসন করা যায়। অর্থাৎ চরণ ধুলায় মাথা নত করার কারণ কখনো দুর্নীতি করে শাস্তি পাওয়ার ভয়, কখনো বা কোনো একটি নীতির অন্ধ অনুকরণ। যারা খেলা দেখেন তারা জানেন গোটা বিষয়টি সাজানো। শতাংশের হিসেবে নগণ্য সুবিধাভোগী মানুষ বিনোদন হিসেবে শর্তহীনভাবে সার্কাস দেখতে ভালোবাসেন। আর আমজনতা সার্বজনীন ন্যূনতম আয়ের আশায় বাধ্য হয়ে সার্কাস দেখেন। তাই সার্কাসের খেলা হবে।

সার্কাস নয়, এমন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অন্তর্জালে প্রচুর মিলবে। সে আলোচনায় আর যাচ্ছি না। বরং উপসংহারে নিজের মতে গণতন্ত্রের ভাবসম্প্রসারণ করা যাক। গণতন্ত্র মানে নির্বাচনে হারতে শেখা। সঙ্গে যিনি জিতবেন তাঁকে বুঝতে হবে যে একার কৃতিত্বে তিনি জেতেন নি। বহু অচেনা মানুষ তাঁকে জিতিয়েছেন। সরকারি প্রকল্পের কৃতিত্ব "আমি" একা নেবো, "আমরা" ভাগ করবো, নাকি আসলে পুরোটাই জনগণের প্রাপ্য, এই তিনটি বিন্দুর মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের একটি ডাইমেনশন, বা মাত্রা। একই কথা কোনো একটি আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে। নন্দীগ্রামে বামফ্রন্টের প্রশাসনিক পদ্ধতিতে গলদ ছিল। আন্দোলন হয়েছিল, জমি অধিগ্রহণ কিংবা কারখানা হয়নি। সেই নন্দীগ্রাম এখন তৃণমূল আর বিজেপি-কে নিয়ে কি ফন্দি আঁটছে কে জানে? আসলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শুধু সঠিক-বেঠিক কিংবা ভালো-মন্দ হয় না। তার মাঝে অনেকটা জায়গা থাকে। সেখানে স্বাধীন চিন্তাভাবনা যত বেশি, বিষয়ের জটিলতা বাড়ে তত। তাই আঙ্কিক যুক্তিজাল (ম্যাথেমেটিক্যাল লজিক) হিসেবে ভাবলে রাজনীতি কিংবা গণতন্ত্রের পক্ষে একমুখী অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছোনো অসম্ভব। অঙ্ক এই অসম্পূর্ণতাকে বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে মেনে নেয়। কিন্তু নেতানেত্রীদের সেই মানার জায়গাটাতেই মুশকিল। তাঁদের সবকিছু যে সঠিক নয়, তার অকাট্য প্রমাণ গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল এবং বিপরীত মতের সহাবস্থান। সেই বৈপরীত্য ভুলে কান ধরে সরলরৈখিক পথে বিভিন্ন মতকে সিধে করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই ডেমোক্রাসি থেকে অনেক দেশ ঝুঁকে পড়ছে সন্ধিতে ডেমোটোক্র্যাসি কিংবা সন্ধি ভুলে অটোক্র্যাসির দিকে। তেমনটা যেন নিজভূমিতে দেখতে না হয়। তাই একটাই শুধু প্রার্থনা, সার্কাস হোক, কিংবা গণতন্ত্রের উদযাপন, দোসরা মে তাঁবু সরানোর পর সে জায়গায় যেন হলোকাস্টের চিহ্ন না থাকে। গণতন্ত্রকামী যেকোনো ভূমিখণ্ডের দশা যদি হয় মানহারা মানবীর মত, তখন পয়লা বৈশাখে কবি স্মরণই একমাত্র পথ। তবে বিধিসম্মত সতর্কীকরণ রইল - নিচের অংশটুকু যে কবিতা থেকে নেওয়া তা নন্দীগ্রাম নিয়ে লেখা নয়।

এসো যুগান্তরের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো "ক্ষমা করো" -
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

আত্মচিন্তা ‘ভয়ঙ্কর’? আহা, কী ‘সেকুলার’!

রূপসা

পয়লা বৈশাখ। বৈশাখী হাওয়ায় ‘বাঙালি’ হওয়ার উদ্ভাস। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বের ঝড়ের পূর্বাভাস। তা কালবৈশাখীর মতো মনোরম হবে কি না, জানা নেই। তবে বাকি সব জায়গায় যেভাবে হিন্দুত্বের লু বইছে, তাতে না হওয়ারই সম্ভাবনা। বিনামেঘে বজ্রপাতে হঠাৎ করে কারোর কপালে ‘বোমা বাঁধা’ হোক বা ‘সন্ত্রাসবাদী’ কাজ হোক বা ‘দেশদ্রোহে’র মতো অভিযোগের অশনি সংকেত এসে স্ট্রাইক করবে না, হলফ করে বলা যায় না। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে সে সবের লক্ষণ প্রকট।

পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিন ধরেই যে তর্কটা বারবার সামনে আসছে, তা হল, ‘সেকুলারিজম’ বনাম হিন্দুত্বের আগ্রাসন। অনেকেই বলছেন, বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত। হিন্দুত্বের সঙ্গে ‘হিন্দু’র সম্পর্ক কতটা, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকে। আর তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন হল, ‘হিন্দু’ বলে কিছু হয় কি না। ‘হিন্দ’ তথা সিন্ধ থেকে হিন্দু। অর্থাৎ, একটি ভৌগোলিক অবস্থান। অন্য দিকে, ‘হিন্দু’ ধর্ম কী? আদৌ কিছু আছে? নাকি সনাতন ধর্ম তথা ‘সৌর’, ‘বৈষ্ণব’, ‘শাক্ত’, ‘শৈব’-রই একটা আমব্রেলা টার্ম। চার ধারার মধ্যে বিরোধ হচ্ছে, এমনকী হাতাহাতিতে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে তর্ক বাহাস, সে সবের অতীত কেউ চাইলে খোঁজ করতে পারেন। কিন্তু বিষয় হল, হিন্দু বলে আসলে কিছু হয় না। কারণ তার কোনো কেতাবি ভাষ্য নেই। সঙ্গে এইটুকু মনে রাখা জরুরি ‘হিন্দু’র পরিচয়বাদের সঙ্গে উপনিবেশের রাজনীতির একটি জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য তা অন্য কথা, অন্য প্রসঙ্গ।

তা হলে হিন্দুত্ব কী! ভারত রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক মানচিত্রটির মধ্যে থাকা ধর্মীয় সংখ্যালঘু তথা মুসলমান, ঈসায়ী-সহ অন্যান্যদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে এক ধরনের পরিচয় তৈরি করা, তাকে সমসাত্ত্বিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা, ‘হিন্দু’-দের দেবদেবীর জিগির তুলে। এবং খানিকটা ক্ষমতার কেন্দ্রে যে আছে, তার ধর্মকেই অর্থাৎ রাজধর্মকেই প্রজাধর্ম হিসেবে চালানোর চেষ্টা, যা উপমহাদেশের অতীতের একটি চিহ্নদাগ। আর সেখানে জনসংখ্যার বিচারে তথা উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে যে ‘অপর’ ধর্ম সামনে আসছে, তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা, তার চিহ্নদাগকে শত্রু বানানোর চেষ্টা। অর্থাৎ, আর যেন কিছু না থাকে, এক এবং একমাত্র ‘হিন্দুধর্ম’-ই থাকুক (শত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, তাকে এক রকম বানানোর চেষ্টা), যদি ‘সংখ্যালঘু’ কেউ থাকেও, তাকে যেন খুঁজে বের করা না যায়, এতটাই নগণ্য হবে তার উপস্থিতি- এই চিন্তাই কাজ করতে থাকে সর্বদা। আর তাই, যে তার সমষ্টিগত জোর, উপস্থিতির কারণে একটা উল্লেখযোগ্য শক্তি আকারে সামনে থাকে, তাকে ‘থ্রেট’ আকারে গ্রহণ করা, এবং তাদের প্রতি দমন নিপীড়ন চালানো।

এ বার বিষয় হল, এই দমন-নিপীড়ন চালানোটা কীভাবে হয়। একটা হয় রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার ব্যবহার করে, আর একটি হল মতাদর্শ ব্যবহার করে। রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার অর্থাৎ, আমলা-মামলা-হামলা দিয়ে। অর্থাৎ, সরাসরি দমন নিপীড়ন, দরকারে মামলা মোকোদ্দমা করা, প্রশাসনিক নানা উপায়ে দমিয়ে রাখা। আর একটা মতাদর্শ দিয়ে, হিন্দুত্বের রাজনীতিকে, তার মতাদর্শকে মানুষের মনে চারিয়ে দেওয়া, যেখান থেকে মান্যতা পেতে পারে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন। এ বার প্রশ্ন হল, এই যে ‘সেকুলার’ বনাম হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের যে দ্বন্দ্বসমাস দেখে চলেছি, নিরন্তর-তাতে যুদ্ধটা কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মবাদ? এতটাই সহজ কি? বোধ হয় না। আর নয় যে, সেটা আব্বাস সিদ্দিকির একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সামনে আসার ঘটনা থেকেই প্রমাণিত।

(প্রসঙ্গত, এ কথাও মাথায় রাখা জরুরি, যে দেশে- শুধু এ দেশ বলে নয়, গোটা বিশ্বেই যেখানে নামের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ধর্ম-পরিচয়ের আঁকবাঁক, ভাষার মধ্যে নিহিত থাকে তা, সেখানে ধর্মহীনতা আদৌ প্র্যাকটিস করা সম্ভব কি না, কোনো ব্যক্তিমানুষের পক্ষে আদৌ ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব কি না, সে প্রশ্নটিও আসে বইকী!)

কী দিয়ে বোঝা গেল?

আইএসএফের নেতৃত্ব পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি-কে দেখা গেল, তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন, তাঁর ভাষায়। যে ভাষার

সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত 'বামপন্থী' মধ্যবিত্ত 'হিন্দু' বাঙালির সে অর্থে পরিচয় নেই। তাঁর পরনে ফেজ টুপি, মুখে দাঁড়ি, সাদা পাঞ্জাবি, পাজামা- ইসলামের চিহ্নবাহক প্রতিটাই। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না হয়তো, ভোটে দাঁড়ানোর আগে আব্বাসের কথায় নারীবিদ্বেষ স্পষ্ট (অবশ্য সে দোষে দুষ্ট নন কোনো রাজনীতি করা মানুষই!)। কিন্তু ভোটে দাঁড়ানোর পরে ব্রিগেডের মাঠে দাঁড়িয়ে আব্বাস যতটা না পরিচয়বাদ, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি বলেছেন এ দেশের মানুষের জীবনের, এবং আরো বিশেষভাবে বললে এ রাজ্যের ধর্মীয় সংখ্যালঘু গরিব মুসলমানের জীবনের সারসত্যটুকু, তাঁরা ভালো নেই।

ভালো যে নেই, তা বাম আমলে সাচার কমিটির রিপোর্টেই পরিষ্কার হয়েছিল। তার পরে দশ বছর তৃণমূল জমানায় সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ এসেছে প্রচুর, কিন্তু খাতায় কলমে প্রকল্পের দিকে চোখ রাখলে আলাদা করে মুসলমান জনগণের উন্নতিকল্পে কোনো সরকারি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যেমন হয়েছে কন্যাশ্রী রূপশ্রী আর সব শ্রী প্রকল্পে, তেমন কিছুই নেই। মুসলিম তোষণের অভিযোগে উসকানি বলতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর জুম্মাবার অর্থাৎ শুক্রবারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নেওয়া, অথবা ইসলামি চিহ্ন-সঙ্কেতকে শরীরে ধারণ করে প্রার্থনারত ছবি, আর বহু বিতর্কিত ইমাম ভাতা প্রকল্পের উচ্চারণ।

সমস্যা হল, সাধারণ দরিদ্র মুসলমানের তাতে কিছু এসে যায়নি। আর সব থেকে বড়ো কথা, পরিচিতিবাদ দিয়ে হয়তো রাজনীতি চলে, কিন্তু পেট চলে না। অর্থাৎ, জবকার্ড মেলা না মেলায়, পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে গুজরাটে, কেরালায়, বোম্বেতে কাজ করতে যাওয়ার সময়ে পেটই এক এবং একমাত্র নির্ণায়ক-স্থানীয় রাজনীতি, অর্থাৎ গোষ্ঠীসমাজের ক্ষমতার প্রকরণ তাকে চালিত হয়। আয়লায় জমিতে নোনাজল ঢুকে গিয়ে চাষাবাদ নষ্ট হয়ে গেলে যে মানুষগুলোকে ভিটেছাড়া হতে হয়, তাতে পরিচিতিবাদ কতটা প্রলেপ দেয়, সে প্রশ্ন তোলা বৃথা নয়।

এই ভালো না-থাকার বোধকে যে কোনো পরিচয়, সে ধর্মীয় হোক বা অর্থনৈতিক হোক বা ভাষিক হোক- যা কিছু দিয়ে চিহ্নায়িত করা চলে। কিন্তু মজাটা হল, যেই মুহূর্তে আব্বাসের দলের সঙ্গে জোটে গেলেন বামপন্থীরা, তখন অতি বড়ো বামপন্থী সমর্থকও বললেন, সাম্প্রদায়িক একটা দলকে সঙ্গে নিয়েছে বামেরা। একটু পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা গেল, এঁরা সকলেই 'এলিট' মধ্যবিত্ত তথাকথিত 'শিক্ষিত' 'বামপন্থী', জাতের বিচারে উচ্চবর্ণ হিন্দু। অর্থাৎ, তাঁরা ধরেই নিলেন, আব্বাস যেই মুহূর্তে ফেজটুপি, এক মুখ দাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছেন, সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর ধর্মীয় পরিচয়কেই সামনে আনছেন। অস্বস্তি হতে শুরু করল। অর্থাৎ, সেকুলার দশায় ধর্মাচরণের অধিকারের কথা ভুলে গেলেন তাঁরা। সেই একই 'থ্রেট' অনুভব করতে শুরু করলেন তাঁরাও, যা বিজেপি বা আরএসএস-এর মতো দলগুলি প্রকাশ্যে বলে।

অথচ বামপন্থী নেতা-সমর্থক-কর্মীদের নারী কমরেডরা ('হিন্দু' পুরুষদের এ সবের প্রয়োজন হয় না) যে শাঁখা সিঁদুর ইত্যাদির মতো চিহ্নপরিচায়ক জিনিসগুলি নিজেদের শরীরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহন করে চলেছেন, তা দিব্যি 'স্বাভাবিক' হয়ে গেছে জনমানসে। কালচারের দোহাই পেড়ে জায়েজও হয়েছে বটে। তাতে আপত্তি থাকবে কি না, থাকা উচিত কি না, সে প্রশ্ন অন্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বড়ো প্রশ্ন হল, কীভাবে তৈরি হচ্ছে মনন।

সম্প্রতি একটি লেখার শেষে 'আল্লাহ হাফিজ' বলার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গের এক প্রথিতযশা বামপন্থী আমাকে কিছু দিন আগে বলেছেন, 'আল্লাহ হাফিজ' কেন! হিন্দুত্ববাদের জিগিরকে প্রতিহত করতে গিয়ে 'তালিবানি' জিগির তুলতে হবে, সে কী কথা! অর্থাৎ, ধর্মপরিচয়বাহক কোনো কিছুই, যদি তা প্রকাশ্যে অভ্যাস করা হয়, তাঁর কাছে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কোনো না কোনো চূড়ান্তবাদীর কথা। অথচ সমস্যা হল, ঈশ্বর এমন এক সত্তা, সবহারানো সবখোয়ানোদের জন্য তিনি, একমাত্র তিনিই একমাত্র আধার। এই কথাটা শুনলেই কার্ল মার্কসের কথার বিকৃতি করে কেউ বলতেই, 'ধর্ম হল আফিম'। কিন্তু মনে করুন দেখি সেই গানটা, 'নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে'- কী মনে হবে? এই গান শুনে তো এখনও কেঁদে ভাসান বহু মানুষ। রবীন্দ্রানুরাগী 'বামপন্থীরা'ও তার মধ্যে পড়েন না সে কথা হলফ করে বলা চলে না। অথচ সেই কথাটাই অন্যরকমভাবে যখন আরবিতে বলছি, তার অর্থ খানিক এইরকম বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায় (অনুবাদ তো, বাদ পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়), আল্লাহ (ঈশ্বর) আপনাকে রক্ষা করুন, হেফাজত করুন, তখনই তা সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে। তো, এই রক্ষা কী? 'নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে'- নয় কি?

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, আব্বাস সিদ্দিকি তাঁর পোশাক আশাক আর বোলচালের কারণে দিব্যি হয়ে উঠলেন 'সাম্প্রদায়িক'। কেউ প্রশ্ন তুললেন না, 'সাম্প্রদায়িকতা' কাকে বলে, তার ভেদ-বিচার কী। আব্বাস মানুষ হিসেবে কতটা 'ভালো', তাঁর রাজনীতি আসলে কী, তিনি পরিচয়বাদী কি না, তাঁর কোনো কায়েমি স্বার্থ আছে কি না, এই প্রশ্নগুলো থাকতেই পারে। উঠতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আব্বাস কীভাবে গৃহীত হলেন 'সেকুলার' হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে? আরবি শব্দ কীভাবে গৃহীত হয় 'সেকুলার' হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে। যাঁরা নাকি ধর্ম মানেন না, 'নাস্তিক' (নাস্তিক

কাকে বলে, সেটাও অন্য তর্ক) তাঁরা তা হলে ধর্মের চিহ্নপরিচয়ে আতঙ্কিত হচ্ছেন কেন- এই প্রশ্নগুলি বোধহয় এই সময়ে দাঁড়িয়ে ভাবা উচিত।

এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে আল কায়দার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে যে ক-জন তরুণকে ধরা হয়েছে, কলকাতা থেকে বামপন্থীদের একটি ফ্যাক্টফাইন্ডিং টিম সেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে শোনেন, অভিযুক্তদের কেউ কেউ 'নামাজি', 'ধর্মপ্রাণ' ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকায় তাঁদের। 'নামাজি', কেন? তা হলে প্রশ্ন হল, মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির 'সেকুলার ইমাজিনেশন' কি তবে আসলে সেই হিন্দুত্ববাদী জিগির যেভাবে 'অপর'কে নেই হতে দেখতে চায়, সেটারই আরো একটু দীর্ঘায়িত রূপ? সেও কি আসলে বিজেপি আরএসএস যাকে 'অপর' করে, তাকেই আরো গভীর ভাবে 'অপর' করে না? আর তার জন্যই আরবি ফার্সি শব্দ, ফেজ টুপি, দাড়ি, তার কাছেও মনে হয় 'অপর'। এনআরসি সিএএ-র বিরোধিতা করে মেয়েদের আন্দোলনে সে প্রত্যক্ষ করে নাকাব, বিন্দির উল্লাস। ভয় পায়। ভাবা উচিত ছিল, অনেক আগে থেকেই।

'সেকুলারিজমে'র পলিটিক্স করতে যাওয়া মানুষরা কি একটু গভীরে গিয়ে ভাবতে পারেন না, কোনটা সংস্কৃতির ধুয়ো তুলে 'নর্ম্যালাইজড' হয়ে গেছে, আর কোনটা 'সাম্প্রদায়িকতা'-র ধুয়ো তুলে 'ধর্ম' আর 'পরিচয়ে' এসে ঠেকেছে।

আমার এক পরিচিত, কিছু কাল আগে আমায় বলেছিলেন, এ কী নিষ্ঠুরতা, সবহারানো সবখোয়ানো মানুষের কাছ থেকে ওরা আল্লাহ, নবিকেও কেড়ে নিতে চান? আমারও প্রশ্ন তাই- এ কী নিষ্ঠুরতা- 'সেকুলারিজম'-এর দোহাই পেড়ে মানুষের ভাষা, ধর্ম, যাপনকে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাওয়া হয়?

আব্বাস সিদ্দিকি উত্থান এই বিষয়গুলির দিকে আবারও একটু চোখ ফেরাতে বাধ্য করেছে। বাধ্য করেছে এটা ভাবতে- মানুষ শুধু খেয়ে পরে বাঁচে না- সে ভাবনায় বাঁচে, ভাষায় বাঁচে, চিহ্নে বাঁচে। তাই লকডাউনে মানুষের হাতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার পরে সে যখন অতিরিক্ত চাল বিক্রি করে পেঁয়াজ, নুন, মশলা কিনতে বেরোয় বা মোবাইল ফোন রিচার্জ করতে, তাঁকে গাল দেওয়া মানে, তাঁকে 'ডিহিউম্যানাইজ' করে ফেলা। সেটা পুঁজি করে, সেটা 'সেকুলারিজম'-এর রাজনীতি করে।

এই আর কী!

আল্লাহ হাফিজ।

ছবি : মিতালি দে

গানের মধ্যে ভাগাভাগি

পলাশ বরন পাল

চীনা ভাষায় যেকোনো শব্দের একটা নির্দিষ্ট সুর থাকে, সেই সুরে শব্দটা না বললে তার অর্থ পালটে যায়। সেই ভাষায় যখন গান গাওয়া হয়, তখন তার কথা নিয়ে তাই বিপত্তি হয়। গানের সুর এসে ঢেকে দেয় কথার সুর, ফলে অর্থ বোঝা যায় না। চীনা গান যেকোনোভাবে প্রচার করতে গেলে তাই সঙ্গে কথাগুলো লিখে দিতে হয়। যদি গানের ক্যাসেট বা সিডি বেরোয়, তার সঙ্গে গানের কথা সম্বলিত একটি কাগজ বা পুস্তিকা না দিলে চলে না।

বাংলায়, বা ভারতের অন্যান্য ভাষায়, এ সমস্যা নেই, কেন না শব্দের কোনো বাঁধা সুর ধার্য করা নেই। তাই গানের সঙ্গে তার কথা লিখে দেওয়াটা আবশ্যিক নয়। ঠিক করে উচ্চারণ করলে গানের প্রতিটি শব্দ বুঝতে পারা নিয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু অন্য একটা সমস্যা হয়। একটি বাক্য কোথায় শেষ হয়ে অন্য বাক্য শুরু হচ্ছে, সেটা অনেক সময়েই গানের সুরের প্রকোপে বোঝা যায় না। গানে হয়তো তালবিভাগের জন্য কোথাও থামতে হয়, কোথাও গায়ক শ্বাস নেওয়ার জন্যও থামেন। ফলে মনে হয়, ওখানেই বাক্যবিভাগ হচ্ছে। অথচ অনেক সময়ে তা নয়, তাই গানের অর্থ নিয়ে ভুল ধারণা জন্মায় শ্রোতার মনে। কোথাও বেশ উলটোরকমের অর্থও প্রকাশ পায়।

শুধু বাক্যবিভাগ নয়। একটি বাক্যের মধ্যেও যেকোনো জায়গায় থামা যায় না। দু-তিনটি শব্দের চেয়ে লম্বা সমস্ত বাক্যই কয়েকটি পর্বে বিভক্ত থাকে। ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য একটা বাক্য নেওয়া যাক।

> আমি প্রতি শনিবার সকালবেলায় দেরি করে ঘুম থেকে উঠি।

বাক্যটা এক নিশ্বাসে বলে ফেলাই যায়, মাঝখানে কোথাও না থেমে। কিন্তু ধরুন যেকোনো কারণেই হোক, আপনি যদি মাঝখানে কোথাও একটু থামতে চান, কোথায় থামবেন? ভেবে দেখুন, 'আমি প্রতি' বলার পরে দম নিয়ে বাকিটা বলবেন কি? কিংবা 'দেরি' আর 'করে' এই দুটো শব্দের মাঝে থামবেন কি? 'ঘুম' বলার পরে থামলেও বেশ আশ্চর্য শোনাবে। আসলে, বাক্যটার মধ্যে কয়েকটা পর্ব আছে। ভাগ করে দেখালে এইরকম হয়—

> আমি // প্রতি শনিবার // সকালবেলায় // দেরি করে // ঘুম থেকে উঠি।

সব কটি ভাগে যে থামতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, আগেই তো বলেছি কোথাও না থেমেও বাক্যটি বলা যায়। কিন্তু বিরতি যদি নিতেই হয়, তাহলে পর্বান্তরে যাওয়ার সময়েই নিতে হবে, অন্য জায়গায় নিলে চলবে না।

কবিতা বা গানের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যোগ হয় আর এক রকমের পর্ববিভাগ, তা ছন্দের বা তালের। সেই বিভাগ অনেক সময়ে বাক্যের স্বাভাবিক বিভাগের সঙ্গে মেলে না। সমস্যা হয় সেখানেও।

কোথাও কোথাও সমস্যা মৃদু। অর্থাৎ, বিভাগের তফাতে অর্থের কোনো বড়ো রকমের বিপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই দেখুন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা একটা গানের প্রথম লাইন—

> এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন,
> কাছে যাবো কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।

এর প্রথম লাইনটা যদি কেউ কথা বলার মতো করে পড়েন, তাহলে যেখানে যেখানে থামা সম্ভব সেগুলোকে আগের মতো দাগ দিয়ে দেখানো যাক—

> এই // মেঘলা দিনে // একলা ঘরে // থাকে না তো // মন।

কিন্তু গানটা গাইবার সময়ে সুরকার তথা শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ভাগাভাগিটা করলেন এইরকম—

> এই মেঘলা // দিনে একলা // ঘরে থাকে // না তো মন।

অর্থ গুলিয়ে যাওয়া সম্ভাবনা নেই, বরং অপ্রত্যাশিত পর্ববিভাগটা মনে একটা দোলা দিয়ে যায়।

এবার দেখা যাক অন্য একটা গানের শুরুর দু-লাইন—

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে;
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি—

গীতবিতান, প্রেম পর্যায়, ২২৩ নম্বর। গানটি কীভাবে ছাপা হয় তা যদি লক্ষ করেন, দেখবেন, প্রথম লাইনে 'এই' আর 'পথে পথে', এই দু-জায়গার পরে খানিকটা ফাঁক আছে। দ্বিতীয় লাইনে 'তোমার' শব্দটির দু-দিকেই ফাঁক আছে। এবারে সুরের ও তালের দিকটা দেখা যাক। গানটি দাদরা তালের, ছ-মাত্রার পর্ব। প্রথম লাইনে শম পড়ে 'উদাসী' শব্দের গোড়ায়, সেখান থেকে 'হাওয়ার' পর্যন্ত বললে ছ-মাত্রার একটি আবর্তন শেষ হয়। এর পরের ছ-মাত্রায় 'পথে পথে'। বাক্যের স্বাভাবিক যে পর্ববিভাগ, তার সঙ্গে এটা বেশ মিলে যায়। বাক্যের দিক থেকে দেখলেও এখানে নিঃশ্বাস নিলে সঙ্গত হয়, তালের দিক থেকেও হয়। পরের লাইনে কিন্তু একটু অন্যরকম। বাক্যের অর্থ বিচার করলে এখানে দুটো পর্ব হওয়া উচিত ছিল, 'আমি কুড়িয়ে নিয়েছি', আর 'তোমার চরণে দিয়েছি'। কিন্তু তালের আবর্তনে গোড়ার 'আমি' জুড়ে যায় আগের লাইনের শেষের 'ঝরে' শব্দের সঙ্গে, তার পরে আসে 'কু-ড়ি-য়ে নি-য়ে-০ // ছি-০-০ তো-মা-র // '। এর মধ্যে '০' মানে হল সুরের টান, স্বরলিপির সঙ্কেত। তাহলে তালের দিক থেকে দেখলে পর্বভাগ হচ্ছে 'কুড়িয়ে নিয়েছি তোমার // চরণে দিয়েছি'। তবু, 'নিয়েছি'-এর পরে দুটো শূন্যমাত্রা আছে বলে ইচ্ছে করলে ভাগটা বোঝানো সম্ভব, এবং না বোঝালেও অর্থ নিয়ে খুব বড়োসড়ো কোনো বিভ্রাটের সম্ভাবনা নেই।

সব গানের সব জায়গায় কিছু পরিণাম এতো অকিঞ্চিৎকর হয় না। সুধীন দাশগুপ্ত রচিত এবং সুরারোপিত 'এই উজ্জ্বল দিন' গানটার কথা ধরুন। প্রথম কয়েকটি লাইন এরকম—

এই উজ্জ্বল দিন, ডাকে স্বপ্ন রঙিন,
ছুটে আয় রে লগন বয়ে যায় রে,
মিলন বীন ওই তো তুলেছে তান,
শোনো ওই আহ্বান।

কাহারবা তালের গান। তার ৮ মাত্রার বিভাগগুলো পড়ে এইরকম—

আয় রে লগন বয়ে //
যায় রে মিলন বীন //
ওই তো তুলেছে তান

কথা হচ্ছে, 'মিলন বীন' কোথাও যাচ্ছে না। 'যায় রে' অংশটার যোগ 'লগন বয়ে' অংশের সঙ্গে। কিন্তু সে কথা গানের তালের তোড়ে বোঝা যায় না।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপার এরকম আর একটা নমুনা দেখা যাক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্যপুষ্পভরা' গানটির শেষ স্তবকের একটি অংশ

আমার এই দেশেতে জন্ম—
যেন এই দেশেতে মরি।

রচনাবলীতে এইভাবেই লেখা আছে, প্রথম লাইনটির পরে একটি লম্বা ড্যাশ সহযোগে। হলে হবে কী, গাইবার সময়ে প্রায় সকলেই দাদরা তালের চালে মোহিত হয়ে পর্বভাগ করেন এইরকম—

এই দেশেতে // জন্ম যেন // এই দেশেতে //

ইত্যাদি। 'জন্ম যেন' একসঙ্গে উচ্চারণ করা হয়, তার আগে পাছে দম নেওয়া হয়, কেননা ওই দুটি শব্দের উচ্চারণ মিলে ৬ মাত্রার পর্ব হয়। কিন্তু তাতে যে অর্থটা একটু উদ্ভট হয়ে পড়ে, সে দিকে খেয়াল করেন না অনেকেই। 'যেন' কথাটার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব আছে। কবির নিজের জন্ম তো অনিশ্চিত নয়, সে তো আগেই ঘটেছে। মৃত্যুও অনিশ্চিত নয়, হবেই। কিন্তু মৃত্যু কোথায় হবে তার কোনো নিশ্চিতি নেই। কবির প্রার্থনা, যে দেশে তাঁর জন্ম হয়েছে সেই দেশেই যেন তাঁর মৃত্যু হয়। জন্মের সঙ্গে 'যেন' কথাটা জুড়ে দিলে সেটা অর্থের দিকে থেকে হাস্যকর শোনায়, অথবা অর্থবোধ শিকেয় তুলে সে গান শুনতে হয়। আমরা সেইভাবে শুনতেই অভ্যস্ত।

গানের বাণী তো আর আমরা বদলাতে পারি না, কিন্তু একটা ছোট্টো কাজ করে অর্থটার প্রতি একটু সম্মান জানাতে পারি। সাধারণত যেভাবে গাওয়া হয় তাতে মাত্রাবিভাগ হয় এইরকম— 'জ-ন্-মো/যে-নো-০', অর্থাৎ এই পর্বের শেষ মাত্রাটিতে ফাঁক থাকে, টান থাকে। তা না করে যদি গাওয়া যায় 'জ-ন্-মো/০-যে-নো', এবং 'জন্ম' উচ্চারণ করার পরে দম নেওয়া হয়, তাহলেই দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি সুবিচার করা হয়।

অর্থবিভ্রাটের আরো বড়ো একটা উদাহরণ দেখা যাক, আর এক দিকপাল সঙ্গীতরচয়িতার একটি গানের। প্রথম লাইন—

আমায় নহে গো ভালোবাসো, শুধু ভালোবাসো মোর গান।

লাইনটা এইভাবে আমি লিখলাম, যা শুনেছি তার ভিত্তিতে। নজরুল কীভাবে যতিচিহ্ন বসিয়েছিলেন জানি না। নজরুলের সঙ্গীত সংগ্রহে এ লাইনটি এইভাবে আছে—

আমায় নহে গো— ভালবাস শুধু ভালোবাস মোর গান।

এভাবেও ভাবা যেতে পারে। মোট কথা, গোটা গানটির পদগুলো যদি দেখা যায়, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যায়, প্রথম লাইনে বলা হচ্ছে— আমায় তুমি ভালোবাসো না, কেবল আমার গানই তোমার ভালো লাগে। পরে যেমন আছে,

চাঁদেরে কে চায়— জোছনা সবাই যাচে,

ইত্যাদি।

গানটি গাইবার সময়ে অনেকেই মনে করেন, প্রথম পঙক্তির পর্ববিভাগটা এইরকম—

আমায় নহে গো ভালোবাসো শুধু // ভালোবাসো মোর গান।

এভাবে বললে দম নিতে সুবিধে হয়। কিন্তু অর্থের বেশ আকাশ-পাতাল তফাত হয়। এতে মনে হয়— তুমি শুধু আমাকেই ভালোবাসো না, আমার গানও ভালোবাসো।

গুরুতর তফাত। তবে এ কথাও ঠিক, গানের প্রথম লাইনের সুরে একটা ব্যাপার আছে যাতে এই ভুলের ফাঁদে সহজে পা দেন গায়কেরা। আমি স্বরলিপি দেখিনি, নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি পাওয়া যায় কিনা তাও জানি না— গানটা যেভাবে শুনেছি তার ভিত্তিতে লিখছি। গানটি কাহারবা তালের, ৮ মাত্রার। মাঝখানের দুটি শব্দ, 'ভালোবাসো শুধু', উচ্চারিত হয় একটি ৮ মাত্রার আবর্তন জুড়ে। এই পর্বের শেষে একটি ফাঁক আছে, অর্থাৎ আটটি মাত্রা হলো 'ভা-লো-বা-সো-০-শু-ধু-০'। পর্বের শেষে এই ফাঁকটি থাকার ফলে ওখানে গায়কেরা শ্বাস নিতে চান, তাতেই বিপত্তি ঘটে। তা না করে যদি ওই ফাঁকটাকে 'শুধু' শব্দের আগে নিয়ে আসা যায়, তাহলে আসল অর্থটার কাছাকাছি পৌঁছোনো যায়। নজরুল যদি অন্যভাবে লিখতেন কথাগুলো, তাহলে হয়তো এরকম বিপর্যয়ের সম্ভাবনা এড়ানো যেতো। ধরা যাক যদি লিখতেন,

আমায় তো ভালোবাসো না গো, ভালোবাসো শুধু মোর গান।

তাহলে কোনো অসুবিধে হত না অর্থ বোঝায়। কিন্তু তিনি তা লেখেননি। আমরা গাইবার সময়ে খোদার ওপর খোদকারি করতে পারি না। তবে, আগে যা বললাম, একটা ফাঁক এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যাওয়া, সেটা খোদকারির পর্যায়ে গণ্য হবে না।

এতক্ষণ যা বললাম তা সবই বাক্যের মধ্যে পর্ববিভাগ নিয়ে কথা। গোটা বাক্য কোথায় শেষ হচ্ছে তা নিয়েও গণ্ডগোল হয়। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'প্রত্যাশা' নামক কবিতার প্রথম স্তবকটি দেখা যাক।

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
'এসেছে কি।'

শিরীষ গাছটি অক্লান্তভাবে ফুল ফোটাচ্ছে ফাল্গুন মাসে, শীত শেষ হয়ে যাওয়ার আনন্দে। সারাদিন ধরে চলছে তার এই ফুল ফোটানো। এইখানে প্রথম বাক্য শেষ হচ্ছে, দাঁড়ি দেওয়া আছে। এর পরের বাক্যে বলা হচ্ছে — দিন শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলায় সেই শিরীষ গাছ প্রশ্ন করছে, 'এসেছে কি'।

গানের সুর যা, তাতে এই বাক্যবিভাগ বোঝা শক্ত। মনে হয় প্রথম বাক্য সমাপ্ত হচ্ছে চতুর্থ লাইনের পরে, অর্থাৎ 'শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা' এই শব্দ কটি দিয়ে।

কেন মনে হচ্ছে? দুটি কারণে। প্রথমটি হলো গানের মাত্রাবিভাগ। গানটি দাদরা তালে ছয় মাত্রায় বাঁধা। তৃতীয় লাইনের শেষে 'খেলা' শব্দটি গাওয়ার সময়ে প্রথম তিন মাত্রার মধ্যে শব্দটির উচ্চারণ কার্যত শেষ হয়ে যায়, তার পরের তিনটি মাত্রা 'আ-আ-আ' বলে টান দেওয়া হয়। এই টানটা একটা সেতুবন্ধনের কাজ করে পরবর্তী লাইনের কথার সঙ্গে, অর্থাৎ ওই টানে অনিবার্যভাবে এসে যায় পরের লাইনটি, ওখানে যে অন্য একটা বাক্য শুরু হচ্ছে তা বোঝবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় কারণটি এসে উপস্থিত হয় চতুর্থ লাইনের শেষে। 'সন্ধ্যাবেলা' শব্দটি উচ্চারণ করতে হয় একটি আবর্তনের পুরো ছটি মাত্রা ধরে, এতে যে পর্দাগুলি লাগে তা হলো 'র-জ্ঞ-জ্ঞ-ঋ-স-স'। পরের লাইনের 'প্রত্যহ সেই' শুরু হয় চড়ার সা থেকে (স্বরলিপির সঙ্কেতে যা 'র্স'), আগের পর্দাগুলোর থেকে অনেকটাই দূরে। সুর যে এখানে লাফিয়ে চলে গেলো দূরে, সেটাকে বাক্যান্তরে যাওয়ার একটা ইঙ্গিত হিসেবে আমরা ধরে নিই।

একটু অন্যভাবে বলা যাক। কেউ যখন এই গানটি গাইতে বসেন, তখন যদি প্রথম এক-দু লাইন গাওয়ার পরেই তাঁর কোনো কারণে মনে হয় একটু থামার প্রয়োজন, তাহলে কি 'ফুল-ফোটানোর খেলা' উচ্চারণ করার পরে তিনি পুরো ছ-মাত্রা চুপ করে থাকতে পারবেন? পারবেন না, কেননা ওখানে কথাটা শেষ হওয়ার পরে তিনটে মাত্রার টান আছে, সেই টানের পরে ধপ করে থামা যায় না, পরের কথাটায় চলে যেতে হয়। 'সন্ধ্যাবেলা' বলার পরে আসবে সেই সুযোগ, এখানে গায়ক বিশ্রাম নিতে পারবেন একটু, সঙ্গতকারীদের হাতে ছেড়ে দিতে পারবেন। পুরো ছয় মাত্রা পরিমাণ (বা তার যে

কোনো গুণিতক পরিমাণ) থেমে তার পরে গায়ক আবার ধরতে পারবেন, 'প্রত্যহ সেই...'।

এই গানের যিনি রচয়িতা এবং সুরকার, তিনি এ কথা ভেবে দেখেননি, এটা আমার বেশ আশ্চর্য লাগে। গানের জন্য অন্য রকমের একটা কোনো অর্থ ভেবেছিলেন, সে কথাও ঠিক মনে হয় না, কেননা গীতবিতানেও দাঁড়ি আছে ঠিক একই জায়গায়। গায়কের কিছু করার আছে কি? হয়তো 'খেলা' বলার পরে একটু বাজনা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তারপরে 'ক্ষান্তকূজন' শুরু করা যায়। কিন্তু তাতেও, 'প্রত্যহ সেই' বলার সময়ে সুরটা যে হঠাৎ উঠে যাচ্ছে, শ্রোতা সেখানে নতুন বাক্যের শুরু ভেবে নিতেই পারেন, সে সম্ভাবনা এড়ানো যায় না।

আর একটা উদাহরণ, গীতবিতানের প্রেম পর্যায়ের ৯১ নম্বর গান, প্রথম লাইন 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।' অন্তরায় আছে,

> তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন, যেথা তোমার ধুলার শয়ন
> সেথা আঁচল পাতব আমার— তোমার রাগে অনুরাগী।

যাঁর বয়ানে এই গান, তিনি প্রেমে কলঙ্কভাগী হওয়ার জন্য কী কী করবেন? প্রথমত, তাঁর প্রিয়তমের পথের কাঁটা চয়ন করবেন। দ্বিতীয়ত, প্রিয়তমের ধুলার শয়নের পাশে নিজের আঁচল পাতবেন। দুটি আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। মাঝখানে দাঁড়ি দিলেও চলতো। কমা দেওয়া হয়েছে, দুটি বাক্যই যে 'তোমার রাগে অনুরাগী' অংশের সঙ্গে ভাবসূত্রে অন্বিত সে কথা বোঝাবার জন্য।

গানটি গাওয়ার সময়ে নানা রকমের বিভ্রাট উপস্থিত হয়। বিভ্রাটের প্রথম কারণ, 'সেথা' শব্দটি বলার সময়ে সুরটা 'সা' থেকে এক লাফে চলে যায় 'দা' (অর্থাৎ কোমল 'ধা') পর্দায়। ফলে গায়কের মনে ধারণা হয়, ওখান থেকে নতুন একটা বাক্য শুরু হল বুঝি। এর সঙ্গে যোগ হয় স্বরলিপিতে একটি সম্ভাব্য মুদ্রণপ্রমাদ। অন্তত কোনো কোনো সংস্করণে লেখা আছে 'সেথায় তোমার ধুলায় শয়ন'। বাক্যের মধ্যে কোথাও 'সেথা' বসলে তার আগে একটা 'যেথা' প্রত্যাশিত, অথচ স্বরলিপি অনুযায়ী সেটি কোথাও নেই। তাই সব মিলিয়ে যা গাওয়া হয় তার কোনো অর্থ হয় না।

এ সব তো গেলো সুরের বা তালের সঙ্গে কথার বিরোধের প্রসঙ্গ। যেখানে কোনো বিরোধ নেই, সেখানেও উলটোপালটা জায়গায় দম নিয়ে বা কথার পুনরাবর্তন ঘটিয়ে এমন বিরোধ তৈরি করা হয়, যা কোনোক্রমেই সঙ্গীতরচয়িতার অভিপ্রেত ছিল না। আমার ভাই পরাগবরনের স্মৃতিতে একটা ঘটনার কথা আছে, যেখানে দেবব্রত বিশ্বাস একজনকে তিরস্কার করেছিলেন একটি গানের কথা নিয়ে। গানটি রবীন্দ্রনাথের, 'তোমার দ্বারে কেন আসি'। অন্তরায় আছে,

> সে-সব চাওয়া সুখে দুখে ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে,
> গভীর বুকে
> যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই॥

এই উদ্ধৃতির প্রথম লাইনটির পরে পরিষ্কার একটি কমা বসানো আছে, তবু সেই গায়কের চৈতন্য হয়নি, 'গভীর বুকে যে চাওয়াটি গোপন' তার কথা যে বলা হচ্ছে সে কথা তিনি খেয়াল করেননি। 'গভীর বুকে' পর্যন্ত উচ্চারণ করে তিনি আবার 'সে সব চাওয়া' থেকে পুনরাবর্তন করেছিলেন কথার, এবং দেবব্রতর তিরস্কারভাজন হয়েছিলেন। কেননা, তাতে মনে হচ্ছিল, সে-সব চাওয়া সুখে দুখে ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে (এবং) গভীর বুকে। অর্থের যাচ্ছেতাই জগাখিচুড়ি।

গীতবিতানের প্রেম পর্যায়ের ২২ নম্বর গানের প্রথম লাইন—

> পাখি আমার নীড়ের পাখি অধীর হলো কেন জানি—

অর্থের দিক থেকে 'কেন জানি' একই পর্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। এটা বাংলার একটা বিশেষ বাকভঙ্গি, যার অর্থ "আমি জানি না'। সুরের এবং তালের দিক থেকেও এই দুটি শব্দের মধ্যে থামবার কোনো প্রয়োজন নেই— দাদরা তালের একটা ছ-মাত্রার পর্বের মধ্যেই দুটি শব্দের অধিষ্ঠান। তবু শুনেছি কেউ কেউ 'কেন' বলার পরে থেমে 'জানি' উচ্চারণ করছেন। যেন মনে হচ্ছে, পাখি 'অধীর হল কেন' তা তিনি জানেন। হয়তো জানেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানতেন না, শুধুমাত্র একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত তিনি জানিয়েছিলেন পরের লাইনে—

> আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর
> কানাকানি॥

গানের খাতিরে লাইনটির পরে ডবল দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা আসলে প্রশ্ন, পাখির অধীর হওয়ার কারণ সম্পর্কে কবির অনুমান।

আসলে, আমাদের দেশের সঙ্গীতের ঐতিহ্যে গানের বাণী নিয়ে মাথা না ঘামানোর একট রেওয়াজ আছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তো কথা বুঝে ওঠাই দুষ্কর, সুরই সেখানে সব। সেই ঐতিহ্যের বাহক হয়ে আমরা অনেক সময়েই কথাগুলোকে হেলাফেলা করতে থাকি এমন গানেও, যেখানে কথাই মুখ্য, সুর তার বাহন মাত্র। অথবা, অন্তত কথাগুলো নিয়ে কোনো চিন্তাই করি না। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল নজরুল থেকে শুরু করে গোটা বিংশ শতাব্দীর আরো এতোজনের রচিত এতো কাব্যগীতির বিপুল সম্ভারের পরেও সে অভ্যেস পুরোপুরি বদলায়নি।

কৃতজ্ঞতা: পরাগবরণ পাল, পুরব পাল, শমিত দে।

টীকা

১. রবীন্দ্রনাথের সব কটি উল্লিখিত গানের পাঠ এবং স্বরলিপি মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে আন্তর্জালের https://www.tagoreweb.in/ সংকলনের সঙ্গে।

২. দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ছত্রটি টোকা হয়েছে এইখান থেকে— "দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', সম্পাদক: রথীন্দ্রনাথ রায় (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৮)

৩. নজরুলের যে সঙ্গীত সংগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল— 'নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ', সম্পাদক : রশিদুন্ নবী (নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০১১-র সংস্করণ)।

৩. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং সুধীন দাশগুপ্তর গানগুলোর কোনো লিখিত রূপ আমি দেখিনি। শুনে যা মনে হয়েছে, সেইভাবে লিখে দিয়েছি।

৪. 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী' গানটির স্বরলিপি দেখতে পাবেন, এবং বিভিন্ন শিল্পীর গলায় এই গানটি শুনতে পাবেন, আন্তর্জালের https://www.tagoreweb.in/Songs/prem-235/ ami–tomar–preme–habe–5468 ঠিকানায়।

৫. 'তোমার দ্বারে কেন আসি' গানটি সম্পর্কিত দেবব্রত বিশ্বাসের কাহিনীটি শুনতে পাবেন এইখানে— https://www.youtube.com/watch?v=gvW4q5McMZU

৬. "পাখি আমার নীড়ের পাখি' গানটিতে "কেন' আর "জানি' বেশ প্রকটভাবে আলাদা করে উচ্চারণ করার উদাহরণস্বরূপ শুনতে পারেন— https://www.youtube.com/ watch? v = r0BAxFQt4TE

ছবি : মিতালি দে

সুকুমার রায়ের মৃত্যু: দায়ী কে?

আশীষ লাহিড়ী

লিশম্যানিয়া একরকম পরজীবী জীবাণু যা এক ধরনের রক্তচোষা বালুমাছির দ্বারা বাহিত হয়ে মানুষের দেহে আস্তানা গেড়ে লিশম্যানিয়াসিস অসুখ বাধায়। নামের উৎস উইলিয়াম লিশম্যান (১৮৬৫-১৯২৬), যিনি ১৯০১ সালে এক কালাজ্বর রোগীর প্লীহার মধ্যে এই জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন। যকৃত ও প্লীহার লিশম্যানিয়াসিস-এর বৈজ্ঞানিক নাম ভিসেরাল লিশম্যানিয়াসিস, আর তারই চলতি বাংলা নাম কালাজ্বর; এক সময় দমদম জ্বরও বলা হত।

আপামর বাঙালি জানে, সুকুমার রায় ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ওই অসুখে মারা গিয়েছিলেন। আপামর বাঙালির আরো বিশ্বাস, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৩-১৯৪৬) আবিষ্কৃত কালাজ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র ইউরিয়া স্টিবামিন ঠিক তার পরেই বাজারে আসে; যদি আর অল্প কিছুদিন আগে ওই ওষুধ ডাক্তারবাবুদের হাতে আসত, তাহলে বাঙালির এতবড়ো সর্বনাশটা হত না।

এই ধারণাটা ভুল। ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কারের ইতিহাসটা একটু খুঁটিয়ে দেখলে খানিকটা অন্যরকম একটা ছবি ফুটে ওঠে।

রাসায়নিক জীবাণু-যুদ্ধের ইতিহাসে বিশ শতকের তিনটি আবিষ্কার স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। ১৯০৭ সালে জার্মানিতে পল এর্লরিখ-এর ল্যাবে সংশ্লেষিত হয় আর্স্‌ফেনামিন নামক রাসায়নিক যৌগ; ১৯০৯ সালে তাঁর জাপানি সহযোগী সাহাচিরো হাতা দেখালেন, এটি সিফিলিসের জীবাণু ট্রিপোনিমা প্যালিডামের বিরুদ্ধে অসাধারণ কার্যকর। ১৯১০ সালে 'স্যালভার্সান' বাণিজ্যিক নাম দিয়ে এটি বিপণন করল হেক্স্ট কম্পানি। ল্যাব থেকে বাজারে আসতে সময় লেগেছিল মাত্র তিন বছর।

এর পর ১৯২৮-এ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক জীবিত ফাঙ্গাস-নিঃসৃত পদার্থের ক্রিয়ায় স্ট্যাফিলোকোকাস জীবাণুর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করলেন। সেটিই প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক। কিন্তু ব্যবহারযোগ্য ওষুধ হিসেবে বাজারে আসতে পেনিসিলিনের আরো চোদ্দো বছর সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির আহত সৈন্যদের প্রাণ বাঁচানোর আশু তাগিদে অক্সফোর্ডের 'ল্যাবরেটরি কারখানায়' সেই কাজ সুসম্পন্ন করলেন এর্নস্ট চেইন এবং হাওয়ার্ড্ ফ্লোরি (আর বছরখানেক আগে ওষুধটি বেরোলে রবীন্দ্রনাথ হয়তো বেঁচে যেতেন)। ফ্লেমিং, ফ্লোরি, চেইন কেউই এর পেটেন্ট নেননি। যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেনে তখন এ ওষুধ তৈরি করা সম্ভব ছিল না। সেই সুযোগ নিয়ে আমেরিকার ই মার্ক কোম্পানি পেনিসিলিনের পেটেন্ট নিয়ে নেয়।

১৯৩২-এ জার্মানির বেয়ার কম্পানির ল্যাবরেটরিতে গের্হার্ট ডোম্যাক (Domagk) তৈরি করলেন প্রোন্টোসিল - অর্থাৎ সালফোনামাইড (সালফা), যা বহু লোকের - তাঁর কন্যারও - স্ট্রেপ্টোকোকাস সংক্রমণ সারিয়ে দিল। নাতিবিলম্বে বাজারে চলে এল এই ওষুধ। বিরাট পুঁজি, বিরাট যুদ্ধ, বিরাট আয়োজন, বিরাট সাফল্য, সবই আধুনিক বিগ সায়েন্সের কুললক্ষণ।

ঠিক ওই পর্বেই, ওই পরম্পরাতেই, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী নামক একজন বাঙালি রসায়নবিদ ও ডাক্তার শিয়ালদার ক্যাম্বেল স্কুলে ১০ হাত × ৬ হাত এক ঘুপচি ল্যাবে এক কম্পাউন্ডার ও তিন তরুণ ছাত্রকে নিয়ে হরেক অসুবিধার মধ্যে ১৯১৫ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত কাজ করে ১৯২২ সালে তৈরি করে ফেলেছিলেন ইউরিয়া স্টিবামিন নামক এক রাসায়নিক পদার্থ, যা লিশম্যানিয়া পরজীবী-নিধনে পারঙ্গম। তখনো দিগন্তে পেনিসিলিন কিংবা প্রন্টোসিল অনাগত। এটিও রাসায়নিক জীবাণু-যুদ্ধে এক মস্ত অগ্রগতি, বিশেষ করে যখন পেনিসিলিন আর সালফা দুটোই অনাবিষ্কৃত।

ব্রহ্মচারীরা আদতে ছিলেন মুখোপাধ্যায়। পিতা নীলমণিও ছিলেন ডাক্তার, পূর্ব রেলওয়ের চাকুরে। ১৮৭৩-এ উপেন্দ্রনাথের জন্মের সময় তিনি জামালপুরে। তাঁর ইচ্ছা পুত্রও ডাক্তার হোক। কিন্তু গণিত আর রসায়নের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রটির ইচ্ছা অন্যরকম। ১৮৯৩ সালে হুগলি মহসিন কলেজ থেকে গণিত আর রসায়নে ডবল-অনার্স নিয়ে দুর্দান্ত ফল করে বিএ পাশ করার পর উপেন্দ্রনাথ পিতার ইচ্ছা আর নিজের ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন রসায়ন নিয়ে এবং মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিজ্ঞানে। প্রেসিডেন্সিতে

আলেকজান্ডার পেডলার আর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তালিমে চলল রসায়ন অধ্যয়ন। ১৮৯৪ সালে এমএ। ওদিকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯০০ সালে এমবি, ১৯০১ সালে এমডি। অসাধারণ ভালো ফল সব-কটি পরীক্ষাতে। ১৯০৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরতত্ত্বে পিএইচ-ডি। বিষয়, রক্তের লোহিতকণিকার ভাঙন - Studies in Haemolysis। প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে উচ্চাঙ্গের তাত্ত্বিক ও ফলিত রসায়ন আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক সমাপতন ঘটেছিল, যা পরে প্রতিফলিত ও সার্থক হয়েছিল তাঁর গবেষণার মধ্যে।

১৯০১ থেকে কিছুদিন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে প্যাথলজি আর মেটিরিয়া মেডিকা পড়ানোর পর কলকাতায় এসে যখন উপেন্দ্রনাথ শিয়ালদার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন, সেসময় শুধু ভারতেই লিশম্যানিয়াসিসে প্রতি বছর হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হচ্ছে। জানা গেল, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে এক ডাক্তার অ্যান্টিমনি ব্যবহার করে এ রোগে কিছু ফল পেয়েছেন। ১৯১৫ সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজের (পরে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের) প্যাথলজির অধ্যাপক লিওনার্ড রজার্স (১৮৬৮-১৯৬২) টার্টারিক অ্যাসিডের সঙ্গে পটাশিয়াম আর অ্যান্টিমনি মিশিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, যৌগটা কাজ করে বটে, কিন্তু এতই বিষাক্ত যে, জীবাণুর চেয়ে বেশি কাবু হয় মানুষ। রজার্স-এর ওই যৌগে পটাশিয়ামের বদলে সোডিয়াম ব্যবহার করে উপেন্দ্রনাথ দেখলেন, তাতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কিছুটা কমলেও, চিকিৎসার মেয়াদ বড়ো দীর্ঘ। নিজস্ব এক পদ্ধতিতে 'ধাতব অ্যান্টিমনিকে গুঁড়ো করে ক্লোরোফর্মে মিশিয়ে ... তৈরি হল কলয়ডাল অ্যান্টিমনি। এই কলয়ডাল অ্যান্টিমনির দ্রবণে ফর্ম্যালডিহাইড মিশিয়ে রোগীর দেহে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে ভালো ফল পাওয়া গেল।' ১৯১৬-য় লান্‌সেট-এ প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে তিনি জানালেন, তিনি একটি সুস্থায়ী কলয়েড তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন যাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পরখ করে দেখা যেতে পারে।

এরপর তাঁর নজর গেল অ্যান্টিমনির পঞ্চ-যোজী (পেন্টাভ্যালেন্ট) যৌগগুলির দিকে। কালাজ্বরে এই গোষ্ঠীরই একটি সোডিয়াম-লবণের কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ করে ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েশনের কাছে প্রতিবেদন পেশ করলেন উপেন্দ্রনাথ। অতঃপর এই লবণের নানান রকমফের নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখলেন এই যৌগটির ইউরিয়া লবণ কালাজ্বরে চমৎকার কাজ করে, এবং তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া অনেক কম। এই ইউরিয়া সংযোজনটিই উপেন্দ্রনাথের গবেষণার সবচেয়ে উজ্জ্বলতম মুহূর্ত। এরই নাম ইউরিয়া স্টিবামিন। এইটি সংশ্লেষ করে উপেন্দ্রনাথ তার বিবরণ প্রকাশ করলেন 'Kala-azar: Its treatment' শীর্ষক গবেষণা-পুস্তিকায়, সেটি পুনঃপ্রকাশিত হল ১৯২০ সালে। শুধু তাই নয়, ১৯২২-এই তিনি ওই ওষুধের ক্রিয়ায় কালাজ্বর থেকে সেরে-ওঠা রোগীদের দেহে এক বিশেষ ধরনের চর্মরোগের অস্তিত্ব ও চিকিৎসা নিয়েও পেপার লেখেন এবং অভিনন্দিত হন।

এসবই ঘটে গেছে ১৯২৩-এর আগে। সুতরাং সুকুমার রায়ের চিকিৎসকদের এসব তথ্য জানবার কথা। তাঁরা যে ইউরিয়া স্টিবামিনের খবর রাখতেন তার আরো একটি একটি পরোক্ষ প্রমাণ হল, সুকুমার রায়ের মৃত্যুর মাত্র দশদিন পর ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩-এ ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবের এক সভায় নীলরতন সরকার এ ওষুধের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, জার্মানরা তাদের ক্রুপ কামানের জন্য, কিংবা ফরাসিরা তাদের নৌবহরের জন্য যতখানি গর্ববোধ করে, উপেন্দ্রনাথ-আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামিনের জন্য বাঙালিদের ঠিক ততখানিই গর্ববোধ করা উচিত। যে-ওষুধ নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা হচ্ছে ২০ সেপ্টেম্বর, সেটা নিশ্চয়ই মাত্র দশদিন আগে তৈরি হয়নি; হয়েছিল তার কিছুকাল আগেই। প্রশ্ন হচ্ছে, চিকিৎসকরা কি সুকুমারের ওপর এই নতুন ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন?

বাস্তবে উপেন্দ্রনাথের তৈরি ওষুধ যখন আসামের চা-বাগানে হাজার হাজার শ্রমিকের প্রাণ বাঁচাচ্ছে, তখন কলকাতার সরকারি চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক অদ্ভুত বিরোধিতা-তথা-অনীহা লক্ষ্য করা গেল। কেউ লিখলেন, ইউরিয়া স্টিবামিন যৌগটি অস্থায়ী, তাকে সুস্থায়ী অবস্থাতে সংগ্রহ করাই সম্ভব না। ঘুরিয়ে বলা হল, উপেন্দ্রনাথ মিথ্যা দাবি করছেন। ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাক্তাররা এর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন। সেটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ লিওনার্ড রজার্স ছিলেন ট্রপিক্যালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি সারা জীবন উপেন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে গেছেন। অনেক পরে, ১৯৩৯ সালেও বিলেত থেকে প্রকাশিত ব্রিটিশ এনসাইক্লোপিডিয়া অব মেডিক্যাল প্র্যাকটিস-এ ভারতে কালাজ্বরের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রবন্ধে লিওনার্ড রজার্স এ ওষুধের ভূমিকার কোনো উল্লেখই করেননি। এমনকী উপেন্দ্রনাথ যাতে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হতে না-পারেন, তার জন্য নেচার পত্রিকায় কার্যত কুৎসা করেছিলেন। লড়াকু উপেন্দ্রনাথ অবশ্য প্রত্যেকটি অভিযোগের অকাট্য স-সাবুদ উত্তর দিতে কসুর করতেন না। কিন্তু তাতে ঔপনিবেশিক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের আসন টলেনি। তাঁরা, অন্তত বঙ্গদেশে তাঁদের একটা বড়ো অংশ, ইউরিয়া স্টিবামিন-বিরোধিতায় অটলই ছিলেন। সুকুমারের মৃত্যুর তিন বছর আগেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল ইউরিয়া স্টিবামিন। ক্যাম্বেল হাসপাতালে রোগীদের উপর তার প্রয়োগ চলছে, 'তার রিপোর্ট তিন বছর ধরে ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিক্যাল রিসার্চে বার হচ্ছে সাত খণ্ডে। ১৯২২

সালের অক্টোবরে ... আটটি রোগীর ক্ষেত্রে ইউরিয়া স্টিবামিন প্রয়োগে সাফল্যের রিপোর্ট লিখেছেন উপেন্দ্রনাথ'। তবু সুকুমার কেন পেলেন না এ ওষুধ? কুলি-মজুরদের অসুখ যে-ওষুধে সারে, ভদ্রলোকদের অসুখও কি সে-ওষুধে সারবে – এরকম কোনো বেয়াড়া দ্বিধা কি কাজ করেছিল কলকাতার বড়ো বড়ো হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে?

সুকুমার রায়ের চিকিৎসা করতেন তাঁরই মণ্ডা ক্লাবের সদস্য, নামকরা বিলেতফেরত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৭৮-১৯৫০)। তিনি মরণাপন্ন সুকুমারের ওপর সে-ওষুধ প্রয়োগ করলেন না, মোটের ওপর 'হাওয়া বদলে'র পাশ-কাটানো চিকিৎসা করেই ক্ষান্ত হলেন। হয়তো সরকারি হাসপাতালের প্রথম বাঙালি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হওয়ার দরুন কিছু বাধ্যবাধকতা তাঁর ছিল। সেই ঔপনিবেশিক যুগে সামান্য ঝুঁকি নিয়ে কর্তাদের অনুমোদন-বিহীন কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষিত ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা সরকারি হাসপাতালের একজন বাঙালি সুপারিন্টেন্ডেন্টের পক্ষে কি সম্ভব ছিল?

তাহলে সুকুমার রায়কে মারল কে? লিশম্যানিয়া জীবাণু? নাকি ঔপনিবেশিক সরকারের ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য?

সূত্রনির্দেশ

নারায়ণচন্দ্র চন্দ, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, লেখনী প্রকাশন, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৭৪

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ehrlich

https://en.wikipedia.org/wiki/Prontosil#:~:text=Prontosil%20is%20an%20antibacterial,because%20better%20options%20now%20exist.

কৃষ্ণা রায়, 'আলোকপ্রবাহে একটি জ্যোতিষ্কঃ স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী', Hooghly College 175, Hooghly Mohsin College 175th Anniversary Volume, 2011, পৃষ্ঠা ২০৭

ওই, ২০৮

Rajinder Singh, 'U N Brahmachari: Scientific Achievements and Nomination for the Nobel Prize and the Fellowship of the Royal Society of London', Indian Journal of History of Science, March 2019

স্বাতী ভট্টাচার্য, চক্রব্যূহে বৈজ্ঞানিক, মিত্র ও ঘোষ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২৭

Rajinder Singh

স্বাতী ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১৯

ছবি : মিতালি দে

করোনা কাল প্রসারিত হচ্ছে

মানস প্রতিম দাস

কোনো হিসেবেই মিলছে না। আবার কেউ হয়তো বলবেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম! আসলে যে যাই বলে থাকুন, ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকুন– সেগুলো ছিল একটা সম্ভাবনার আভাস মাত্র। তার কারণ, নতুন ভাইরাসের নাড়িনক্ষত্র জানতে যে এখনও ঢের দেরি তা নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন বিজ্ঞানীরা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁদের পার্থক্য অনেক। সরাসরি ল্যাবরেটরিতে বসে অণুজীবের চেহারা দর্শন করতে পারেন তাঁরা, চিহ্নিত করতে পারেন ভাইরাস-দেহে থাকা কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড রোগ বাঁধানোর কাজটা করে এবং সেই যৌগে কেমন পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে। এসব করার প্রশিক্ষণ বা আগ্রহ, কোনোটাই নেই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকা জন-জানি-জনার্দনের। জনসাধারণ এটুকু জেনেই তৃপ্ত যে ঠিক সময়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের চোখে, কানে তথ্য পৌঁছে দেবেন কোভিড ১৯ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের গতিবিধি সম্পর্কে। কিন্তু কী তথ্য দিতে পারেন বিজ্ঞানীরা? ল্যাবরেটরির বাইরের জগতে ভাইরাসের কেমন রূপ পরিবর্তন হবে, কতটা সংক্রামক বা প্রাণহানিকর হতে পারে সেই মিউটেশন তা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া কার্যত অসম্ভব। নতুন ঘাতকের জন্ম হলে এবং সেটা বেশ কিছুটা ছড়ালে তবে আসে শনাক্ত করার প্রসঙ্গ। আবার, মিউটেশন সম্পর্কে জানলেই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। মানুষের দেহে কেমনভাবে এই নতুন মিউটেশন কেমন প্রভাব ফেলবে তা দেখতে-বুঝতে সময় লাগে প্রচুর। ফলে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করা কারও আয়ত্তে নেই। জানানো যায় কেবল সম্ভাবনার কথা। আপাতত সেই সব বিজ্ঞানীদের কথা মিলছে যাঁরা ২০২১-কেও করোনা পর্বে অন্তর্ভুক্ত করে বার্তা দিয়ে রেখেছিলেন। একটু আশাবাদী হওয়া পেশাদারদের পিছু হঠতে হয়েছে। করোনা কাল হু হু করে প্রসারিত হচ্ছে। ঠিক কোন দফায় রয়েছে এই সম্প্রসারণ তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। গত বছরের হেমন্তে আমেরিকায় কোভিড ছড়ানোকে 'দ্বিতীয় দফা' আখ্যা দিয়ে রেখেছিলেন অনেকেই। ফলে 'দ্বিতীয়' আর হাতে নেই। ভারতেও দ্বিতীয় দফার উচ্চারণ কয়েকবার হয়েছে। তবু যদি কেউ জোরাজুরি করেন তাহলে মেনে নেওয়া যাক যে সেপ্টেম্বর নাগাদ ঢেউটা ছিল 'প্রথম' আর এটা 'দ্বিতীয়'।

তফাৎ যাও!

ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের যাত্রী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখেন প্ল্যাটফর্মে সাঁটা পোস্টার– সেখানে রেখায়-ছবিতে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা, হাত ধোয়ার পরামর্শ। পোস্টারের সংখ্যা বাড়লে বা ট্রেনের ভেতর সুমিষ্ট কণ্ঠে কোভিড সতর্কতার বার্তা বার বার উচ্চারিত হলেও নিত্যযাত্রীর করার কিছু নেই। তিনি নামতে পারেন না ট্রেন থেকে। কোনো মতে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে তাঁকে কাটাতে হবে নিত্যযাত্রার সময়টা। অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে আগের লকডাউনে। তিনি যে এখনও উপার্জনক্ষম তা পরম সৌভাগ্যের কিন্তু নিজের স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থে তাঁকে এই অবস্থাটা রক্ষা করতে হবে। কোভিডকে সঙ্গে নিয়ে তাই তাঁর নিত্য আসা-যাওয়া। সবাইকেই নিজের চাকরি রক্ষা করতে হয়। কোভিড সতর্কতা ছড়িয়ে দেওয়াও তো একরকম চাকরি। চলুক পাশাপাশি সবকিছু!

এদিকে বহু প্রতিষ্ঠান আবার আংশিক লকডাউনের পথে হাঁটার জন্য সুপারিশ করেছে প্রশাসনের কাছে। সম্পূর্ণ লকডাউনের পক্ষে হয়তো কেউই নেই এবার। তবে উৎসব হোক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন, যাবতীয় সমাবেশের উপর নিষেধ আরোপ করার আবেদন শোনা যাচ্ছে। ব্যক্তিগত উৎসব বহু দিন ধরেই পিছিয়ে দিচ্ছেন নাগরিকরা। ঠিক যখন মনে হল যে পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক, বিয়ে-অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কিছু মানুষকে হয়তো নিমন্ত্রণ করা যায় এবার, তখনই চেপে বসতে পারে নিষেধের ফাঁস। মানতেই হবে, নিজেদের স্বার্থে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অবশ্য কোনো বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করেন না। সামনে যদি মাইক্রোফোন থাকে তবে সে ভাষণ শোনাতে হবে মাঠ ভর্তি মানুষকে! এটাই রাজনীতির আসল কসরৎ আর তাই সেখানে জনসমাবেশ আবশ্যক, আপোষে রাজি নন কোনো দলের নেতা-নেত্রী। ফলে যা ঘটার তাই ঘটছে।

নির্বাচন হচ্ছে যে সব রাজ্যে সেখানে প্রাথমিকভাবে ঝুঁকি কম থাকলেও তা ক্রমশ বাড়ছে।

বৃদ্ধির লেখচিত্র

কীভাবে এল এবারের ঢেউ? কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে সেটা? কোন রাজ্য বেশি আক্রান্ত? সেলফোনে আটকে থাকা মানুষজনের কাছে সব তথ্যই হাজির হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ডে। সবাই যে দেখবেন তার কোনো মানে নেই। অনেকেই মনে করতে পারেন যে এত খুঁটিনাটি জেনে কী লাভ! তাতে কী নিজের সুরক্ষা বাড়বে? না, তা বাড়বে না। কিন্তু এই নিবন্ধের প্রয়োজনে সামগ্রিক পরিস্থিতিটা আর একবার বুঝে নেওয়া দরকার। গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দেখা দেওয়া কোভিড ঢেউয়ের তুলনায় এবারেরটা অনেক বিপজ্জনক। গত বছরের ওই সময়ে বত্রিশ দিন সময় লেগেছিল দেশে সংক্রামিতের সংখ্যা আঠেরো হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছোতে। এবার এই বৃদ্ধিটা ঘটে গিয়েছে ১১ মার্চ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে, মাত্র ষোলো দিনে। অর্থাৎ রোগ ছড়ানোর গতিটা দ্বিগুণ। জাতীয় গড়ের থেকে বরাবরের মতো এগিয়ে থেকেছে মহারাষ্ট্র - এগারো হাজার থেকে বাইশ হাজারে পৌঁছোতে গত বছর লেগেছিল একত্রিশ দিন আর এবারে মাত্র নয় দিন। গুজরাতেও সংখ্যাটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সংক্রামিতর সংখ্যা ন-শো থেকে দেড় হাজারে পৌঁছোতে প্রয়োজনীয় দিনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে অনেকটা – তিরিশ থেকে ছয়। মার্চের শেষে যা হিসাব ছিল তাতে দেশে মোট আক্রান্তের আশি শতাংশ রয়েছে পাঁচটা রাজ্যে – মহারাষ্ট্র, কেরালা, পঞ্জাব, কর্ণাটক ও ছত্তিশগড়। নির্বাচনে যুক্ত রয়েছে যেসব রাজ্য সেগুলো এই টপ ফাইভে ঢোকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নিশ্চিতভাবে। ফল জানা যাবে অবিলম্বে।

কোভিডের এই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে যে কেন এমনটা হল? বিশ্লেষকদের মন্তব্য, কড়া লকডাউনের থেকে যে সময় বেরোতে শুরু করে আমাদের দেশ সেই সময় থেকেই বাড়তে থাকে আক্রান্তের সংখ্যা। যত শিথিল হয় কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ততই গতি দেখা যায় এই ঊর্ধ্বগামিতায়। ফলে এখনকার এই ঢেউ হয়তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিপদ বাড়তে দেখে মহারাষ্ট্র, পঞ্জাবের মতো রাজ্য নতুন করে নিষেধ জারি করা শুরু করে মার্চ থেকেই। একইসঙ্গে মানুষের মনে সন্দেহ জাগছে নতুন স্ট্রেইন নিয়ে। আবারও একই কথা, জানলে যে আমরা নিজেদের সুরক্ষিত করে ফেলব তা নয়। তবে কোভিডের প্রসার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন বিজ্ঞানীরা। মার্চের শেষ অবধি কেন্দ্রের সরকার নতুন স্ট্রেইনের উপস্থিতির কারণে এই ঢেউ ঘটতে পারে বলে অন্তত জানায়নি। কিন্তু মার্চের শেষ দিনে মহারাষ্ট্রের পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে বিদর্ভ ও নাগপুরে নতুন ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনের প্রধান ইকবাল সিং চহল জানান, এই নতুন রূপ এতটাই দ্রুত ছড়ায় যে পরিবারের এক জনের শরীরে জায়গা পেলে চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অন্যান্য সদস্যদের শরীরে ঢুকে পড়তে পারে। এদিকে ফেব্রুয়ারি মাসের এগারো তারিখেই যুক্তরাজ্যের জেনেটিক সারভেলেন্স প্রোগ্রামের প্রধান শ্যারন পীকক জানান যে কেন্ট অঞ্চলে পাওয়া ভ্যারিয়েন্ট বিশ্বের প্রধান স্ট্রেইন হিসাবে দেখা দিতে পারে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডে প্রথম দেখা যায় এই ধরনটাকে। তারপর যুক্তরাজ্যের কোণায় কোণায় ভাইরাসের এই বৈচিত্র্য ছড়িয়ে পড়েছিল, সারা পৃথিবীতে ছড়ানোর অপেক্ষা করছিলেন সেখানকার বিজ্ঞানীরা।

এই প্রসঙ্গে ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যায়। কর্ণাটকের নামি ভাইরোলজিস্ট এবং সে রাজ্যে কোভিড শনাক্তকরণে নোডাল অফিসার ডাক্তার ভি রবি উল্লেখ করেছেন যে ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে বেশ কিছু ভুল ধারণা আছে। ভাইরাসের শরীরে মিউটেশন ঘটলে এবং সেই মিউটেশনে প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তন ঘটলে তবেই সেটাকে ভ্যারিয়েন্ট বলা যায়। কিন্তু এখানে আর একটা প্রয়োজনীয় পরিভাষা আছে – ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন। অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিবর্তনের ফলে যদি ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা লাভ করে তবেই সেটাকে ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন বলা যায়। সারা পৃথিবীতে এমন ধরনের ভ্যারিয়েন্ট যা পাওয়া যায় তা এসেছে ব্রেজিল, যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। মহারাষ্ট্রে যে ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে, যাকে 'ডবল মিউট্যান্ট'ও বলা হচ্ছে, সেটা ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন হতে পেরেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকারও বলে জানান তিনি। এদিকে শ্যানন পীকক আগেই জানিয়েছেন যে নভেল করোনা ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট খুঁজতে তাঁর দলের আরো দশ বছর লেগে থাকতে হবে। এর মানে অবশ্য এই নয় যে সেই দশ বছর ধরে কোভিড বিশ্বমারী টিঁকে থাকবে কিন্তু ভাইরাসের পরিবর্তনে নজরদারি থামালে মানব সভ্যতার ক্ষতি হতে পারে। তিনিও অবশ্য বলেছেন, ভ্যারিয়েন্ট প্রচুর তৈরি হলেও তার মধ্যে সামান্য শতাংশ প্রতিরক্ষা তন্ত্রকে ধোঁকা দিয়ে দ্রুত সংক্রমণ ঘটানোয় পারদর্শী। আগের টিকা দিয়ে নতুন ভ্যারিয়েন্ট ঠেকানো সম্ভব কিনা তা নিয়ে গোটা চিকিৎসা পরিষেবা জগৎ ধোঁয়াশায়। শ্যানন পীককের মতো মুখে সবাই বলছেন যে কিছু সুরক্ষা অবশ্যই মিলবে টিকায়। রোগের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকার আশ্বাসও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পরিসংখ্যানের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে সবসময় মিলবে তেমনটা নাও হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা গিয়েছে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি টিকা তরুণদের মধ্যে অতি

সামান্য সুরক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু এই আলোচনা বিস্তারে হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

টিকা টেকনিক

দ্বিতীয় ডোজ কত দিন পরে? এই নিয়ে কিছু ধন্দ তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কোভিশিল্ড নেওয়ার সময় চোদ্দো দিনের ব্যবধান রাখা হচ্ছিল দেশে, পরে সেটা বাড়িয়ে আঠাশ দিন করা হয়। পরে ফেব্রুয়ারি মাসের উনিশ তারিখে 'দ্য ল্যান্সেট' এক গবেষণাপত্রে জানায় যে ছয় সপ্তাহের কম ব্যবধানে কোভিশিল্ডের দুটো ডোজ দিলে কার্যকারিতা ৫৫.১ শতাংশ। সেখানে বারো সপ্তাহের ব্যবধানে রাখলে কার্যকারিতা ৮১.৩ শতাংশ। ১৭,১৭৮ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে করা সমীক্ষায় অক্সফোর্ড কোভিড ভ্যাকসিন ট্রায়াল গ্রুপ এই ফলাফল পেয়েছে বলে জানায়। যুক্তরাজ্য, ব্রেজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এই তথ্য সংগৃহীত হয়। ভারত অবশ্য চার সপ্তাহের ব্যবধান থেকে সরে আসেনি। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসকরা জানাচ্ছেন যে ভারতের জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবধান ঠিক করা হয়েছে। চার সপ্তাহের জায়গায় বারো সপ্তাহের ব্যবধান তৈরি করলে হয়তো টিকা গ্রহণকারী আর ফিরেই আসবেন না দ্বিতীয় ডোজ নিতে, এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্বাধীন গবেষকরা অবশ্য অনেকেই ভিন্ন মত দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, যুক্তরাজ্যের দেওয়া তথ্যপ্রমাণ নিয়ে যদি ভারত কোভিশিল্ড ব্যবহার শুরুই করল তাহলে ব্যবধান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতকে অস্বীকার করার মানে হয় না। অক্সফোর্ড/অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ফাইজার এবং মডার্নার তৈরি টিকার প্রত্যেকটার দুটো ডোজ প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম ডোজে প্রতিরক্ষাতন্ত্রের সক্রিয়তা তৈরি করা হয় এবং সেই সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা হয় দ্বিতীয় ডোজে। কোভ্যাক্সিনের যেহেতু তৃতীয় ফেজের ট্রায়াল চলছে এবং সব তথ্য জমা পড়েনি তাই ব্যবধান নিয়ে নতুন কোনো বক্তব্য তৈরি হয়নি।

এদিকে টিকা গ্রহণ নিয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনিচ্ছার সৃষ্টি হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষে বোলপুরে টিকা নেওয়ার পর মারা যান তারক চক্রবর্তী নামে একজন ভোটকর্মী। মার্চের শুরুতে ধূপগুড়িতে কোভিড টিকা নেওয়ার পর শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয় কৃষ্ণ দত্ত নামে চৌষট্টি বছরের এক ব্যবসায়ীর। এই সব ক্ষেত্রে কাগজে সামান্য দু-একটা লাইন লেখা হয় এবং তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বললেও পরে কোনো খবর ছাপা হয় না। টিকার সপক্ষে চিকিৎসকরা বক্তব্য রাখেন, টিকার নিরাপত্তা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই বলে সাফ রায় দেওয়া হয়। কিন্তু যার যায়, তার যায়। ভারতে টিকাকরণ শুরু হতে চলেছে যখন ঠিক সেই সময় নরওয়েতে টিকা গ্রহণের পরে তেইশ জনের মৃত্যুর খবর এসেছিল। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। জানুয়ারির মাঝামাঝি গুরগাঁওতে ছাপ্পান্ন বছর বয়সী স্বাস্থ্যকর্মী রাজবন্তীর মৃত্যু হয় টিকা নেওয়ার পর। এছাড়াও অন্যান্য রাজ্য থেকে টিকা নেওয়ার পরবর্তী সময়ে অল্প কিছু মৃত্যুর খবর এসেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে টিকাকে 'নির্দোষ' বলে দাবি করা হয়েছে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে। কিন্তু এতে মানুষের মন থেকে আশঙ্কা উবে যায় না। মৃত্যুর কথা যদি বাদও দেওয়া যায় তাহলে যে সব বিরূপ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যাচ্ছে এবং বহু ক্ষেত্রে সচক্ষে দেখা যাচ্ছে তাতে টিকা নিয়ে আশঙ্কা চট করে দূর হবে কিনা তা বলা কঠিন। ফেব্রুয়ারির বারো তারিখে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন বলে যে আমেরিকার কুড়ি শতাংশ মানুষ একেবারেই টিকা নিতে চান না। একত্রিশ শতাংশ মানুষ অপেক্ষা করে দেখতে চান যে অবস্থা কোন দিকে গড়াচ্ছে। যুক্তরাজ্যেও একটা অংশ টিকা নিতে অনীহা দেখিয়েছেন। এঁদের প্রতি আবেদন রেখেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী। এদিকে গণমাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করছেন যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া অতি সামান্য হয় এবং সেটা প্রতিরক্ষা তন্ত্রের লড়াই করার সাক্ষ্য দেয়। সোশ্যাল মিডিয়াতে ভেসে বেড়াচ্ছে ভিডিয়ো যেখানে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রচারিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই সব বক্তব্যের ফারাক দেখা দিলে সাধারণ মানুষ কীভাবে নেবেন সেটা তাঁদের উপরই নির্ভর করবে।

কবে যাবে? আবার আসবে?

গাণিতিক মডেলিংয়ের উপর ভিত্তি করে রোগের প্রসারকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে সেই সব মডেল ভালো ফল দেয়। গত সেপ্টেম্বরে আক্রান্তদের সংখ্যা শীর্ষে পৌঁছোনোর সময় এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন আইআইটি কানপুরের মণীন্দ্র আগরওয়াল। পয়লা এপ্রিল সংবাদ সংস্থাকে তিনি জানান যে এই দফায় প্রত্যেক দিনে সংক্রমণের সংখ্যা আশি থেকে নব্বই হাজার মতো হবে চরম অবস্থায়। দশ থেকে পনেরো শতাংশ এদিক-ওদিক হতে পারে সংখ্যাটা। তবে পরিস্থিতি এই চরম অবস্থায় পৌঁছোতে দেখা যাবে এপ্রিলের পনেরো থেকে কুড়ি তারিখের মধ্যে। তারপর খুব দ্রুত হ্রাস ঘটবে সংক্রমণে। খুব স্বাভাবিক যে অনেক বিশেষজ্ঞ এই মত মানবেন না। অতএব অপেক্ষা বাস্তবের সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে দেখার।

বলা বাহুল্য যে এটাই শেষ দফা নয়। পরের দফার চরিত্র নিয়ে জল্পনা হোক। তবে মণীন্দ্র আগ্রওয়ালের দৃঢ় বিশ্বাস, উপযুক্ত সুরক্ষা বিধি মানতে পারলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে কোভিড পরিস্থিতি। বেলাগাম হলে বিপদ।

অন্তরিনের মুক্তগদ্য

স্বপন ভট্টাচার্য

পিরামিড

ছাত্রাবস্থায় ওয়েস্টার্ন আমেরিকান ছবি দেখতে আমরা লাইন দিতাম নিউ এম্পায়ার, গ্লোব, লাইট হাউস, এলিটে। টেক্সাসের একটা ধুলো ওড়া জনপদে একটা লোক, বাদামি ঘোড়ার সওয়ার সে, কোমরে গোঁজা পিস্তল, ঘোড়া বেঁধে ঢুকে পড়ল ওয়াইল্ড ওয়েস্টের সেই একটিমাত্র খোলা পানশালা কাম ইন-এ। সেখানে বেশ জুয়ো খেলে, মদ খেয়ে, ইন মালিকের মেয়ের সঙ্গে সস্তা রসিকতা করে দিন কাটে সে গ্রামের কাউবয়দের। বেপাড়ার হিরো দেখে তারা কোমরে হাত দিয়ে পিস্তল পরখ করার আগেই- র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট...। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা যায় হিরো ফুঁ দিয়ে পিস্তল ঠান্ডা করছে আর সব ক-টা নেহাত ছা-পোষা মাস্তান মরে পড়ে আছে। হলিউডি ওয়েস্টার্নের পার্শ্বচরিত্র এরা, যাদের নাম কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেস করেনি। হল থেকে বেরিয়ে ঠোঁটে সস্তা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে হিরো সেজে নিজামের রোল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর যখন ভেবেছি এই যে লোকগুলো, কেউ বিশ-পঁচিশ, কেউ বুড়ো-আধবুড়ো, তাদেরও তো শিশুকাল ছিল, মা-বাপও ছিল এককালে, কৈশোর- যৌবন ছিল- মানে নিদেনপক্ষে গড়ে ৩০×৩৬৫=১০৯৫০ দিন তো তারা বেঁচে বর্তেই ছিল। জীবন ধারণ যাকে বলে। তা সেই জীবন একটা লোকের ভয় বা হুইম বা ইচ্ছা বা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দৌলতে এক মুহূর্তে, একটা ফুৎকারে নিভে গেল – আমরা কোনোদিন জানতেও চাইলাম না তার নাম গোত্র পরিচয়। পার্শ্বচরিত্র সে। আজ এ কথা এ-জন্যে বলছি না যে করোনাভাইরাস আমাদের ইন্-এ ঢুকে পড়ে আমাদের সম্পূর্ণ হতচকিত করে পটা পট শুইয়ে দিচ্ছে। না সে জন্য নয়। বলছি এই কারণে যে গোটা মানবসমাজ- হিউম্যানকাইন্ড যাকে বলে- তার ইতিহাস রচিতই হয়েছে এই নাম না জানা পার্শ্বচরিত্রদের জীবনের বিনিময়ে। মানুষ যখন থেকে দু-পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে তখন থেকেই সে মুলত ঠগবাজ। ছলে বলে কৌশলে দখলদারি তার একমাত্র লক্ষ্য তখন থেকেই। তার জন্য মানুষ চিরকাল মানুষকেই বলি দিয়ে এসেছে। নাম দিয়েছে স্যাক্রিফাইস। মিশরীয় বা ইনকার সভ্যতার জন্য যে বলি হয়েছে আর যে নাৎসি সৈন্য লেনিনগ্রাদের ঠান্ডায় জমে মরে গেছে, যে আমেরিকান সৈন্য ভিয়েতনামে, ইরাকে, আফগানিস্তানে দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এক একটি আচম্বিত বুলেটের আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে তারা সকলেই আসলে নামহীন, পরিচয়হীন পার্শ্বচরিত্র, রাজার বা রাষ্ট্রের অপরিসীম লোভ আর পাশবিকতার শিকার হয়ে যাদের বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর বয়সের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম বাৎসল্য মুহূর্তের বুলেটে সওয়ার হয়ে বাতাসে উড়ে গেছে। গন উইথ দ্য উইন্ড।

মানুষের ইতিহাসকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে গেলে-একটা কথাই মনে বাজে আমার- ম্যান ইজ এ ফেইলড এক্সপেরিমেন্ট অফ ইভোলিউশন- মানুষ হল বিবর্তনের একটা অসফল পরীক্ষা। পৃথিবীর প্রতিটা দেশে মানুষে মানুষে অসাম্য ক্রমবর্ধমান। শতাংশের হিসেবে আসবে না এমন কিছু লোকের হাতে বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদ। গোটা বিশ্বকে যদি একটিমাত্র রাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা করি তাহলে গড়পড়তা মোটিভেশনটাই হল সম্পদশালী হওয়া, আরো ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যই হল আরো ধনবান হওয়া। এটা সম্ভব হয় ওই পার্শ্বচরিত্রদের দুটো চরিত্রলক্ষণের জন্য, এক- তাদের অন্তর্গত ইনস্যাটিএবল ডিজায়ার ফর গ্র্যাটিফিকেশন, অর্থাৎ লড়ে পাবার থেকে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার প্রতি তার অপরিসীম আকর্ষণ আর, দুই- তার অন্তর্গত প্রভুপ্রিয়তা। শাসিত হবার বাসনা তার চিরকালীন। ফলে সে মরে যেতে যেতেও একজন হিরো খোঁজে যে তাকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারত। বিবর্তনের ইতিহাস বলে এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অপরিমেয় ক্ষুধায় যে ডাইনোসররা এক একদিনে এক একটা জঙ্গল সাবাড় করে দিত প্রায়, তারাও আজ ফসিল। এইসব 'অ্যাকিলিস হিল'-গুলি প্রকৃতি মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যর থেকে মানুষ যুদ্ধাস্ত্রে খরচ করবে বেশি, শিক্ষার থেকে বিনোদনে খরচ করবে বেশি, সব থেকে অসংবেদনশীল দেশটাকে মডেল বিবেচনা করবে, সব থেকে

অমানবিক লোককে সব থেকে বড়ো রাষ্ট্রনায়ক বানাবে অথচ প্রকৃতি একটা সামান্য পরীক্ষা নিলে বলবে– এটা ঠিক হয়নি ম্যাডাম, আমাদের প্রিপারেশন ছিল না। প্রতিদিন তৈরি হওয়া ক্ষুধা, বেরোজগার, চালচুলোহীন অবস্থার মাশুল আপাতভাবে মনে হতে পারে দিতে হচ্ছে কেবল পার্শ্বচরিত্রকে, কিন্তু আসলে ভেঙে পড়ছে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অসম পিরামিড। পড়বেই। আজ না হলে কাল।

এই মৃত্যু উপত্যকা

বিশ বছর বয়সী মা। পরিযায়ী। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে মৃত। পড়ে আছে মুজফফরপুর স্টেশনে। বাচ্চাটার বয়স মাত্র দুই। মায়ের কপট ঘুম সে শিশু তো খেলা বলেই জানে। চাদরখানা টেনে মায়ের মুখ খুলে দিতে পারলেই সে জানে ওই মুখে ফুটে উঠবে হাসি। দু-হাত বাড়িয়ে মা বলে উঠবে– এই যে আমি!' কার কর্ম? কার ফল? কার ঈশ্বর? মুজফফরপুরে তাঁর কোনো ঘরবাড়ি নেই? রেলের চাকায়, লরির চাকায় খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে যে দেশ, তার জন্য আত্মনির্ভরশীলতার ওষুধ খুঁজতে হবে কেন? মাথায় যাদের বিশ কিলোর বস্তা, কোলে হাঁটতে না শেখা শিশু, পরোয়া নেই রেলপথ, সড়কপথ, পরোয়া নেই পথের রুটি বা জল, পরোয়া নেই অসুখ- অতিমারি, পরোয়া নেই মাথার উপরে বৈশাখ আর পায়ের নিচে গলে যাওয়া পিচ অথবা দুটি সমান্তরাল অগ্নিশলাকার মত শুয়ে থাকা রেললাইন, পরোয়া নেই দূরত্বের, পরোয়া নেই সংখ্যার-যে সংখ্যা লেখে মাইলফলক, তাদের আপনি আর কতটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে বলছেন মহারাজ? যে দূরত্ব ওরা কাজ হারিয়ে, নিঃস্ব অবস্থায়, স্রেফ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছে চল্লিশ প্লাস তাপমাত্রার দিনে তা করতে ইয়োরোপে আমেরিকায় স্পনসর লাগে। এরা আপনার কাছে ফুটো কড়িও প্রত্যাশা করেনি। শুধুমাত্র পা-টুকু সম্বল। লক্ষ লক্ষ-র মধ্যে দু, আড়াই, তিনশো-র যাত্রা মাঝপথে থেমে যাবে তা এরাও জানে- পেরিফেরাল ড্যামেজ, তবু হাঁটা থামলো তাদের? বাসি রুটি আর ফোসকা পড়া পায়ের দিব্যি, আত্মনির্ভরশীলতার এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ সারা বিশ্বে আপনি আর কোথাও পাবেন না মহারাজ।

পায়ে হেঁটে শত শত মাইল অতিক্রম করে বাড়ি ফিরতে চাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের দল রাতটুকু কাটাবে বলে সবচেয়ে নিরাপদ ও অচঞ্চল জায়গা ভেবেছিল রেললাইন। ভোরের মালবাহী ট্রেন- নেই কুয়াশা, বাতাসও অমলিন, আলো ফুটে যাওয়া ঊষাকাল- তবু দেখতেই পেলো না সারি সারি হা-ক্লান্ত মানুষ শুয়ে আছে রেলপথে! তাদের পনের-বিশজনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে চলে গেল ভোরের রেলগাড়ি। পঁচিশে বৈশাখের সকাল নিয়ে এলো এই সংবাদ, মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ থেকে। বুদ্ধপুর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে আকাশ। কে বলবে, ঠিক আগের রাতে মরে গেছে এতগুলো ঘুমন্ত মানুষ? কার দায়, কে দোষী তা ঠিক হল না -শুধু ক্ষতিপূরণের নামে টাকার থলি ঝনঝনালো আর একবার! লকডাউন অবস্থার মধ্যে এতগুলো সুস্থ মানুষের সম্পূর্ণ অকারণ এবং অ্যাভয়েডেবল প্রাণহানি পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি। এ আমার ব্যতিক্রমী দেশ আর এ আমার হৃদয়ের সকাল। মৃত্যু উপত্যকায় অবিরত শুনতে পাচ্ছি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। গলা ছেড়ে উচ্চারণ করছেন:

> 'মানুষ ছিল নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো
> পথের হদিশ পথই জানে, মতের কথা মত্ত
> মানুষ বড় সস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলেই পারতো'।

রামলালা

অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য গত এক বছর ধরে দশরথ ও তাঁর তিন রানী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির তত্ত্বাবধানে নিজেদের প্রস্তুত করেছেন। বাসনা একটি পুত্রলাভের নাহলে যে বংশ থাকে না। বশিষ্ঠমুনির নির্দেশে বানানো হয়েছে নতুন যজ্ঞগৃহ।

অশ্ব মেধের জন্য যে স্যাক্রিফাইসিয়াল চেম্বার বা বলিদানকক্ষ বানানো হয়েছে তার গঠনশৈলী গরুড়সদৃশ। বহুমূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে এক বছর আগে থেকেই চলে এসেছেন মিথিলার রাজা জনক, দশরথের শ্বশুর কাশীর রাজা, মগধের রাজা, কোশলের রাজা ভানুমন্ত এবং আরো হাজারো অনুগত রাজন্যবৃন্দ। মূল যজ্ঞগৃহের আশেপাশে চলতে থাকলো নানা খুচরো অনুষ্ঠান। নাচ গান, থিয়েটারও বাদ গেল না। বলি দেবার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল অগনিত গবাদি পশু এবং অবশ্যই পূণ্যবান সেই ঘোড়াটি। বলি দেবার পর দশরথের তিন পত্নীই সেটিকে স্বর্ণশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন। প্রথা মেনে রানী কৌশল্যা মৃত অশ্বের সঙ্গে একটি গোটা রাত অতিবাহিত করলেন। রাজা যজমান। তিনি এরপর তাঁর রাজ্য, তাঁর সমস্ত ধনরাজি, রাজ্যের সমস্ত গরু মোষ, সবকিছু ব্রাহ্মণদের নিবেদন করলেন। ঋষ্যশৃঙ্গসহ অন্য ঋত্বিকেরা অতঃপর দেবতাদের নজর কাড়ার জন্য বলির অশ্বটিকে যত্ন করে রান্না করে ফেললেন। প্রথমে হোমে দেওয়া হল তার চর্বি এবং তারপরে ষোলজন ঋত্বিক একে একে ষোলখণ্ড দেহাংশ নিবেদন করল ঘৃতাগ্নিতে। ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন- রাজা, দেবতারা আপনার দানধ্যান রান্নাবান্নায় খুশি। আপনি চারটি পুত্রের জনক হতে চলেছেন। এর পরের অনুষ্ঠান পুত্রকামেষ্ঠি যজ্ঞ। দেবতারা ততক্ষণে সব জড়ো হয়েছেন আকাশে। ইন্দ্র আগেই এসে গিয়েছিলেন। দূর থেকে দেখলেন ব্রহ্মাও এসেছেন। তাঁকে সচরাচর পাবলিক প্লেসে পাওয়া যায় না। আজ পেয়েছেন। বললেন- স্যর, আর যে পারা যাচ্ছে না! ব্রহ্মা হেসে বললেন- কেন, কী হল? ইন্দ্র জানালেন- লঙ্কাধিপতি

রাক্ষসকূলগুরু দশানন রাবনের বাড়াবাড়ি আর সহ্য হয় না! শিব তাকে অবধ্য করেছেন বর দিয়ে, আর আপনিও তাকে কী কী যেন দিয়েছেন, যার ফলে সে স্বর্গকে ধরা জ্ঞান করছে এবং মুনি-ঋষিদের, ঋষিকুমারদের মায় গ্রহ-নক্ষত্রেরও জীবন অতিষ্ঠ করে ছাড়ছে। একটা বিহিত করুন স্যার!

ব্রহ্মা মুচকি হেসে বললেন- সে যে বর চেয়েছিল তা পেয়েছে। দেব - গন্ধর্ব - রাক্ষসের হাতে তার মৃত্যু নেই। মানুষকে সে ধর্তব্যের মধ্যে আনে নি। আর সেখানেই আছে তার পতনের সংকেত। বিষ্ণুর অবতার মানুষ তাকে ধ্বংস করবে।

ইন্দ্র হয়তো একই সঙ্গে স্বস্তি পেয়েছিলেন এবং অবাক হয়েছিলেন। মনে মনে হয়তো প্রশ্ন করেছিলেন - এই যে যিনি জন্ম নিচ্ছেন তিনি কি তাহলে শেষ পর্যন্ত মানুষ? অবতার টবতার হলেও- রামলালা- বাল্মিকী তাঁকে শেষ পর্যন্ত মানুষ করেই তো গড়তে চেয়েছিলেন, স্যার?

ছবি : মিতালি দে

অর্ধশতকের ওপার থেকে দেখা মুক্তিযুদ্ধ ও কলকাতা

স্বাগতম দাস

আর্মি ক্যাম্পে বন্দি থাকার সময় আয়েশাকে গড়ে দৈনিক কতজন ধর্ষণ করতো? মনে রাখতে পারেনি সে, যৌনদাসী হয়ে থাকার সেই দিনগুলিতে জনা তিনেকের অত্যাচারের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে দুর্বল সেই ষোড়শীকে কৃপা করে, আল্লাহ-পাক কেড়ে নিতেন তার চেতনা! সেই ধর্ষকদের মধ্যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী খানসেনারাই থাকতো না, থাকতো বিহারি দালাল ও গুন্ডারাও, যাদের মগজে পরিব্যাপ্ত শুধু অহৈতুকী ঘৃণা - বাঙালিদের প্রতি, বাংলাভাষী একটা গোটা জাতের প্রতি। বছর আষ্টেকের খাইরুল চোখের সামনে তার পুরো পরিবারের মৃত্যু দেখেছিলো, যখন কলকাতার দিকে পালাবার পথে কচুরিপানার ঘন ঝোপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃতপ্রায় বসে থাকার পরেও, খালার কোলের শিশুটির কান্নার জেরে কিছু খানসেনা তাদের ধরে ফেললো। খাইরুল নিজের দুই দিদি, মা ও খালার ওপর একপাল বুনো হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়া দু-পেয়ে জন্তুদের দেখতে দেখতে, একসময় জ্ঞান হারিয়েছিল। জ্ঞান ফেরার পর, প্রাণে বেঁচে গেলেও, সে আর জীবনে কোনোদিন ঘুমাতে পারেনি। এরকম সংখ্যার অতীত আয়েশা, খাইরুল, মুস্তাক, কেষ্ট, অসিত, জাহানারাদের অব্যক্ত হাহাকার ব্যাপ্ত করে দিয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান নামের দেশটার সমস্ত আকাশ, আজ থেকে ঠিক বছর পঞ্চাশেক আগে। সেই দেশ, যার সাথে আমাদের একই জল - একই পানির যোগ, একই ভাষার নাড়ির টান। উনিশশো সত্তরের সেই অদ্ভুত দশক, এপার বাংলার কিছু দামাল তরুণের চোখে যার হয়ে ওঠার কথা ছিল "মুক্তির দশক", পরিণত হয়েছিল ওপার বাংলাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নির্মমতম গণহত্যার দশকে। জীবনানন্দের সেই কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত, কিশোরের পায়ে দলা মুথা ঘাস, ধানসিড়ি, কীর্তিপাশা, জলসিড়ি, চিতলমারী, হরিমগুপ, মনসামগুপ, ঝালকাঠি, ভাটিয়ালি গান, চৈত্র মাসে শিবের গাজন, পিঠে পোঁতা গাছের গল্প, মঘিয়ার বারুণী স্নান - সব কিছু উদ্বেলিত করে বয়ে চলেছিল নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির রক্তনদী।

১৯৭১ সালে ভারত সরকারের সক্রিয় যোগদানে যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ, তার নেপথ্যে থাকা নরমেধ যজ্ঞ - আয়োজনে ও উপাচারে হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসি জার্মানি-র ইহুদি-নিধন যজ্ঞের সাথে তুলনীয়। ১৯৩৯ থেকে পরবর্তী ৫ বছর ধরে ঘটে চলা সেই হলোকস্ট-এ নাৎসি-বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ৬০ লক্ষ অনার্য রক্তের ইহুদি। অন্যদিকে ১৯৭১-এর ২৫-শে মার্চ-এ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের সমর্থনে ঘটে চলা গণবিদ্রোহ দমন করতে পশ্চিম পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার ঘোষণা করেছিল কুখ্যাত অপারেশন সার্চলাইট। এর পরবর্তী মাত্র ৯ মাসে, পশ্চিম পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের মদতে ত্রিশ লক্ষের বেশি সিভিলিয়ান বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল, ধর্ষিতা হয়েছিলেন কম করে পাঁচ লক্ষ বাঙালি নারী। কিছুদিন আগে সিরিয়া থেকে যেমন আইসিস-এর ভয়ে সন্ত্রস্ত মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, তেমনি ১৯৭১-এ দেশভাগের ২৪ বছর পরে আরো একবার ছিন্নমূল, হতভাগ্য বাঙালি শরণার্থীদের স্রোত আছড়ে পড়েছিল ভারতে, এবং বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। শেষপর্যন্ত ডিসেম্বর-এ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন জানিয়ে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পুরোদস্তুর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো পাকিস্তানের সাথে - হ্যাঁ, আমেরিকা এবং চীনের কোনোরকম সমর্থন ছাড়াই এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসককুলের প্রতি এই দুটি শক্তিধর দেশের আপাত-সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও। ১৬ই ডিসেম্বর, ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা-র কাছে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রধান জেনারেল নিয়াজী-র আত্মসমর্পনের মধ্যে দিয়ে শেষ হল মুক্তিযুদ্ধ। ২০২১ - বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধের অর্ধশতক। এই বছরের বাংলা নববর্ষের অবসরে, ওপার-বাংলার মুক্তিযুদ্ধে তাই এপার-বাংলার সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার ভূমিকাটা একবার খতিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে, ঢাকা থেকে মাত্র ৪০ মিনিটের বিমানদূরত্বে থাকা আমাদের এই শহরটার জড়িয়ে যাওয়া বোধহয় অনিবার্য ছিল। সেই যুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের দপ্তর ছিল ৮নং থিয়েটার রোডের (বর্তমান শেকস্পীয়ার সরণি-র) একটি বাড়ি। আজকের মতো সেইযুগেও শিরদাঁড়া না বিকোনো বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখকরা ছিলেন মৌলবাদী শাসকদের শিরঃপীড়ার একটি প্রধান কারণ। ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে রাজাকারদের বানানো লিস্ট ধরে ধরে যখন অধ্যাপক, লেখক, শিল্পীদের মেরে ফেলা শুরু হয়েছে, তখন তাঁদের অনেকেই পালিয়ে আসছিলেন কলকাতায় - আর পেয়ে যাচ্ছিলেন এপারের বাঙালি সতীর্থদের অবারিত আশ্রয়। বহুক্ষেত্রে কলকাতার স্কুল-কলেজের ছাত্র শিক্ষকরা মিলে চাঁদা তুলে তাঁদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন। যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' নামে একটি সংগঠন। পরবর্তীতে, এই সংগঠনটির দেখানো পথেই ভারতের অন্যান্য প্রান্তে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্যে গড়ে ওঠে আরো কিছু সংগঠন। এগুলোর মধ্যে ছিল বাংলাদেশ এইড কমিটি (বোম্বে), ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ, বোম্বে ইউনিভার্সিটি কমিটি, বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি (পুনা) ইত্যাদি।

১৯৭১-সালেই ঢাকা আর চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে আসা শিল্পী ও টেকনিশিয়ান-দের একটি দল শুরু করলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে চালু থাকা এই বেতারকেন্দ্র থেকেই সম্প্রচারিত হত– "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি" বা "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা"-র মতো গান যা মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের রক্তস্রোতকে স্তিমিত হতে দিতো না। এই শহর দেখেছে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে উদ্যত এইসব গানের শিল্পীদের মধ্যে কীভাবে মুছে যেত ধর্মের মেরুকরণ– কীভাবে কথা বসাতেন গোবিন্দ হালদার, সুর দিতেন সমর দাস আর সেই সুর গলায় তুলে নিতেন আপেল মাহমুদ-এর মতো শিল্পী। এই শহর দেখেছে, কীভাবে একটি চায়ের দোকানে বসে, আড্ডার মধ্যেই কখন ওপার-বাংলার শুদ্ধতম এক আবেগকে ভাষায় ধরে ফেলছেন এপারের অপ্রতিদ্বন্দী গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার আর লিখে ফেলছেন সেই কালজয়ী গান - "শোনো, একটি মুজিবরের থেকে/লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি/ আকাশে বাতাসে ওঠে রণি/বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ"।

সেই উত্তাল সময়টাতে, কলকাতার অকুতোভয় অনেক সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধের খবর সারা পৃথিবীকে জানানোর স্বার্থে, মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করেই পৌঁছে যেতেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্তরেও। এঁদের মধ্যে অন্যতম কালান্তর পত্রিকার সাংবাদিক শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী পরবর্তীকালে তাঁর অভিজ্ঞতা ধরে রেখেছিলেন "একাত্তরের রাতদিন: বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ডায়েরি" বইটিতে। তেমনি আবার খবরের খোঁজে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হয়নি অমৃতবাজার পত্রিকার দুই শিক্ষানবীশ সাংবাদিক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরজিত ঘোষের - কুমিল্লায় ধরা পড়ার পর পাকিস্তানী খানসেনারা এঁদের হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর অনুপুঙ্খ প্রচারের ব্যাপারে অন্যতম ছিলেন তৎকালীন আকাশবাণী কলকাতার প্রখ্যাত বেতার সাংবাদিক ও প্রযোজক শ্রী উপেন তরফদার। জানি-না আজ দুই বাংলার কতজন তরুণ সাংবাদিক, সরাসরি ফিল্ড ওয়ার্কের ভিত্তিতে লিখিত ওঁর "একাত্তরের উত্তাল দিনগুলি" বইটির খবর রাখেন।

পণ্ডিত রবিশঙ্করকে কলকাতার বাঙালি বলা সত্যের অপলাপ কারণ সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে ছিল ওঁর কর্মক্ষেত্র এবং অগণিত ভক্ত। বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ১৯৭১-এর ১লা অগাস্ট নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে দুপুর ২.৩০ এবং রাত ৮টা অনুষ্ঠিত হল "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" - মূলত পণ্ডিতজি ও তাঁর অন্যতম বন্ধু, বিটলসের জর্জ হ্যারিসন-এর উদ্যোগে। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তখনকার আমেরিকা-র কিংবদন্তি শিল্পীরা - বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন থেকে রিংগো স্টার, বিলি প্রেস্টন - কাকে ছেড়ে কার নাম বলা যায়! এতে যে শুধু বাংলাদেশের জন্যে আড়াই লক্ষ মার্কিন ডলার সংগৃহিত হয়েছিল তাই নয়, উপরন্তু অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বার্তা এবং কয়েক কোটি বাঙালির নাছোড় লড়াই-এর খবর পশ্চিমা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তৈরি হচ্ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত।

১৯৪৭ থেকেই গঙ্গা ও পদ্মার মাঝখানে কাঁটাতারের গণ্ডিটাকে আপোষহীনভাবে অগ্রাহ্য করে আসা ঋত্বিক - মহাপরিচালক শ্রীযুক্ত ঋত্বিক কুমার ঘটক, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বানিয়ে ফেললেন একটি বিশেষ তথ্যচিত্র 'দুর্বার গতি পদ্মা'। ধরতে চাইলেন সেই ১৯৪৮-এ শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর সংগ্রামের বিস্তীর্ণ পরিধিকে সেলুলয়েডের ওপর। এছাড়াও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সাথে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ত্রাণ ও সহায়তা জোগাড়ের কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, মান্না দে-র মতো প্রথিতযশা শিল্পীরা।

আরেকজন, যাঁর অনুল্লেখে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতিতে কলকাতার ভূমিকা অবশ্যই থেকে যাবে অসমাপ্ত, তিনি ড. দিলীপ কুমার মহলানবীশ। আজ তিনি অশীতিপর, তবু সুস্থ এবং সল্টলেক অঞ্চলের বাসিন্দা। ১৯৭১-এর কলকাতার উপকণ্ঠে, যশোরে রোডের দু-ধারে, বনগাঁতে ছড়িয়ে থাকা উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে

তখন ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী কলেরা। পেশায় শিশুচিকিৎসক ড. মহলানবীশ কলকাতার জন্স হপকিন্স ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর মেডিকেল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং -এর তরফে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে এবং শরণার্থী শিবিরগুলিতেও অক্লান্ত শরীরে সামাল দিচ্ছেন একের পর এক কলেরা আক্রান্ত শিশুদের। সেইসব শিবিরের মেঝে থৈ থৈ করতো রোগাক্রান্তদের পুরীষ ও বমিতে। জন্স হপকিন্স সেন্টারের সাহেব ডাক্তার-রা নাকে রুমাল চেপে ওঁর ওপরেই সব দায়িত্ব দিয়ে শিবিরের বাইরে থেকেই বিদায় নিতেন। চিকিৎসা বলতে একমাত্র কলেরা টক্সিনের প্রভাবে রক্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়া জল ও লবণ ফেরাতে ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন - যার চ্যানেল করতে শিশুদের ক্ষেত্রে ভীষণ বেগ পেতে হতো এবং হাতে চ্যানেলের ক্ষত বিষিয়ে উঠেও ঝরে যেত বহু কচি প্রাণ। এরকম একটা সময়, পশ্চিমা চিকিৎসকদের সন্দেহ এবং বিধিনিষেধ অবজ্ঞা করেই ওরাল রি-হাইড্রেশান সল্ট বা ওআরএস-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু করেছিলেন ড. মহলানবীশ ও তাঁর সহযোগী কিছু চিকিৎসক। গ্লুকোজ এবং সাধারণ নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড নির্দিষ্ট একটি অনুপাতে জলে মিশিয়ে খাওয়ালে যে রক্তে পুনরায় লবণ ও জলের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যায় এবং বাঁচানো যায় প্রাণ, সেটাই কোনো বিধিবদ্ধ ক্লিনিকাল ট্রায়াল ছাড়া, হাতে কলমে, বাংলাদেশি চিকিৎসক রফিকুল ইসলামের সাথে করে দেখিয়েছিলেন দিলীপ মহলানবীশ। জীবন বাঁচিয়েছিলেন ওপার বাংলার কয়েক লক্ষ শিশু ও বয়স্ক মানুষের। বহুবছর পরে, চিকিৎসা জগতের অবিসংবাদী জার্নাল ল্যানসেট ড. মহলানবীশ ও তাঁর সহযোগীদের এইভাবে ওআরএস প্রয়োগ করে কলেরা-র মতো রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা প্রণালীটিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ঊনবিংশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে বর্ণনা করে। ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেটে ওআরএস কী ভারত, কী বাংলাদেশের ঘরে ঘরে দেখা গেলেও এর অন্যতম প্রবর্তক থেকে গেছেন দুই বাংলার বর্তমান প্রজন্মের অগোচরেই।

অর্ধশতক পরেও, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে এপার-বাংলার ভূমিকা সেইভাবে পশ্চিমবঙ্গে আলোচিত নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "পূর্ব পশ্চিম" উপন্যাসটি ছাড়া আর কোনো জনপ্রিয় সাহিত্যকর্মে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকাটি সুপাঠ্য ভাবে বিস্তার লাভ করেছে বলে মনে করতে পারছিনা। ১৯৭১-এর পরে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে নানা টানাপোড়েনের সৃষ্টি, সীমান্তের ওপারে বাড়তে থাকা ইসলামী মৌলবাদের প্রভাব সম্ভবত একাত্তরের সেই বিশুদ্ধ বাঙালিয়ানার আবেগকে অনেকটাই ঢেকে ফেলেছে।

জানি না ইতিহাসের আবর্তন পৌনঃপুনিক কিনা। তবে কখনো কখনো কিন্তু খুব সরাসরি ভাবেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উনিশশো আঠেরোর স্প্যানিশ ফ্লু-এর স্মৃতি বয়ে যেমন হাজির হয় বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী, দ্বিতীয় ঢেউতে নিজের সংক্রমণ ক্ষমতা কয়েকগুন বাড়িয়ে নিয়েও। তেমনি ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি কি আরো একবার নানান বিভাজনের বিপদরেখা দেখতে পাচ্ছে? পরিস্থিতি কোনোভাবেই পঞ্চাশ বছর আগের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটটির সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু বাঙালি তো ঘরপোড়া গরু প্রায় আক্ষরিক অর্থেই। তাই আরো নানাভাবে খণ্ডিত হতে থাকার সিঁদুরে মেঘটি তার ভয়ের সাথেই দেখা উচিত। পড়তে পারা উচিত ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি - বাংলাদেশি (অনুপ্রবেশকারী অর্থে)/ভারতীয়, হিন্দু/মুসলিম, নারী/পুরুষ, ব্রাহ্মণ/শূদ্র - এরকম নানা মেরুকরণের অন্তরালে। দিনবদলের স্বপ্ন দেখিয়ে দলবদল করতে থাকা যে রাজনীতির কারবারি-রা মূলধন করে নিচ্ছে এইসব ভয়কে - তাদের রুখে দেওয়াটাই তাই আপাতত মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছরে, আমাদের নববর্ষের অন্যতম শপথ হয়ে উঠতে পারে।

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র: অপরিচয়ের পরিসর

সুমন ভট্টাচার্য

অপরিচয়ের আদিকথা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য– বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখক। বিজ্ঞান-গবেষক। বিজ্ঞান-পত্রিকা জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর সম্পাদক। এই তিন পরিচয় নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। যদিও ১৯৭৭-এ প্রশ্ন ওঠে, যিনি ন্যূনতম স্নাতক উপাধির অধিকারী নন, তিনি একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা, বিশেষত বাংলা ভাষায় মুখ্য প্রতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান-পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন কিনা! এবং শেষ পর্যন্ত অপসারিতও হন সেই পদ থেকে। সুতরাং বিতর্ক ছিলই একটা। বিজ্ঞান-গবেষক– এই পরিচয় নিয়েও বিতর্ক ছিল, কারণ "কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ" তাঁর গবেষণা কর্মকে আখ্যাত করতে চেয়েছেন বিবরণমূলক বলেই! কেবলমাত্র বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধকার– এই পরিচয়কে অস্বীকার করতে পারেননি কেউ।

ব্যক্তি গোপালচন্দ্র এই সমস্ত বিষয়ে খুব একটা বিচলিত হতেন না। উত্তরও দিতেন না এই জাতীয় কথার। ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৮১ শেষ সাত বছর ফিমার-বোন-এ আঘাত পেয়ে পরিপূর্ণ শয্যাবন্দি অবস্থাতেও অনলস ছিলেন সম্পাদনার দায়িত্ব পালনে। বিভিন্ন সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানপত্রিকা পাঠ ও তার থেকে প্রয়োজনীয় অংশ চিহ্নিত করে রাখবার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন অন্তত ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত, যতদিন দৃষ্টিশক্তির প্রায় পূর্ণ-বিলোপ না ঘটেছে। দিনে-দিনে শুধু বদলেছে আতসকাচ–অধিকতর বা অধিকতম শক্তির আতসকাচ নিয়ে কাগজের উপর তাঁর চেষ্টা ছিল তাকে পাঠ করবার জন্য। সেই অক্ষর জয়ের যুদ্ধে যে তিনি পরাজিতই – তার করুণরস বোঝা যেত, যখন শেষ পর্যন্ত কাউকে ডাক দিতেন, তা পড়ে শোনানোর জন্য।

আর যাবতীয় সম্মাননা পেয়েছেন এই সময়েই। সত্যেন্দ্রনাথ বসু রৌপ্যপদক। রবীন্দ্র পুরস্কার। জগদীশচন্দ্র বসু পদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ সায়েন্স্ উপাধি। তিনি নির্বিকার সৌজন্যে সনমস্কার গ্রহণ করেছেন – রেখে দিয়েছেন পার্শ্ববর্তী জনের কাছে। এ-বিষয়ে কোনো কথাও বলতেন না। যেমন - তাঁর জন্মসাল জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন যে তা আর মনে নেই। তাঁর পুত্রদের কেউ একজন বলেন : ১৮৯৫। সেই বর্ষটিই গৃহীত হয়।

এখন থেকেই অপরিচয়পর্বের সূচনা। বস্তুত তাঁর জন্মসাল: ১৮৯৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে, তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষার শংসাপত্রে এবং আইন-পাঠক্রমে তাঁর ভর্তির যে নথিকরণ - সেখানে ১৮৯৮ই আছে।[১] একটি অতিসংক্ষিপ্ত স্মৃতি-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর, মনে পড়ে । কিন্তু সেই সময় তাঁর স্মরণশক্তি ঈষৎ ক্ষীণ – সুতরাং তথ্য ঠিক থাকলেও সাল তারিখ অযথাযথ। এবং নিজের বিষয়ে যথারীতি প্রায় নীরব। খুবই দুঃখের বিষয়, তাঁর জীবনী-লেখকদের অধিকাংশই, সেই প্রতারক স্মৃতি চালিত পুস্তিকাকেই প্রামাণ্য ধরে নিয়ে, উত্তমপুরুষকে প্রথম পুরুষে রূপান্তরিত করে নিষ্পন্ন করেছেন সেই দায়িত্ব!

হ্যাঁ, লোনসিংহ গ্রামের নিকটস্থ ইস্কুলে যখন শিক্ষকের জীবিকায়, তখন যে হাতে লেখা পত্রিকা 'শতদল' করছেন, তার তথ্য পাওয়া অসম্ভব। তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় মানুষজনের উপর তথাকথিত উচ্চবর্ণীয় আর উচ্চবর্গীয় লোকজনের অত্যাচারের প্রতিবিধান-বাসনায় যে 'কমল-কুটির' সংস্থা তৈরি করেছিলেন, তার হদিশ পাওয়া দূরস্থান - সে বিষয়ে স্মৃতিচারণারও কেউ নেই - সেখানে তাঁর কথাই ভরসা। আবার যে কবিগানের দল খুলেছিলেন, যার অস্তিত্ব টিঁকেছিল, এবং তার খবরও পেতেন অর্ধনিয়মিত, সেখানে তাঁরা যে আসর-সূচনায় উল্লেখ করেন গুরু গোপাল ভট্ট-কে, তা-ও যাচাই করা অসম্ভব না হলেও কঠিন। কিন্তু অপরাপর তথ্য? বিশেষত ১৯১৮ সাল থেকে তাঁর কলকাতায় বসবাসকাল থেকে উত্তর জীবনের সংবাদ বা তথ্য পাওয়া তো কঠিন ছিল না! বিশেষত, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে যিনি - আইএসসি নয়, আইএ - ইন্টারমিডিয়েট অব্ আর্টস্-ও পড়তে পারেননি, আর্থিক কারণে, কাণ্ডজ্ঞান তো বলে, তাঁর বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখারও অধিকার নেই! তিনি কেমন করে বিজ্ঞানী হলেন, তার সহজ মীমাংসা - তাঁর প্রবন্ধ পড়ে

জগদীশচন্দ্র বসু তাঁকে ডাকলেন, আর অলৌকিক বাজিকরের জাদুদণ্ডের স্পর্শে তিনি বিজ্ঞানী হলেন! এই বিষয়টি লেখা হয়েছে, হয় এইভাবেই। কারণ গোপালচন্দ্র মনে পড়েতে লিখেছিলেন ওইটুকুই – যে জগদীশচন্দ্র তাঁকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দিতে বলেন। এবং তাঁর গবেষণার সূচনা সেই সময় থেকেই। প্রকৃতপক্ষে গোপালচন্দ্র কৃষিগবেষণা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন এবং বিভিন্ন দেশি গবেষণা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবার চেষ্টা করছেন ১৯১৭ থেকেই। এবং নিজের প্রয়াসকে প্রবন্ধের আকারে প্রথম বিন্যস্ত করেন - ১৯১৯-এ কাজের লোক পত্রিকায়।[২]

আত্মপ্রস্তুতির অনুশীলন

গোপালচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৯২)-র কাছে শ্রুত, 'কমলকুটির' সংস্থাটির পরিচালনা ও কর্মকাণ্ডের সক্রিয়তার জন্য - ইস্কুলের শিক্ষকতা রক্ষা সংকটজনক হতে থাকে উত্তরোত্তর। এই সময় একটি যোগাযোগ হয় র‍্যালি ব্রাদার্স-এর সঙ্গে। তিনি এদের কাশীপুর-অফিসে টেলিফোন-ক্লার্ক-এর জীবিকায় যুক্ত হন। টেলিফোন অপারেটর নয়। এবং এই সময়েই তাঁর শহরবাসের ইতিকথা-য় আরম্ভ হয় একাধিক সমান্তরাল জীবন বা জীবনযাপন ও জীবনাদর্শ পালন।

কেমন ছিল তাঁর কলকাতার দিনযাপন? অফিসের কর্মপ্রহরের অন্তে চলে যেতেন তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে। এবং হয়তো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এও। আগ্রাসী ক্ষুধায় পাঠ করছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা। কলকাতায় এসে যোগাযোগ করেছেন কাজের লোক পত্রিকার সঙ্গে। ফরিদপুরে বসবাস কালেই এই পত্রিকায় পাঠাতেন-পাঠিয়েছেন কিছু সংবাদমূলক পত্র। পত্নী লাবণ্যপ্রভা দেবীর নামে। ১৯১৪ থেকেই কাজের লোক-এর পত্র-বিভাগে বেশ কিছু পত্র প্রকাশিত হয়েছে "লাবণ্যপ্রভা দেবী, ফরিদপুর"-এই প্রেরকনামে। কলকাতায় আসবার পর এই পত্রিকায় লিখছেন নিয়মিত। কিছুকালের মধ্যেই হয়ে ওঠেন সহকারী সম্পাদক।[৩]

আর্থিক দুরাবস্থা বড়ো প্রত্যক্ষ দায়। পিতৃহীন পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র। বিবাহিত। ১৯১৭-য় প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে। আরো তিন ভাই এবং মাতৃদেবী আছেন লোনসিংহ গ্রামের বাড়িতে। সুতরাং প্রয়োজন উদ্বৃত্ত আয়। খুললেন একটি খেলনার দোকান - "গৃহস্থ-সমবায়"। প্রথম সহযোগী - বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট কৃতী প্রয়াত নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের পিতা।

কিছুকাল পরে তাঁর সহকারী হন অনুজ পঙ্কজবিহারী। কিন্তু এই ব্যবসায় লাভালাভ কেমন তা আর জানবার উপায় নেই আজ। তাঁর উদ্ভাবন-প্রবণ মস্তিষ্ক একদা ভ্রাতার আরোগ্যসাধনে বের করেছিল একটি ভেষজ। যেহেতু তিনি ডাক্তার নন, সুতরাং তিনি বুঝিয়েছিলেন যে ঔষধটি তিনি পেয়েছেন দৈবাদেশে। আর তারই প্রমাণ দিতে লিখে ফেলেছেন : আপদনাশিনীর ব্রতকথা।

কলকাতায় এসে ছাপাখানার জগতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর, আরেকটু কুশলি প্রয়াসে প্রকাশ করলেন : শ্রীশ্রী আপদনাশিনীর ব্রতকথা । এই পুস্তিকাটির বিক্রি ছিল ভালো এবং বিভিন্ন গৃহে তাঁর রচনানিবদ্ধ নির্দেশিকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এর পাঠ ছিল আবশ্যক। উত্তর কলকাতার বহু পরিবারে এবং গোপালচন্দ্রের নিজ পরিবারেও এই গ্রন্থ পঠিত হয়েছে অন্তত আটের দশকের অন্তপর্যায়েও। নিজগৃহে তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর সজ্ঞান জীবিতাবস্থা, ২০০৭ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে তাঁর নিয়ত পরিবর্তিত ঠিকানাগুলি : বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রিট, টালা। বরদা বসাক লেন বরানগর। কুটিঘাট লেন, বরানগর এবং শেষত খেলাতবাবু লেন, টালা।

"গৃহস্থ-সমবায়"

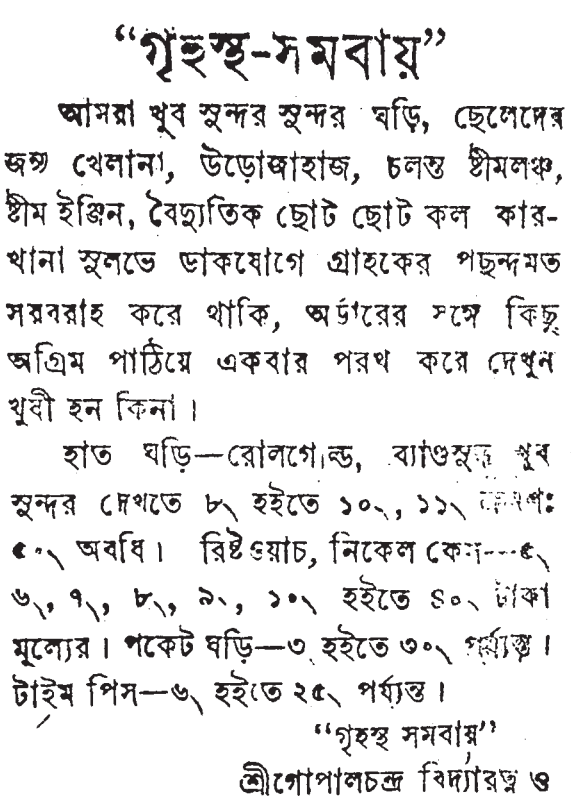

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর ঘড়ি, ছেলেদের জন্য খেলানা, উড়োজাহাজ, চলন্ত ষ্টীমলঞ্চ, ষ্টীম ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক ছোট ছোট কল কারখানা সুলভে ডাকযোগে গ্রাহকের পছন্দমত সরবরাহ করে থাকি, অর্ডারের সঙ্গে কিছু অগ্রিম পাঠিয়ে একবার পরখ করে দেখুন খুসী হন কিনা।

হাত ঘড়ি—রোলগোল্ড, ব্যাণ্ডসুদ্ধ খুব সুন্দর দেখতে ৮৲ হইতে ১০৲, ১১৲ [illegible] ৫০৲ অবধি। রিষ্টওয়াচ, নিকেল কেস—৫৲, ৬৲, ৭৲, ৮৲, ৯৲, ১০৲ হইতে ৪০৲ টাকা মূল্যের। পকেট ঘড়ি—৩৲ হইতে ৩০৲ পর্য্যন্ত। টাইম পিস—৬৲ হইতে ২৫৲ পর্য্যন্ত।

"গৃহস্থ সমবায়"
শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও
শ্রীপঙ্কজবিহারী ভট্টাচার্য্য,
ম্যানেজিং ডিরেক্টারস্,
১৪, বনমালী চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, টালা, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে এক-খানা বই পাঠানো হয়।

ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার "শতদল"
১৪ নং বনমালী চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, টালা,
কলিকাতা।

আর্থিক সমস্যা হয়তো কিয়ৎ পরিমাণে সংকটযুক্ত - ওই পর্বে এই সময়ে যিনি অধিকতর মনোযোগী হতে পারছেন পাঠে এবং চর্চায়। এই পর্বে তাঁর বহুশাখ অধ্যয়নের প্রকাশ কিছুটা দেখা যায় কাজের লোক পত্রিকারই পৃষ্ঠায়। হয়তো সমসাময়িক অপরাপর পত্রেও লিখেছেন। কিন্তু তা এখনো এই পাঠকের অপঠিতই।

অনুশীলনের পরিসর

গোপালচন্দ্রের এই পর্বের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে আছে বিপ্লবী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুবই বিখ্যাত বিপ্লবের সন্ধানে বই-তে। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> এমন সময় জীবন-ও [জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়] জেল থেকে মুক্ত হয়ে এল, টালায় তার মামার বাড়িতে উঠলো। ওদিকে মামার দেশের (নড়িয়া, ফরিদপুর) লোক গোপাল ভট্টাচার্য ... কলকাতায় এসে ঐখানেই উঠেছেন, ভাগ্য অন্বেষণে।... জীবনের মারফত আলাপ হল। নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে বেশ ভাল লাগল...। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার দিকে তাঁর ছিল অসাধারণ ঝোঁক এবং গ্রামে থেকেই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সংক্রান্ত পুঁথিপত্রের সাহায্যে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বেশ একজন ছোটখাট বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ। (বিপ্লবের সন্ধানে, পৃষ্ঠা. ৬৩)

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ব্যবসা করতে আগ্রহী শুনে :

> তিনি বললেন, যদি ঘড়ি মেরামতের দোকান করেন, আমি সকালে-বিকেলে গিয়ে বসতে পারি। আমিও কাজ করব, আপনিও শিখে নিতেও পারেন। (পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩)

এর স্বল্পকাল পরেই গোপালচন্দ্র সংযুক্ত হন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। ফলে ঘড়ির দোকান পর্ব শেষ। কিন্তু এঁদের বিপ্লব-পন্থার সঙ্গে তাঁর সংযোগ যে বিচ্ছিন্ন হয়নি, তার পরিচয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পরে যখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, একমাত্র ফোর্ট উইলিয়মের ওয়্যারলেস টেলিগ্রাম সচল, তখন:

> গেলাম গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে, ফোর্ট উইলিয়ামের ওয়্যারলেসের পাওয়ারের খবর জানেন কিনা। তিনি বললেন, গেলেই জেনে আসা যায়... আমরা অর্থাৎ বোস ইনস্টিটিউটের লোকেরা ফোর্ট দেখতে চাইলে ওরা অনুমতি দেবে। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৮৮)

তবে টেলিগ্রাফ চালু হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত যেতে হয়নি। এরপর আবার :

> গেলুম বোস ইনস্টিটিউটে গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে, আমাকে বোমা তৈরির মতো explosive-এর শিক্ষা দিতে হবে। .... বললেন "সতীশবাবু ভালো কেমিস্ট, তাঁর সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমিয়ে নেন, আমি সুযোগ বুঝে কথা পেড়ে ওঁকে বলে দেবো।" (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৮৯)

এবং এই পর্বের পরেও :

> একদিন তিনি বললেন,, "ওসব জিনিস অনেকেই জানে, একটা জিনিস ওর চেয়ে অনেক বেশি সাংঘাতিক, সেটা আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি, করতে পারলে একটা নতুন এবং বড় ব্যাপার হয়। আমি অমুকের সঙ্গে আলাপ করেছি ... তিনি ভয় পান ... আমি বলেছি, পুলিশ যতদূরই আসুক, এইখান পর্যন্ত আইব না।..."
>
> এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনপাতা টাইপ করা (TNT) ট্রাইনাইট্রোটলুয়েনের ফরমুলা তৈরির পদ্ধতি, precaution প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে লেখা কাগজ সংগ্রহ করে...গেলুম। (পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৮৯)

বিপ্লবের সন্ধানে বইতেও গোপালচন্দ্রের কথা আর একবারই আছে। গোপালচন্দ্র প্রদর্শিত পদ্ধতিতে – একটি বোমা পড়ে গৌরীবাড়ি অঞ্চলে। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে, গোপালচন্দ্র, তখন গৌরীবাড়ির বাসিন্দা, তিনি সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান সযত্নে।

কিন্তু গোপালচন্দ্রের সক্রিয় সংযোগ ছিল বিপ্লবী গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অংশুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়-এর নেতৃত্ব চালিত এই গোষ্ঠীর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে ১৯২২ থেকে। এই পত্রিকার সপ্তম

সংখ্যায় (৭ কার্তিক, ১৩২৯) প্রকাশ পায় শিক্ষার কথা বিভাগে "শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য"-র কয়েকটি টুকরো প্রবন্ধ, বিজ্ঞান সংবাদ। প্রথম বর্ষ পর্বেই, ১৩২৯ বা ১৯২২-এই এই পত্রিকা সম্মুখীন হয় রাজরোষের। ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারে তার আর হদিশ ছিল না। এই পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন পরবর্তী কালের মন্ত্রী বিজয় সিং নাহার। ১৯৯২-তে তাঁর কাছে ও-বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সম্পূর্ণ গুপ্তসমিতির শৃঙ্খলায় পত্রিকা চলতো। বিজ্ঞাপনও ছিল সাংকেতিক এবং সংকেতও ক্রমাগতই বদলাতো। ফলে পুলিশ বিভাগ এই কাগজের সব কপিই কিনে ফেলতো। কেবলমাত্র পত্রিকা ঘনিষ্ঠরা ছাপাবার সময়েই লুকিয়ে যে-টুকু বাইরে আনতে পারতেন।

তাঁর কাছে গোপালচন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, গোপালবাবু দপ্তরে আসতেন কালে ভদ্রে। লেখাপত্র নিয়মিত পাঠাতেন কখনো প্রুফ সংশোধন ও ছাপাছাপির দায়িত্বও নিয়েছেন। তাঁকে তিনি দু-একবারের বেশি দেখেছেন বলেও মনে নেই তাঁর। তবে তিনি আধুনিক অস্ত্রনির্মাণ, সহজে অস্ত্র তৈরি এই সমস্ত বিষয়ে জানতেন।

যথার্থত, ১৯৩২ এ যখন সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গশ্রী প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে, সেখানে এ-বিষয়ে খুবই ভারসাম্য শানিত কৌশলী সংবাদ নিবন্ধ লিখেছেন গোপালচন্দ্র।

এই ভূমিকার বিষয়ে গোপালচন্দ্র নিজমুখে একটি কথাও বলেননি কোথাও। তাঁর বিজ্ঞানী সুলভ মন্ত্রগুপ্তিধর্ম সক্রিয় ছিল বরাবর।

গোপালচন্দ্র গল্প লিখেছেন। কবিতাও। আর বিপ্লবের বিষয়ে যে আগ্রহী ছিলেন তার একটি পরিচয়, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে ছিল, প্রয়াত পত্নী লাবণ্যপ্রভা দেবীর একটি ফোটোগ্রাফ এবং ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি-র খবরের কাগজে বা সাময়িকীতে প্রকাশিত ছবির কর্তিকা। পরে মিলিয়ে দেখা গেছে সে ছবি প্রকাশিত হয়েছিল কুমুদিনী বসু সম্পাদিত সুপ্রভাত-এ। অর্থাৎ সেই ১৯০৮ থেকে, ১৯৮১- বারংবার বাড়ি বদল, চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আঁকড়ে ছিলেন ওরকম কিছু কাগজপত্র!

তথ্যসূত্র

১. গোপালচন্দ্রের জন্মসাল ১৮৯৫ হ'লে তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়াটা একটু অসঙ্গত। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ও বারোমাস পত্রিকার সম্পাদক অশোক সেন, এ-বিষয়ে সচেতন করেন। তারই বশবর্তী হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড সেকশনে সন্ধান করলে ম্যাট্রিক-এর নথি এবং আই-এ-র রেজিস্ট্রেশন-এর নথিতে জন্মসাল ১৮৯৮ দেখি। এই সূত্রে অশোক সেন-এর উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানাই।

২. এ-বিষয়ে বিস্মৃত তথ্য আছে এই পাঠকের, 'সম্পাদক গোপালচন্দ্রের প্রথম পর্ব : সংযোগের প্রকরণ' প্রবন্ধে। বারোমাস, এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা।

৩. কাজের লোক বিষয়ে আলোচনা আছে - এই পাঠকের 'কাজের লোক পত্রিকা সময়ের সমভূমি', যুবমানস, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ সংখ্যায়।

'ঢাকা সারস্বত সমাজ'-এই প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং একটি সংক্ষিপ্ত অভিসন্দর্ভের জন্য গোপালচন্দ্র পেয়েছিলেন "বিদ্যারত্ন" উপাধি। এই তথ্যটি জানান তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীরচন্দ্র এবং দ্বিতীয়পুত্র অধ্যাপক বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য (১৯২৬-২০১১)। নিরুপাধিক গোপালচন্দ্র দীর্ঘকাল এই "বিদ্যারত্ন" উপাধি লিখেছেন। Bose Institute Transactions-এও তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র Gopalchandra Vidyaratna-নামেই প্রকাশিত।

ভারতপথিক নির্মলকুমার বসু– নৃতাত্ত্বিক ও মানব প্রেমিক

সৃজা মণ্ডল

নৃতত্ত্ব আক্ষরিক অর্থে মানব বিজ্ঞান। কিন্তু নৃতত্ত্বের নির্যাস নিহিত আছে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায়– যা একজন মানুষকে সত্যিকারের নৃবিজ্ঞানী করে তোলে। ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় শিখিয়েছিলেন মানুষকে ভালোবাসো, প্রত্যেক মানুষের বিশিষ্টতা ও মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা করো। এই শিক্ষাকে যে মানুষটি জীবনের ধ্রুবতারা করেছেন, তিনি নির্মলকুমার বসু– নৃবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক, গান্ধী সচিব।

২২ জানুয়ারি। ১৯০১ সাল। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে গোপীমোহন দত্ত লেনে নির্মলকুমার বসুর জন্ম। বাবা বিমানবিহারী বসু পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। প্রাদেশিক সরকারের চিকিৎসা বিভাগের সিভিল সার্জেন। কর্মসূত্রে তিনি প্রায়ই স্থানান্তরিত হতেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায়। ফলে নির্মলকুমারেরও পড়াশোনা নানা স্কুলে। প্রথমে পাটনার ইঙ্গ-সংস্কৃত স্কুলে ১৯০৬-১৯১১, তারপর কামারহাটির সাগর দত্ত অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯১১-১২, রাঁচি জেলা স্কুলে ১৯১২-১৯১৬ এবং পুরী জেলা স্কুলে ১৯১৬-১৭। ১৯১৭-তে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং জেলা স্কলারশিপ পান। ভর্তি হন কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে আইএসসি পড়ার জন্য। ১৯১৯-এ আইএসসি পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্বে অনার্স নিয়ে বিএসসি-তে ভর্তি হন। পেলেন ফার্স্ট ক্লাস। ১৯২২ সালে ভর্তি হলেন এমএসসি-তে। সে সময় গান্ধীজির ডাক অসহযোগ আন্দোলনের। তরুণ নির্মলকুমার নিজেকে সামিল করলেন সেই আন্দলেনে। ওই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা ফিরে আসছিলেন ভারতে। সিএফ এন্দ্রুজের নেতৃত্বে সেই শ্রমিকদের পুনরুদ্ধার শিবিরের ব্যবস্থা করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করলেন নির্মলকুমার। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ স্তিমিত হতেই নির্মলকুমার আবার মনোযোগী হলেন পড়াশোনায়। মন্দির স্থাপত্য নিয়ে চর্চা শুরু করলেন পুরীতে।

নির্মলকুমার গভীর অভিনিবেশে লক্ষ করেছিলেন যে এদেশের মানুষদের মন্দির দর্শনের যত আগ্রহ, মন্দির সম্বন্ধে জানার উৎসাহ অনেক কম। দর্শনার্থীরা মন্দিরে আসে, পুজো দিয়ে ফিরে যায়। নির্মলকুমার দর্শনার্থীদের পুরীর মন্দিরে বসিয়েই মন্দিরের ইতিহাস ও স্থাপত্য সম্বন্ধে সরল ভাষায় তথ্য পরিবেশনে তাঁদের অভিভূত করে দিতেন। সেই রকমই একদিন পুরীর মন্দিরে এসেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তরুণ বাঙালি ছেলেটির সাবলীল বক্তৃতা তাঁকে মুগ্ধ করে।

সাল ১৯২৩। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সস্নেহ পরামর্শে নির্মলকুমার স্নাতকোত্তর স্তরে নৃতত্ত্ব বিভাগে আবার পড়াশোনা আরম্ভ করেন। ১৯২৫-এ এমএসসি পাশ করলেন। শুধু উত্তীর্ণ নয়, সে বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ, এমএসসি-র সমস্ত কৃতী পরীক্ষার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন নির্মলকুমার। তাঁর এমএসসি-র গবেষণার বিষয় ছিল 'ভারতের বসন্ত উৎসব'। এই ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। 'A Short Account of Holi Festival' নামে Journal of the Anthropological Society of Bombay (1924-1927, 13(2), pp. 203-208) পত্রে। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ।

বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় জনজাতির মধ্যে হোলি উৎসবের প্রকৃতি এবং অঞ্চল ভেদে তাদের বৈসাদৃশ্য ওই প্রবন্ধে আলোচিত হয়। সর্বভারতীয় এই জাতীয় উৎসব দীর্ঘ প্রবহমান কালের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা জাতির সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়েছে। তিনি মার্কিন পরিব্যাপ্তিবাদীদের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে এই বিশ্লেষণ করেন। এছাড়াও বৈদিক ও অবৈদিক জনগোষ্ঠীর ভাবধারা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক পর্যালোচনা এই প্রবন্ধটিকে ঋদ্ধ করেছে। ১৯২৭ সালের 'Man in India' জার্নালের সপ্তম বর্ষের ২-৩ সংখ্যায় 'The Spring Festival of India' শিরোনামে প্রবন্ধটি বর্ধিত রূপে প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ যা দেশ-বিদেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাঁর প্রথম কাজ এইভাবে সমাদৃত হওয়ায় উৎসাহিত নির্মলকুমার বসু ১৯২৯ সালে 'Cultural Anthropology'

গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শিক্ষাজগতে তাঁর খ্যাতির সূচনা হল এই গ্রন্থে উল্লিখিত 'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যা থেকে। বিশিষ্ট আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ এ এল ক্রোয়েবার ও ক্লাইড ক্লুকহোন 'Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions' গ্রন্থে নির্মলকুমার বসু-র বইটির উল্লেখ করেন। 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞায় নির্মলকুমার বসু বলেছেন, এর (সংস্কৃতির) প্রধান সম্পর্ক হল মানবিক আচরণের স্ফটিকোজ্জল রূপের সঙ্গে, যা এক ব্যক্তি থেকে অন্যে সঞ্চারিত হতে পারে। উজ্জ্বল স্ফটিক সদৃশ কোনো বিশেষ সম্পদকে বোঝাতে 'সংস্কৃতি' শব্দটি নৃতত্ত্বে ব্যবহৃত হয়।

সাংস্কৃতিক-নৃতত্ত্ব সম্পর্কে নির্মলকুমারের উৎসাহ ছিল অনেক বেশি। নৃতত্ত্ব বিভাগ তাঁকে গবেষণার জন্য একটি 'ফেলোশিপ' প্রদান করে। তিনি ওড়িশার পার্বত্য অঞ্চলে জুয়াং উপজাতিদের মধ্যে ক্ষেত্র গবেষণার কাজ করেন। আদিবাসী জীবনচর্যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের ব্যাপারে, শরৎচন্দ্র রায়ের সাহচর্য ও পথনির্দেশ তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। জুয়াংদের সম্পর্কে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানার উদ্দেশ্যে তিনি অরণ্যবাসী জুয়াং পল্লিতে কিছুকাল বসবাস করেন; ফলে তাঁদের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতাকে এত অনুপুঙ্খভাবে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। এই মানুষগুলোও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। তাদের গ্রামের মুখিয়া শীঘ্র তাদের ভাষা আয়ত্ত হোক এমন প্রার্থনা করে পূজাঅর্চনার আয়োজন করে। এভাবে, নির্মলকুমার হয়ে ওঠেন তাদের একজন। অধ্যাপক বসুর কাজের একটা অভিনবত্ব ছিল– তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলির সঙ্গে জনজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতির মিল-অমিল খুঁজতেন ও সেগুলির যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করতেন। যেমন, জুয়াংদের মধ্যে তিনি অদ্ভুত একটি প্রথা দেখতে পেলেন। জুয়াংরা বছরে একটি ব্রত পালন করত, যাতে তারা কোনো এক পুণ্যবান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটি পাতার ওপর কিছু ফল অর্ঘ্য হিসেবে রেখে দিত। এই আচারের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর এই অরণ্যাঞ্চলে ভ্রমণের ঘটনা যুক্ত আছে বলে অধ্যাপক বসু মনে করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, ওড়িশার তৎকালের দুর্বিনীত জুয়াং অধ্যুষিত অরণ্যপথে মহাপ্রভুর চলার সময় উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং সেই দেখা-জানা প্রাথমিক পর্যায়ে সুখের না হলেও চৈতন্যদেবের প্রেম ভাব ও বিনীত আচরণ তাদের আপন করে নেয়। ইতিহাসের সেই ঘটনা স্মরণ করে জুয়াংরা নাম ভুলে যাওয়া কোনো এক পুণ্যাত্মার উদ্দেশে আজও ফল নিবেদন করে থাকে। জুয়াংদের ওপর সংগৃহীত তাঁর তথ্যপূর্ণ তিনটি প্রবন্ধ ১৯২৮-১৯৩০ সালের মধ্যে 'Man in India' জার্নালে প্রকাশিত হয়। এগুলি তাঁর জনজাতি জীবনকেন্দ্রিক ক্ষেত্রানুসন্ধানের প্রাথমিক ফসল।

১৯৩০। ২৯ বছর বয়সি নির্মলকুমার যোগ দিলেন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। বোলপুরের কাছে এক হরিজন বস্তিতে খাদি সংঘ গড়ে তোলেন। আশপাশের নিম্নবর্গের মানুষদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করলেন। সাল ১৯৩১। লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার জন্য জেলে যেতে হল তাঁকে। তৃতীয় শ্রেণির বন্দি। প্রথমে সিউড়ি জেল, তারপর দমদম সেন্ট্রাল জেল। এই কারাবাসের সময়ই তিনি মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে ভাববার ও লেখবার সুযোগ পান। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় 'Selections from Gandhi'. সেই বছরই বোম্বাই থেকে ফেরার পথে নির্মলকুমার কৃষ্ণ কৃপালনীকে সঙ্গে নিয়ে ওয়ার্ধার সেবাশ্রমে গান্ধীজি ও আবদুল গফফর খানের সঙ্গে দেখা করতে যান। নির্মলকুমারের কাছে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ, সমাজ পুনর্গঠন ও নানা বিষয়ে সম্যক ব্যাখ্যা দেন। এগুলিই গান্ধীবাদ সম্পর্কে নির্মলকুমার বসুর আলোচনায় বুনিয়াদী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। প্রকাশ পেয়েছে 'Studies in Gandhism' (1940), 'Gandhiji's Theory of Trusteeship' (1945) প্রভৃতি গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ।

বোলপুরে খাদি সংঘে আত্মনিয়োগের সময় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে নির্মলকুমার বসুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেমন- রানী চন্দ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং মহান শিল্পী নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেজ প্রমুখ। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার প্রতিক্রিয়া স্পন্দিত হত নানাভাবে তাঁর লেখায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় তাঁর 'নবীন ও প্রাচীন' গ্রন্থটির কথা। এই বইয়ের ভূমিকায় নির্মলকুমার বসু লিখেছেন, 'শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কৃতি বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি বুঝিবার যেমন চেষ্টা করিয়াছি, বর্তমান কালের সমাজ ও সংস্কৃতিরও তেমনই আংশিকভাবে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে মিলও যেমন আছে, পার্থক্যও তেমনই আছে'। এই গ্রন্থে যেমন তিনি সত্যাগ্রহ ও গান্ধীজির সত্যসাধনা বর্ণনা করেছেন, তেমনই বর্ণিত হয়েছে জুয়াং জাতি, নুলিয়া সমাজ, প্রাচীন হিন্দু সমাজের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের ছবি, রামকিঙ্কর বেজ প্রমুখ বিষয় নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৩৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে নির্মলকুমার নৃতত্ত্ব বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন। প্রাগৈতিহাসিক পুরাতত্ত্ব পড়াতেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাগৈতিহাসিক পুরাতত্ত্বকে জানতে হলে যেতে হবে মাটির কাছাকাছি, মাটি খনন করে সব দেখতে হবে, জানতে হবে। সুযোগ এল ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে খনন কাজ ও অনুসন্ধানের। ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক ধরণী সেন-এর সঙ্গে প্রকাশ করলেন 'Excavations in Mayurbhanj'.

নির্মলকুমার বসু মধ্য ওড়িশার জুয়াং এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও ওরাওঁদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে বৃহত্তর হিন্দু পরিবেশে জনজাতিদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতাগুলির বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন। ১৯৪১ সালে ৩ জানুয়ারি বারাণসীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে নৃতত্ত্ব শাখায় পড়লেন তাঁর লেখা– 'The Hindu Method of Tribal Absorption'। তাঁর বক্তৃতার নির্যাস হল, 'আদিবাসীদের সমতলবাসী বর্ণ-জাতিভিত্তিক কৃষক সমাজের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরেও ক্রমশ সমতলের জাতিভিত্তিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে'। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ সুরজিৎ সিনহা লিখেছেন, 'এই মৌলিক প্রবন্ধটিতে পরবর্তীকালে নির্মল বসুর তাত্ত্বিক চিন্তায় অরণ্যবাসী এবং বর্ণ জাতিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর সমাজ গঠন ব্যবস্থাতে পরিবেশ, জনসংখ্যা-বিন্যাস, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং বিশেষত উৎপাদন ব্যবস্থা ও জনসংখ্যার সঙ্গে জমির পরিমাণের অনুপাতের প্রভাব অনুসন্ধানের যে ধারা তার অঙ্কুর নিহিত ছিল'।

নির্মলকুমার বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেন ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। ৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে নির্মলকুমার বসু কারারুদ্ধ হন। দমদম সেন্ট্রাল জেলে অগস্ট ১৯৪২ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ পর্যন্ত থাকাকালীন তিনি সহবন্দি মানুষদের থেকে অবিভক্ত গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, কৃষিজপণ্য, হস্তশিল্প ইত্যাদির এক অনুপুঙ্খ বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ডায়েরির পাতায়। পরিব্রাজক নির্মলকুমার বসু অবিভক্ত বাংলা পরিব্রজন করেছেন সহবন্দিদের মাধ্যমে। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্তের 'দর্শক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধকারে প্রকাশিত হয় সেই তথ্য। পরে গ্রন্থাকারে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে 'বিয়াল্লিশের বাংলা' প্রকাশিত হয়। এই বইতে অবিভক্ত গ্রামবাংলা যে অনুপুঙ্খতায় ফুটে উঠেছে, তার অনেক কিছুই কালের নিয়মে হারিয়ে গিয়েছে। যেসব জীবিকা, জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বস্তুগত উপাদান নির্মলবাবু লিপিবদ্ধ করেছেন, তার কিছু কিছু এখন আর কোথাওই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নির্মলকুমারের ইচ্ছে ছিল এই তথ্যের ভিত্তিতে বাংলার এক সামগ্রিক চিত্র প্রস্তুত করবেন। ১৯৭১-এ বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, '১৯৪২-এর পরে বাঙ্গলা দেশের চেহারা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থান অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। দেশের পুরাতন রূপ আর নাই। তবু বাঙ্গালী মাত্রের নিকটে জন্মভূমি চিরকালই প্রিয় থাকিবে এই বিশ্বাসে পুস্তিকাখানি প্রকাশনের বিষয় রাজি হইয়াছি। ইহার সাহায্যে দেশকে, দেশের মাটি ও মানুষকে, তাহাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, হাট বা মেলার সম্বন্ধে যদি আমাদের অনুরাগ এবং অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব'।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি হিন্দু গ্রন্থশাস্ত্রের সাহায্যে, বর্ণব্যবস্থার পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চয় করে হিন্দু সমাজকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই নিরলস চেষ্টার ফসল হল 'হিন্দু সমাজের গড়ন'। ১৯৪৯ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ 'লোকশিক্ষা' গ্রন্থমালায় তাঁর এই বই প্রকাশ করে। নৃতাত্ত্বিকরা কীভাবে ভারতের সমাজ গঠন ও তার পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করেন সেই বিষয়ে কারাবাসের সময়ে নির্মলকুমার তাঁর সহবন্দিদের কাছে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতাগুলোই পরে ওই বইটিতে রূপ নেয়।

'হিন্দু সমাজের গড়ন' বইতে নির্মলকুমার বসু লিখেছেনঃ 'হিন্দুসমাজ বহুদিন যাবৎ নানা জাতির সংহতির দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে'। তিনি লক্ষ করেছিলেন মধ্য ওড়িশার পাল্লাহড়ায় 'অনার্য' জুয়াং আদিজনজাতির মধ্যে স্নানের পবিত্রতা, উপবাসের নিয়ম, ধূপ-ধূনা জ্বালার অভ্যাস, হলুদ, আলোচাল ইত্যাদির ব্যবহার। পাশাপাশি লক্ষ্মীদেবী, প্রাচীন ঋষিপত্নীদের নাম গ্রহণ যা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির লক্ষণ বহন করে। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন জুয়াংদের নিজস্ব কায়দায় পূজাপাঠ, মোরগ বলি, তাদের আপন দেবতা বুঢ়াম বুড়ো ও বুঢ়াম বুড়ির পুজো। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক সংস্কৃতির এক অনবদ্য সহাবস্থান।

পরবর্তীকালে মুণ্ডা জনজাতির উপর গবেষণার সময় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন– ব্রাহ্মণ্য সমাজের শ্রম বিভাগের দরুন উন্নত জীবনধারা অনুধাবন করে, মুণ্ডারা কিছু কিছু শিল্পের অনুকরণ করছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি লিখেছেন– মুণ্ডারা কার্পাস থেকে চরকার সাহায্যে সুতো কাটতে শিখেছে, তেলের পাটা ছেড়ে কলুর ঘানি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তবে যেহেতু হিন্দু সমাজের বর্ণবিন্যাসে কলুর স্থান নিচে তাই জাত হারানোর ভয়ে বলদের জায়গায় মুণ্ডা মেয়েরা নিজেই ঘানি টানছে। অর্থাৎ মুণ্ডা জাতিও হিন্দু সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। এমনকি মুণ্ডারা সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের প্রচলিত ভেদাভেদ ব্যবস্থাকেও মেনে নিয়ে কার্যত হিন্দু সমাজেরই একটি জাতি বর্ণে পরিণত হয়েছে। এখানে নির্মলকুমারের বিশ্লেষণ হল সমাজ-গঠনের প্রক্রিয়ায় ধর্মের চেয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেক বেশি শক্তিশালী।

নির্মলকুমার বসু এটাও উল্লেখ করছেন: 'হিন্দু সমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যে সকল শ্রেণিভেদ লক্ষিত হয় এবং শাস্ত্রকারগণ যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ পরিচালনার চেষ্টা করিতেন; এই উভয় বিষয়কে একত্র করিলে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের গঠন সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি সংহত চিত্র ফুটিয়া ওঠে'। অর্থাৎ জাতিপ্রথা যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদাভেদ

সৃষ্টি করে তা অস্বীকৃত হয়নি। তবে জাতিপ্রথা যেভাবে বিভিন্ন জাতিকে বেঁধে রেখেছে তা নির্মলকুমার বসুর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

কারামুক্ত নির্মলকুমার ১৯৪৫ সালে আবার অধ্যাপনার কাজে ফিরলেন। ১৯৪৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিউম্যান জিওগ্রাফির' লেকচারার নিযুক্ত হয়ে পরে ওই বিভাগের 'রিডার' পদে উন্নীত হন। ১৯৪৬ এর অগাস্ট মাসের ১৬ তারিখ– বাংলার ইতিহাসে একটি অন্ধকারময় দিন। কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল সেই দিন। সে সময় চোখের সামনে হিন্দু মুসলমানের এরকম ভ্রাতৃঘাতী হনন নির্মলকুমারকে বিচলিত করেছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্মলকুমার বিপন্ন, ভীত, সন্ত্রস্ত হিন্দু ও মুসলমানদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছেন। সেই বছরই ১৭ অক্টোবর নোয়াখালিতে দাঙ্গা শুরু। ৬ নভেম্বর গান্ধীজি দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে ছুটে যান। নির্মলকুমার তখন নোয়াখালি থেকে আসা উদ্বাস্তুদের শিবিরে শিবিরে ঘুরে দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নানা মর্মান্তিক কাহিনি লিপিবদ্ধ করছিলেন। মহাত্মা গান্ধী অনুরোধ জানিয়েছিলেন নির্মলকুমারকে তাঁর একান্ত সচিব ও বাংলা অনুবাদক হিসেবে কাজ করার জন্য। গান্ধীজির জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, 'আমি বিজ্ঞানকর্মী, সেটাই আমার মূল কাজ। রাজনৈতিক আন্দোলনে সহায়তা করি দেশের সংকট সময়ে নিজেকে দূরে রাখতে চাই না বলে। মানুষের পাশে দাঁড়ানো সবসময় দরকার এই বিশ্বাস রেখে চলি'। নির্মলকুমার নোয়াখালিতে গান্ধীজির সহযাত্রী হন। সেই অভিযান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিজ্ঞানী নির্মলকুমার চেয়েছিলেন সমকালের বহুমান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ওই অবিসংবাদিত নেতার বিরল ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজমনস্ক সংস্কৃতিকর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজিকে দেখেছিলেন নির্মলকুমার। তাঁর বিজ্ঞানসম্মত অন্বেষায় লব্ধ প্রাণবন্ত স্মৃতিচারণ – 'My Days with Gandhi' গ্রন্থটি। প্রকাশকাল ১৯৫২।

নির্মলকুমার বসুর কাজের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিস্মিত করে আজও। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি ছিলেন ১৯৪৯ সালে। সেখানে তিনি যে বিষয়টি নিয়ে প্রবন্ধ পড়লেন, তাঁর শিরোনাম: 'ভারতের মন্দিরগুলির তারিখ নির্ণয়পদ্ধতি উন্নয়ন বিষয়ে কয়েকটি ইঙ্গিত'। এই প্রবন্ধ ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের একক উদ্যোগে সমীক্ষাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক নির্মলকুমার আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগ'-এ পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৮-এ শিকাগো উইসকনসিন ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতে সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

নির্মলকুমার বসু তো শুধু অধ্যাপক ছিলেন না। তিনি নিরলস কর্মী, চিন্তার জগতে স্বতন্ত্র এক মানুষ। ১৯৫৩ সালে নির্মলকুমার 'Man in India' জার্নালের চতুর্থ সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ভারতীয় নৃবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক শরৎচন্দ্র রায় সম্পাদিত এই জার্নালটির পথ চলার শুরু। এটি শুধুমাত্র একটি নৃবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা নয়– বিশ্বের নৃবিদ্যার প্রেক্ষিতে এই পত্রিকা হয়ে উঠেছিল একটি প্রতিষ্ঠান, যার ছত্রচ্ছায়ায় ভারতীয় নৃবিজ্ঞান চর্চা তার বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭২ – মৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রায় চোদ্দো বছর তিনি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে শেষ আট বছর এককভাবে তিনি এই পত্রিকাটিকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দেন।

শুধুমাত্র 'Man in India'-তে প্রকাশিত নির্মলকুমার বসুর প্রবন্ধের সংখ্যা ৪৩। জনজাতি বিষয়ক রচনায় ওড়িশার জুয়াং জনজাতিই ছিল তাঁর প্রাথমিক আলোচ্য। সময়ের পরিবর্তনে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, খ্রিস্টধর্ম, শিল্পায়ন অর্থাৎ বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাবে আদি জনজাতির সংস্কৃতির পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে তিনি তা বাস্তব ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আলোচনা করেছেন। আদি জনজাতির কল্যাণকর্মে নৃবিজ্ঞানের গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের যে বিশেষ প্রয়োজন তা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। গবেষণা ধারা ও পদ্ধতি বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধে ভারতীয় নৃবিজ্ঞান গবেষণার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন গবেষণাকে ভারতীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমাদের নিজস্ব প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যবহার করে সমস্যার বিশ্লেষণ করতে হবে। বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার আলোচনায় অধ্যাপক বসু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-মিশ্রণ, সংঘাত-সমন্বয়ের বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে আলোচনা করেছেন।

নির্মলকুমার বসুর মন ছিল সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত। সেই মনকে গড়ে নিয়েছিলেন তিনি নিষ্ঠা, অনুশীলন, অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের মাধ্যমে। স্বদেশে ফিরে ১৯৫৯ সালের ২৯ জানুয়ারি তিনি অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হবার পর নৃতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। দু-মাসের মধ্যেই ভারতীয়দের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুর গঠনের আঞ্চলিক বিস্তার বিষয়ে একটা সমীক্ষা শুরু করলেন তিনি। ঠিক হয়েছিল, একজন করে গবেষক ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় একটি করে গ্রামে চার পাঁচ দিন করে থেকে মোট ৪১টি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। সেই সময় দেশে জেলার সংখ্যা ছিল মোট ৩২২টি। মোট ২৯ জন গবেষক ছেলে-মেয়েকে কয়েক দফায় পাঠিয়েছিলেন এক একটি জেলার গ্রামে। শেষপর্যন্ত অবশ্য ৩১১টি জেলার ৪৩০টি গ্রাম থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। খোলা মনে, অনুসন্ধিৎসু চোখে মানুষের সমাজকে দেখতে, তিনি নিজে যেমন অভ্যস্ত ছিলেন– সেইভাবেই এই

সমীক্ষাও শুরু করতে চাইলেন নবীন গবেষকদের দিয়ে। সেই বিপুল ক্ষেত্রানুসন্ধানের ফসল ১৯৬১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'Peasant Life in India: A Study in Indian Unity and Diversity'। বইটির ভূমিকায় নির্মলকুমার লিখছেন, বাস্তব জীবনের সঙ্গে গভীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ই মনে হয় সমস্ত সমাজ-বিজ্ঞানে অনুপ্রবেশের শ্রেষ্ঠ পথ।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর প্রধান ব্রত ছিল ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা। এজন্য তিনি নৃতত্ত্বের পদ্ধতির সঙ্গে হিউম্যান জিওগ্রাফি ও মানবপ্রকৃতি বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। ১৯২০ থেকে এদেশের নৃতাত্ত্বিকদের সংগ্রহ করা নরকঙ্কাল ও মাথার খুলির বিজ্ঞানসম্মত কোনো আলোচনা হয়নি। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে নির্মলকুমার বসুর তত্ত্বাবধানে সেই গবেষণা শুরু হয়। এই গবেষণায় জানা যায় প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তারের পিছনে বহির্দেশীয় প্রভাব তেমন নেই। অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও তথ্যনির্ভর এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় বিজ্ঞানের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে সমীক্ষা করে ভারতবাসীর দৈহিক আকৃতিগত বৈচিত্র্যগুলি বিশ্লেষণের কাজে হাত দেন।

কলকাতার উপর তাঁর সমাজ সমীক্ষা, 'Calcutta: 1964: A Social Survey' নির্মলকুমার বসুর লোকসংস্কৃতির চর্চার বৈশিষ্ট্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। কলকাতাকে তিনি অপরিণত মহানগর (Premature metropolis) মনে করতেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে সারা ভারতে জাতিপ্রথা যেভাবে নানাবিধ পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত, কলকাতা মহানগরে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলিও তেমনি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। জাতিব্যবস্থার পুরোনো গঠনপ্রণালী নতুনভাবে কলকাতা মহানগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপন সত্তায়। মার্কিন দেশের melting pot-এর গড়ন থেকে কলকাতা এখনও বহুদূরে। কলকাতার অর্থনৈতিক অবস্থাকে তিনি দারিদ্র্যজনিত আর্থিক পরিস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে বসবাসকারী অধিবাসিদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান নেই। কলকাতার বাসিন্দারা তাদের জনগোষ্ঠীর কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়। বিভিন্ন গ্রাম, জেলা, রাজ্য থেকে আগত বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীর মানুষের সমাবেশ ঘটেছে এই কলকাতায়। এঁরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। গোষ্ঠীনির্ভরতা এবং গোষ্ঠীপার্থক্য কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনকে বর্ণময় করে তুলেছে। কলকাতাবাসির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাঙ্গে গ্রাম্যতার ছাপ বেশ স্পষ্ট। লোকসংস্কৃতির যাবতীয় উপকরণ কলকাতার অলিতে গলিতে, মঠে, মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়, হাটে বাজারে, বস্তিতে, পার্কে, গঙ্গাতীরে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্নতর ক্ষেত্রে অধ্যাপক বসু অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করছেন অক্লান্তভাবে। একাজে তাঁর গায়ত্রী হল: সত্যের সাহায্যে নিরীক্ষণ। তাহলেই সত্যকে জানা যায়। অধ্যাপক বসু ভারতীয় সমাজকে জানতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তির সন্ধান করেছিলেন।

১৯৬৭ সালে অসমের রাজ্যপালের অনুরোধে নির্মলকুমার বসু উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে গেলেন ওই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে একটি বিবরণ তৈরি করার জন্য। তখন তাঁর বয়স ৬৬ বছর। তিনি প্রতিবেদন লিখলেন 'Edcational Problems of NEFA'.

১৯৬৭ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্মলকুমারকে তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির কমিশনারের পদে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিন বছর ঐ পদে ছিলেন তিনি। কাজ করেছেন হৃদয় দিয়ে, মনন চিন্তন দিয়ে। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছেন অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলেছেন পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়ন ও কল্যাণ কীভাবে সম্ভব। ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য তিনি জাতীয় নীতি নির্ধারণ করেন। তিনি মূলত তিনটি বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন:

প্রথমত, তিনি বলেছিলেন পাহাড় এবং সমভূমি মধ্যে আন্তঃনির্ভর একটি অর্থনীতি গড়ে তোলা উচিত।

দ্বিতীয়ত, সাংস্কৃতিক নীতিটি অত্যন্ত উপযোগী এবং সহনশীল হওয়া উচিত, নির্দিষ্ট উপজাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে উন্নয়নের সুবিধা সরবরাহ করা উচিত।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক নিবৃত্তির দাবিটি আলোচনা সাপেক্ষে হওয়া উচিত নয়। যেসব জনজাতি নেতা যারা এই জাতীয়তা বিরোধী দাবিতে জড়িত হতে পারে তাঁদের সাথে দৃঢ়তার সঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে যোগাযোগ করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে সুরজিৎ সিনহা বলেছেন, 'this is perhaps the clearest overall policy guideline which has so far been formulated about the unique mountainous tribal regions located at the international border in North East India'.

১৯৭১ সালে প্রকাশিত 'Tribal life in India' গ্রন্থটি এখনও ভারতের লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বেদস্বরূপ। জনজাতিদের শিল্পকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের উপর তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু তাঁর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩০-৩১ সাল। কয়েক সপ্তাহ তিনি জুয়াংদের দেশে শিবির স্থাপন করেছেন। জুয়াংরা খুব গরিব। একদিন এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে অধ্যাপক বসু দেখেন যে চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে আকাশ। সারা গাঁয়ের লোক সারারাত নেচে কাটাল। মাদলের আওয়াজ ও বাঁশির

সুরে সারারাত পাহাড়গুলি জীবন্ত হয়ে উঠল। সমবেত নৃত্য ও গীতের ছন্দ ও সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল।

সকালবেলা অধ্যাপক বসু জুয়াংদের কাছে জানতে চাইলেন– তারা সারারাত না ঘুমিয়ে নাচগানে কাটালো কিসের প্রেরণায়। এক বৃদ্ধ জুয়াং জানালেন– তাঁরা সারাটা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন, বড় কষ্টে দিন কাটে– রাতেও দুঃখ করবেন কেন? দিনের দুঃখকে রাতের নাচগানে জয় করেন। বৃদ্ধ জুয়াং-এর কথাটা অধ্যাপক বসুর মনে আলোড়ন তোলে। তিনি লিখেছেন, 'I believe that it is in this way that the tribal people of India conquers the sorrow of daily life by discovering their own souls in the depth of religious and artistic experiences.'

১৩৩৮ সালে প্রবাসী পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় নির্মলকুমার বসু লিখেছেন ওড়িশা, রাজপুতানা, মধ্যভারত ও হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন মন্দির বিষয়ে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সচিত্র। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে তিনটি লেখা প্রকাশিত হয় তিন মাসে। বিষয়– মানভূম জেলার মন্দির, জুয়াং জাতি, কনারকের মন্দির এবং নুলিয়া জাতি। ১৩৪১-এ লিখলেন নুলিয়া সমাজ নিয়ে। দেশ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ১৩৪০ সালের ৮ অগ্রহায়ণ তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'ধনিক ও শ্রমিক' শিরোনামে। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম– 'গান্ধীবাণী: মানুষের দুঃখ ও তাহা নিবারণের উপায়'। ১৩৪২-এ লিখছেন 'দেশ'-এ বাঙালির চরিত্র, বাঙালির সমাজ নিয়ে। ওই সময়েই প্রবাসীতে লিখেছেন 'বাঙালির স্থাপত্য' শিরোনামে। ১৯২৩ থাকে ১৯৭২ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে তাঁর বাংলা লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা ৩২৯। ১৯২৪ থাকে ১৯৭২ প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের সংখ্যা ৩৯৪।

নির্মলকুমার বসুর গবেষণা নিবন্ধ, যেমন– 'Caste in Bengal', 'East and West in Bengal', 'Comparative Study of Civilization', 'Social and Cultural life of Calcutta', 'Culture and Society in India', 'Problems of National Integration', 'Problems of Indian Nationalism' তাঁর গভীর জ্ঞান, মানুষ ও সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বকে তো বটেই, সামগ্রিকভাবে তাঁর নৃতত্ত্ব গবেষণার চিরব্যাপ্ত দিগন্তকে তুলে ধরেছে। তিনি ভারতীয় নৃবিজ্ঞানকে প্রকৃত অর্থে ভারতীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে এশিয়ার নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে 'অ্যানানডেল' সুবর্ণ পদক দেয়। ১৯৬৬-তে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে নৃতত্ত্বে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য 'শরৎচন্দ্র রায় সুবর্ণ পদক' প্রদান করে। পদ্মশ্রী পান ১৯৭১-এ।

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি মনে করতেন দেশের কর্ম প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞান ভিত্তিক হতে হবে। দেশের অতি সাধারণ বা পিছিয়ে পড়া মানুষজনদের প্রতি কেবল ভাবাবেগে অভিভূত হলেই চলবে না– তাদের মানসিকতা ও জীবন-সমস্যাকে বিজ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে। এবং এই কাজে সাফল্য পেতে হলে নিপীড়িত মানুষের জীবনে জীবন যোগ করতে হবে, তাদের ভালোবাসতে হবে ও তাদের জীবনবোধকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

নির্মলকুমারের বিপুল কর্ম তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে এ যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুধা ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন। তিনি আমাদের দেশের প্রধান এক নৃতত্ত্ববিদ, যিনি ওড়িশার জুয়াং, ছোটনাগপুরের হো, মুণ্ডা, ওরাওঁ জনজাতি, অথবা বোলপুরের মুচি, ডোম, বাউরিদের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। আবার মন্দিরস্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের তাড়নায় ছুটে গিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে। কলকাতার সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতে গিয়েও তিনি বলেছেন একজন অনুসন্ধানকারীর সার্বিক পদ্ধতিই হল নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই গবেষক সঠিক উত্তরে পৌঁছোতে সমর্থ হবেন। যারা নির্মলকুমার বসুকে শুধু গান্ধীবাদী হিসেবে চেনেন তারা মানুষটির অন্য পরিচয় সম্পর্কে আজও অজ্ঞাত। যারা তাঁকে শুধু নৃতাত্ত্বিক বলেই জানেন, তাদের কাছে অজানা থাকে মানুষটির অন্যান্য ভূমিকার কথা। প্রকৃত অর্থে নির্মলকুমার বসু ছিলেন ভারতপথিক। পরিব্রাজক হয়েই নির্মলকুমার ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে ঘুরেছেন– মানুষকে অন্বেষণ করেছেন। সেজন্য তাঁর বিজ্ঞানী চেতনার অন্তরালে বয়ে চলেছে এক কবিপ্রাণতা, এক দার্শনিক চেতনা।

তথ্যপঞ্জি

বসু, নির্মলকুমার। ১৩৫৬। নবীন ও প্রাচীন। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স।

বসু, নির্মলকুমার। ১৩৫৬। হিন্দু সমাজের গড়ন। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

বসু, নির্মলকুমার। ১৩৬৬। পরিব্রাজকের ডায়েরি। ২য় সংস্করণ। কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরি।

Bose, Nirmal Kumar. 1971. Tribal Life in India. New Delhi: National Book Trust.

Bera, Gautam Kumar. 2009. The Wanderlust Anthropologist- Anthropological Profile of Nirmal Kumar Bose. Allahabad: The Oriental Institute of Cultural and Social Research.

দে, অভীককুমার। ২০০৩। নির্মাল্য- অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু শতবর্ষ স্মরণ। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ।

Sinha, Surajit. 1986. Nirmal Kumar Bose: Scholar Wanderer. New Delhi: National Book Trust.

Sinha, Surajit. 1997. Nirmal Kumar Bose Memorial Lecture, 1993. New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts.

প্লে-স্কুল, হ্যালোজেন ও শ্যামাপোকা

অম্লানকুসুম চক্রবর্তী

দোলের দিন কলেজের বন্ধুদের জমায়েতে সপরিবার রং মাখার বদলে পারমিতার আড়াই বছরের ছেলের গালে জুটল সপাটে থাপ্পড়। ফর্সা গাল চোখের পলকে লালে লাল। পাঁচ আঙুলের দাগ স্পষ্ট। সুকল্পর দু-বছর সাত মাসের মেয়ে বইয়ের তাকে একটা একটা করে বই গুণে এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত এগিয়েছিল। পারমিতার ছেলের পালা যখন আসে, তখন ছয়ের বেশি এগোতে পারেনি। 'তার পর, তার পর' বলে যখন সমস্বরে চিৎকার হচ্ছিল ঘর জুড়ে, কলোসিয়মে বন্দি ছোট্ট ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠল, 'নাইন'। তারপরেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। 'তবে রে' বলে পারমিতা ছেলের হাত থেকে চিপস্-এর প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণে। অতঃপর থাপ্পড়। এবং শেষে পারমিতার বিলাপ, 'এর সত্যি সত্যি কিছু হবে না।' পারমিতার বর ঋতব্রত বউয়ের কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দেয়, 'সব ঠিক হয়ে যাবে পারো। দেখো..।' পারমিতা তুমুল বিরক্তি নিয়ে ঋতব্রতর হাতটা চকিতে সরিয়ে দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, 'ছাড়ো তো। এই জন্য বলেছিলাম আর কয়েকমাস আগে ভর্তি করে দিতে।'

দু-বছর চার মাসের ছেলেকে যখন প্লে-স্কুল বলে একটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম মাসখানেক আগে, ঘরের মধ্যেও বাহারি সানগ্লাস পরা প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, 'অনেকটা দেরি করে ফললেন জানেন। গ্রুমিং যত দেরি করে শুরু হবে, বড়ো স্কুলে অ্যাডমিশনের সম্ভাবনাও তেমন ভাবে কমবে।' জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ম্যাডাম, কতটা দেরি করলাম একটা আইডিয়া পেতে পারি?' উত্তর এসেছিল, 'যে গার্ডিয়ানরা তাঁদের বেবির কেরিয়ারের ব্যাপারে কনসার্নড, তাঁরা এক বছর আট মাসেই ভর্তি করিয়ে দিতে চান। যত আগে থেকে ওরিয়েন্টেশন শুরু করা যাবে, তত বাড়বে শিশুর দৌড়ের পরিধি।' আমার কপাল খানিক কুঁচকোতে দেখেই ম্যাডাম হাতে তুলে নিলেন ট্যাব এবং আমায় বললেন, 'মোট বত্রিশটা ভিডিয়ো আছে। যেটা ইচ্ছে দেখতে থাকুন।' প্রতিটা ভিডিয়োর তলায় দেখলাম ব্র্যান্ডিং করা আছে। বাচ্চার নাম আর বয়স স্ক্রিনের নিচে। আর টিভি চ্যানেলের লোগোর মতো প্লে-স্কুলের নাম স্ক্রিনের উপরে একেবারে ডানদিকে। কয়েকটা ভিডিওর কথা মনে আছে। একটা দু-বছর একমাসের মেয়ে আবৃত্তি করছিল, 'হেলো, আই প্রেজেন্ট ইন্সি উইন্সি স্পাইডার।' আট লাইনের কবিতার প্রথম লাইন থেকে শুরু করে শিশুটি শেষ লাইনে যখন পৌঁছে যায় অবলীলায়, প্রিন্সিপাল ততক্ষণে তাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। সোনালি রাংতা ছিঁড়ে ওর মুখে ঠুসে দিচ্ছেন ডেয়ারি মিল্ক। আরো একটি ছেলের কথা মনে আছে। বইয়ে কেঁচোর ছবি দেখিয়ে যখন ওকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে 'হোয়াট ইজ দিস ডিয়ার', ও উত্তর দিচ্ছে, 'দিস ইজ ওয়ার্ম। কিন্তু এটা অলসো লুকস লাইক দ্য ইন্টিগ্রেশন সাইন। ম্যাম বলেছে।' ট্যাবটা ফেরত নিয়ে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বলেছিলেন, 'এখন শুধু কিড হলে জীবনে কিস্যু হয় না। উইজার্ড কিড হতে হয়। কী বুঝলেন? কীভাবে পেমেন্ট করবেন, কার্ডে না ক্যাশে?'

মধ্য তিরিশে পৌঁছে যে নব্য মা-বাবাদের দেখি, তাঁদের মধ্যে সন্তানকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা দেখলে বড়ো অবাক আগে। এই দৌড়ে আমিও সামিল। স্কুলজীবনে শোনা নচিকেতা চক্রবর্তীর গানটার কথা মনে পড়ে। 'বাচ্চা হবেই শুনে চারিদিকে খোঁজ খোঁজ, কোথা ভাল স্কুল আছে আলোচনা রোজ রোজ।' দু-লাইন পরে ছিল, 'প্রপার এডুকেশন, মোটা মোটা ডোনেশন, ক্ষতি নেই যদি দাও ওভার ওভার ডোজ।' মর্ম না বুঝে শুধু গানকে ভালোবেসে যা শুনতাম সেদিন, তা যে এত বড়ো বাস্তব হয়ে যাবে আর দেড় দু-দশক পরেই, তা ভাবিনি। যে সময়ের কথা বলছি, তখনও প্লে-স্কুল ডানা মেলেনি অলিতে গলিতে। হয়তো সন্তানদের 'প্রপার' গ্রুমিং নিয়ে বাবা মায়েদের তত চিন্তা ছিল না। হয়তো, নিজেদের ছেলেমেয়েদের শৈশবটাকে শৈশবের মতো করেই কাটাতে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। প্রাইমারি স্কুলের নিচেও যে একটা স্কুল হতে পারে, লোয়ার কেজির নিচেও যে আরো কয়েকটা ক্লাসের সিঁড়ি থাকতে পারে, তা নিয়ে কৌতূহলী আঁকশি তাঁরা বেশি বাড়ানোর কথা ভাবেননি। দু-তিনটে পাড়া ঘুরলে একটা ছোটোদের স্কুল পাওয়া যেত। আজ বাড়ি থেকে বেরোলেই

এমন স্কুলের বিজ্ঞাপন হাঁ করে গিলতে আসে। চ্যাম্পকিডস, স্টারকিডস, সুপারঅ্যাচিভার্স, প্রোডিজিমেকার্স, বেবিটপার—এমন নানা নামের স্কুলের বিজ্ঞাপন একে অন্যকে দুয়ো দেয়। শুধু শিক্ষাদান হয়তো বাতিল শব্দ আজকের দিনে। কোনো স্কুলের ওয়েবসাইট ফলাও করে লেখে প্রোঅ্যাক্টিভ লার্নিং-এর কথা। কেউ বলে, এই লার্নিংও বড্ড পুরোনো কনসেপ্ট। আমাদের নিবেদন ৩৬০ ডিগ্রি লার্নিং। দাবি, পড়াশোনা শেখানোর এই অত্যাধুনিক পদ্ধতি নাকি এমন করে তৈরি করা রয়েছে, যার ফলে শিশুদের ব্রেনের পাওয়ার বাড়তে বাধ্য। কিড উইল বি সুপারকিড। দাবি, শিশুদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সৃজনশীলতা নাকি মাইক্রোস্কোপিক পদ্ধতিতে খুঁজে এনে সেই চারাগাছে জল দেওয়া হয়। প্লে স্কুলের এক শিক্ষিকা তথা মার্কেটিং ম্যানেজার দিদিমণিকে বলতে শুনেছিলাম, 'আমাদের এখানকার স্পেশাল লার্নিংয়ের মধ্যে দিয়ে গেলে শিশুটি বড়ো হওয়ার পরে শুধু সত্যেন বোসের মতো অঙ্ক করেই ক্লান্ত হবে না, সঙ্গে তাঁর মতো বেহালা বাজানোটাও শিখবে।' বলেছিলাম, 'দু-বছরের শিশুর হাতে বেহালা ধরালে সে তো তার ছিঁড়ে ফেলে দেবে, বাদ্যযন্ত্রের উপরে উঠে লাফাবে তিড়িং বিড়িং।' উনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, 'তা লাফালেও সেটা যেন উদয়শঙ্করের মতো ছন্দোবদ্ধ হয়, তা আমরা নিশ্চিত করব। ডোন্ট ওরি।' অন্য এক প্লে-স্কুলের কর্তা জানতে চেয়েছিলেন বাচ্চাকে হাতেখড়ি দিয়েছি কিনা। হ্যাঁ শোনার পরে জিভ কাটলেন। তারপরে বললেন, 'বাড়িতে লেখানোর অভ্যেসটা একেবারে করবেন না। সেটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।' জীবনে প্রথম বারের জন্য জানতে পারলাম, লেখা শুরু করাটাও এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। তাঁদের প্রোঅ্যাক্টিভ, আর্গো লার্নিং কারিকুলাম শারীরতন্ত্রের সঙ্গে লেখা শেখার এক যোগসূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে, বিশ্বে প্রথম। জানলাম, লেখা শিখতে শুরু করার আগে দরকার কব্জির নমনীয়তা। বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি কিছু খেলনা ওই প্লে-স্কুলে রয়েছে। সেই খেলনার নানা হ্যান্ডেল ডান দিকে বাঁ দিকে, সামনে পিছনে সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে ঘোরালে নাকি কব্জির নমনীয়তা বাড়বে। জানতে পারলাম, কব্জির নমনীয়তার সঙ্গে নাকি হাতের লেখা ভাল হওয়ার সমানুপাতিক সম্ভাবনা রয়েছে। স্কুলটির দাবি ছিল, ওদের কাছে পাঠালে বাচ্চার হস্তাক্ষর শুধু হাতের লেখা হয়েই থেমে থাকবে না। তা হয়ে উঠবে ক্যালিগ্রাফি।

ইকো-লার্নিং, ফান-লার্নিং, ইন্টারাক্টিভ লার্নিং—এসব স্বঘোষিত তকমার উপরে ভিত্তি করে এমন প্লে-স্কুলের দক্ষিণা নির্ধারিত হয়। ভর্তি করতে হাজার দশেক টাকা লাগে এমন স্কুল যেমন আছে, তেমনই আছে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে দেড় বছরের শিশুকে ভর্তি করার স্কুলও। একলাখি প্লে-স্কুলকে এত টাকা নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে উত্তর এসেছিল, 'এটা তো খুবই নমিনাল ফি। বেবি ফ্রেন্ডলি ফার্নিচার রেখেছি। কোনো প্রান্তে ধার নেই। বাচ্চার হাত পা কাটবে না। ৬৫ ইঞ্চির এলইডি স্ক্রিন রেখেছি, লার্নিং হবে আন্তর্জাতিক মানের। ঠান্ডা ক্লাসরুম। স্কুলে ঢুকলেই কানে আসতে থাকবে সুদিং মিউজিক। এই বাজনা বাচ্চাদের গ্রে ম্যাটারকে আরো পুষ্ট করবে।' এত অবধি ঠিক ছিল। এর পরেই এসেছিল এক মোক্ষম যুক্তি। 'প্রতিটা বেবির ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে এখানে অ্যাডমিশন দেওয়া হয় স্যার। বছরে দশ লক্ষের বেশি সিটিসি না হলে আমরা ভর্তি করি না। আপনাদের ইন্টারভিউয়ের সময় লাস্ট তিন মাসের পে-স্লিপ দেখানো বাধ্যতামূলক। ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্রসিড?' এমন অদ্ভুত নিয়মের কারণ জানতে বড়ো শখ হয়েছিল। ওঁরা বলেছিলেন, 'আপনারা কি চান না বেবিরা সেম ক্যাটাগরির বন্ধুদের সঙ্গে মিশুক? একটা ফিল্টার না রাখলে অনেক গারবেজ এসে যায়।'

প্রতিটা প্লে-স্কুলের নিজস্ব ওয়েবসাইটের পাশাপাশি ফেসবুক অ্যাকাউন্টও আছে। রয়েছে ইউটিউব চ্যানেলও। সেখানে গেলে দেখা যায়, সেম ক্যাটাগরির বাচ্চারা নাচে, গায়, আয়েশ করে। ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ কবিতার শেষ লাইনে শরীরে আহ্লাদ মিশিয়ে দশ লাখ সিটিসির পরবর্তী প্রজন্ম দু-বাহু দু-দিকে প্রসারিত করে বলে, ওয়ান ফর দ্য লিটল বয় হু লিভস ডাউন দ্য লেন। সে হয়তো জীবনে বাসে ওঠেনি কখনো। সেম ক্যাটাগরির শিশুরা ডি ফর দিল্লির আগে দিব্যি শিখে যায় ডি ফর ডাবলিন। বাচ্চাদের খুশির সঙ্গে মা-বাবাদের স্টেটাসও ফুলে ফেঁপে ওঠে। যখন ভিডিওগুলো উথলে পড়ে স্ক্রিনে, এক লাখের বাচ্চার খুশিকে দশ হাজারের শিশুর আনন্দের তুলনায় অনেক বেশি দামি মনে হতে থাকে। আবার পাঁচ হাজারি কোনো খেলো, বস্তির প্লে-স্কুল, দশ হাজারিকে অবাক চোখে দেখে যায়। অন্য দিকে, এক ক্যাটাগরির বাবা মায়েরাও নিজেরা নিজেদের মধ্যে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। তার আসল মূল্য দেয় শিশুরা, ঠিক যেমনটা দেখেছিলাম দোলের দিন।

শিক্ষাব্যবস্থার অলিগলি যাঁরা ঘুরে বেড়ান, তাঁদের অনেকে এই প্লে-স্কুল নামক ব্যবস্থার উপরেই এক বাহাত্তর ফন্টের প্রশ্নচিহ্ন রাখেন। এক শিক্ষাবিদকে বলতে শুনেছিলাম, এত ছোটো বয়স থেকে শিশুদের পড়াশোনার শিকলে বেঁধে ফেললে লাভের বদলে আখেরে ছোটোদের ক্ষতি হয়। যে সময়টা মা-বাবার সান্নিধ্য কোনো শিশুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, তখন স্কুলের চৌহদ্দিতে ফেলে দিলে সেই সান্নিধ্যলাভের সময় থেকে অনেকটা খুবলে নেওয়া হয়। ছোটোদের মানুষ করা প্রসঙ্গে যে সমস্ত দেশি বিদেশি বই রয়েছে, আন্তর্জালের নানা পেজ রয়েছে, তাদের কোনোটাই সাড়ে তিন-চার বছরের আগে শিশুকে স্কুলে দেওয়ার পক্ষে কথা বলে না। বরং বলে, যে বয়সটা আসলে নিয়ম না মানার, যে সময়টা খেয়াল খুশির,

তখন চার দেওয়ালের মধ্যে একটি শিশুকে বেঁধে দিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে তার ক্ষতি করি। মনোবিদরা বলেন, ঠিক বয়সের আগেই জোর করে পড়াতে, লেখাতে, গুণতে শেখালে শিশুদের মনের মধ্যে একটা গুপ্ত কুঠুরিতে ক্রমশ জমা হতে থাকে অবসাদ। এই অবসাদ জমতে জমতে যখন পাথর হয়, তখন পড়াশোনা ব্যাপারটা থেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ওরা। এই বিকর্ষণ যেকোনো বয়সে আসতে পারে। যে ছেলেটি বা মেয়েটি ক্লাস সিক্স অবধি তুমুল ভালো রেজাল্ট করেও সেভেন-এইট থেকে পড়াশোনার প্রতি পুরোপুরি অনাসক্ত হয়ে পড়ল, তার মনের ময়না তদন্ত করলে হয়তো খুব অল্প বয়সে লেখাপড়া শুরু করানোর কথাই উঠে আসবে। মনের চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকে এমনটাই মনে করেন। শিশুদের সৃজনশীলতা খুঁজে নিয়ে তাকে ফুলে ফলে ভরিয়ে দেওয়ার যে দাবি জানায় প্লে-স্কুলগুলো, সেই যুক্তিকেও এক কথায় খারিজ করে দেন শিশু বিশেষজ্ঞরা, বিশ্ব জুড়ে। তাঁরা বলেন, স্কুলের গণ্ডির মধ্যে ফর্মুলায় বাঁধা তথ্যরাজি অর্থাৎ ইনফরমেশন ফ্লো আসতে শুরু করলে খুব ছোটো শিশুরা তাদের কল্পনাশক্তিটাই হারিয়ে ফেলবে। একটি পরিচিত শিশুর কথা জানি। দেওয়ালে লাগানো চড়াইয়ের স্টিকার দেখিয়ে, চড়াইপাখি কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে একগাল হেসে উত্তর দিত, চড়াইপাখি দার্জিলিং যাচ্ছে। দার্জিলিং গিয়ে চড়াইপাখি কী করবে শুধোলে উত্তর আসত, ভাতু খেয়ে ঘুমঘুম। দু-বছরের মাথায় তাকে প্লে-স্কুলে ভর্তি করা হলে এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর পালটে যায়। একই প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুরু করে, চড়াইপাখি নেস্টে যাচ্ছে। স্টাডি করবে। উল্লেখ না করলে ভুল হবে, নয়া উত্তর দেওয়ার সময় সেই হাসিটা উবে গিয়েছিল বিলকুল।

অল্প পুঁজিতে দারুন রিটার্ন দেয় যে সমস্ত নব্য ব্যবসা, তার প্রথম সারিতে আলো করে থাকে প্লে-স্কুল। অল্প একটু জায়গা লাগে, বিজ্ঞাপনে বাচ্চার মাথার পিছনে ফটোশপ দিয়ে তৈরি করে দেওয়া দ্যুতি লাগে। সঙ্গে প্রয়োজন একটা ওয়েবসাইট আর বুলেট পয়েন্টে কিছু গিমিক। হ্যালোজেনের সামনে শ্যামাপোকার মতো তাতে ভিড় জমাই আমরা, বাবা-মায়েরা। জীবনে সাফল্যের সমীকরণটা নিজেদের ইচ্ছেমতো আমরা সাজিয়ে নিয়েছি বেশ। চল্লিশ লাখের গাড়ি থেকে নামতে গেলে ব্যাঙ্কে অন্তত কোটি পাঁচেক থাকতে হয়। ব্যাঙ্কে ওই টাকা থাকার জন্য বিরাট কোম্পানির শীর্ষপদে থাকা জরুরি। তার জন্য জয়েন্টের রেজাল্ট বেরনোর পরে খবর কাগজের প্রথম পাতায় থাকতেই হবে হাতের মুদ্রায় ভি দেখানো আমার উত্তরসূরীকে। তিরিশ সেকেন্ডেই মিনিটের কাঁটা সরে যায় আমাদের ঘড়িতে। তাই, নিজের রক্ত আর জিন দিয়ে তৈরি করেছি যে শরীর, সে যত তাড়াতাড়ি গেলা শুরু করবে, তত মঙ্গল।

প্লে-স্কুলের একেবারে পিছনে, কোনো একটা ঘরের কোনায়, গারবেজ ব্যাগের মধ্যে ভরা থাকে ঠাকুরমার ঝুলির কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলা পাতা। প্রিয়জনদের আদরও।

অক্ষয়বটের দেশ

রবীন্দ্রনাথের সুপ্ত সংহত নাস্তিক্য

কালীকৃষ্ণ গুহ

'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না।'

— রবীন্দ্রনাথ (শান্তিনিকেতন)

এবছর প্রথম কালবৈশাখীর গর্জন শুনে চমকে উঠে মনে হল একটা লেখা তৈরি করে ফেলতেই হবে, সময় একেবারে হাতে নেই। কোনো কাজ নেই অথচ কোনো কাজ করতে গেলে মনে হয় সময় আর হাতে নেই। তাহলে কি কাজের সময় জীবন থেকেই চলে গেছে? হয়তো তাই। এখন মনে হয় শুধু বইপত্রের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে শুয়ে থাকাই একমাত্র কাজ। বইপত্রে নির্বাক চোখ বুলিয়ে যাওয়াই একমাত্র কাজ। এখন চুপ করে থাকার সময় এসেছে জীবনে— যেমন একসময় ছিল শুধু কথা বলার সময়। প্রাসঙ্গিক কথা তো কোনোদিনই বেশি বলার ছিল না। ফলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার আকর্ষণ এড়ানো খুব কঠিন, এখনও বুঝতে পারি।

আজকের প্রসঙ্গে আসার আগে গত শতকের পঞ্চাশের দশকের মহালেখক দেবেশ রায়ের কথা স্মরণ করতে হবে আমাদের যেহেতু, আমাদের বিবেচনায়, তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন এক ভাষা ও বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিলেন আমাদের। তাঁর সাহিত্যে কথা বলেছিল ভাষাহারা মানুষ। তাঁকে নিয়ে অতি দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব, করা উচিত। তার জন্য কিছু সময় নিতে হবে। তাঁর বাস্তবতায়—বাস্তবতার অলৌকিকে—অনুপ্রবেশ সহজ নয়। এই ভাষাহারা মানুষ ও সেই বাস্তবের অলৌকিকে পৌঁছে শিহরিত হয়েছিলাম প্রায় ৫০ বছর আগে তাঁর 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' পড়ে। সেই শিহরন ক্রমশ দীর্ঘতর হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের গদ্যকার বন্ধু রমানাথ রায়ের কথাও মনে পড়ছে আজ যেহেতু তিনিও সম্প্রতি বিদায় নিয়েছেন, অথচ তাঁকে নিয়ে কোনো লেখা আজও চোখে পড়ল না। রমানাথ চেনা বাস্তবের ভিতর দিয়ে একটা অচেনা বাস্তবে পৌঁছে গিয়ে কথা শুরু করতেন। তাঁর অধিকাংশ রচনার আবহে ছিল একটা দূরস্থিত অস্পষ্ট হাস্যরোল। তাঁর শেষ যে উপন্যাসটি পড়ে তাঁর সঙ্গে ফোনে মুগ্ধতা জানিয়েছিলাম— তাঁর মৃত্যুর এক-দেড়মাস আগে— সেই উপন্যাসটির নাম ছিল 'আমি রমানাথ নই'। কোনো একদিন রমানাথের সাহিত্যকর্ম নিয়েও লিখতে হবে জানি, যদি অবশ্য সেই সময় হাতে থাকে! স্মরণ করতে হবে অনুজ বন্ধু, কবিসমাজের একজন কবি, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের কথাও যিনি মৃত্যুর কয়েক দিন আগে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমরা কেন এইভাবে মহাধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছি বলতে পারেন?' চুপ করে শুনেছি তাঁর কথা। তারপর টেলিফোন হাত থেকে খসে পড়েছে। তাঁর কথার সংকেত কোনোদিনই খুব স্পষ্ট হয়নি। শুধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কথাই লিখে উঠতে পেরেছি একটি পত্রিকার তাগিদে— যিনি পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে বোধহয় সব থেকে বেশি জটিল অথচ যাঁর জটিলতা সহজকে খুঁজে ফিরেছে— আর এই খোঁজার পথপরিক্রমার কোনো শেষ ছিল না! তাঁকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে যেমন অনেক অনেক আলোচনা হবে আরো বলা যায়। তিনি বর্তমান বিশ্বের কেন্দ্র থেকে কথা বলে গেছেন যেন! তাঁর রচনারাশিও অনেক, যার মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের পাঠ অম্লান হয়ে আছে অনুবাদে, টীকা-টিপ্পনীতে, দীর্ঘ দীর্ঘতর প্রবন্ধে, স্মৃতিসন্ধর্ভে। 'কালের স্পর্শরহিত/ওগো আকাশের দুহিতা' এই দুটি শুরুর বাক্যে 'ঊষা' স্তোত্র রচনা করে যিনি বাংলা কবিতায় নিজের আসন পেতেছিলেন, সেই বিমান মাহাতো করোনার বলি হয়ে বিদায় নিলেন। অনুজপ্রতিম কবি বিমানতুল্য বিদ্বান ও লাজুক মানুষ বেশি দেখিনি।

আমাদের আজকের প্রসঙ্গে আসার আগে সেই কথাটুকু বলা রইল— অর্ঘ্যের মতো। 'অর্ঘ্য তোমার আনিনি ভরিয়া বাহির হতে', বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

২

পঁচিশে বৈশাখের অগ্নিস্নানের দিকে যাবার আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই দু-একটা কথা বলব আজ। এখনও

যেসব বই হাতে উঠে আসে তার মধ্যে রবীন্দ্ররচনাবলির দু-একটা খণ্ড থাকে। অনেকদিন পর আবার দেখলাম তাঁর একটা উপন্যাস-খণ্ড উঠে এসেছে, যে-খণ্ডে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি রয়েছে। ফলে অনন্যোপায় এই উপন্যাসটি আরো একবার পড়ে ফেলা ছাড়া উপায় রইল না। এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কিনা, সেই প্রশ্নে আমরা যাব না। অনেক উপন্যাস নিয়েই এই ভ্রম তৈরি হয়।

এই ছোটো উপন্যাসটির প্রতিটি চরিত্রই বিস্ময়কর— বিশেষ করে চারটি প্রধান চরিত্র— জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস। যে-জিনিসটা সব থেকে বেশি চমৎকৃত করে তা জ্যাঠামশায়ের চরিত্র— যিনি নাস্তিক। যাঁর বাড়িতে ইংরেজি বইয়ের পাহাড়। ভাবতে অবাক লাগে যে ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে *সবুজ পত্রে* চারটি সংখ্যায় চারটি গল্প হিসেবে এই উপন্যাসের চারটি পরিচ্ছেদ তিনি লেখেন। তখন, আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ঈশ্বরবিশ্বাস খুব একটা ম্লান হয়নি, যদিও ইতিমধ্যে তিনি বস্তুবিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন আর তাঁর হাত থেকে রচিত হচ্ছে *বলাকা*-র মতো দিগন্তপ্রসারী দিকনির্দেশক কাব্যগ্রন্থ।

লক্ষ করতে হবে জ্যাঠামশায়কে নাস্তিক বানানোর মধ্যে কোনো রকম সূক্ষ্ম বিদ্রূপ ছিল কি না। না, আমরা অন্তত তেমন কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি। তাঁর নাস্তিক্য কিন্তু গভীরভাবে ধার্মিক, যাঁর ধর্ম বিশুদ্ধ বস্তুবাদ ও মানবিকতা। আর সত্য। জগমোহন শচীশের জ্যাঠামশায়—শচীশের শিক্ষক, যে-কারণে জ্যাঠামশায় যতদিন জীবিত ছিলেন শচীশও ছিল ঘোর নাস্তিক। জগমোহন কী ধরনের নাস্তিক ছিলেন? 'তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়— তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যাবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেখানেই আস্তিক্য ধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল।' যৌবনবয়সে স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি আর বিবাহ করেননি। জগমোহন ছোটোভাই হরিমোহনের এক মেধাবী পুত্র শচীশকে পুত্রস্নেহে আঁকড়ে ধরেছিলেন, যেমন শচীশ তাঁর জ্যাঠামশায়কে। কিন্তু সম্পর্ক ছিল বন্ধু বা সমবয়সির মতো। কী মূল্যবোধে ন্যাস্তিক্যের অবস্থান, তা এই কথা থেকে বোঝা যায়, 'জগমোহনের নাস্তিক্যধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা, সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যেকোনো রস থাক একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই— তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বকশিশের বিজ্ঞাপন বা চোখরাঙানি।... তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে জানিবার জোর বেশি।'

প্রত্যেকের জীবনেই থাকে একটা বিশ্বাসের দিক, একটা কাজের দিক। জগমোহন তাঁর নাস্তিকতা নিয়ে ঘিরে বসে তাত্ত্বিক আলোচনা করে জীবন কাটাননি। তিনি তাঁর তাত্ত্বিকতা তথা ধর্মচিন্তার অনুবাদও করেছেন। তাঁর ছোটোভাই হরিমোহন, শচীশের পিতা, ঈশ্বরবিশ্বাসী, পুজাআচার নিরন্তর ব্যস্ত, অথচ নানা রকম স্বার্থবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রতার দ্বারা চালিত। তিনি তাঁর নাস্তিক অগ্রজকে সহ্য করতে পারেন না। পারার কথাও না যেহেতু জগমোহনের কাজকর্ম সবই অনাচারের পর্যায়ে পড়ে। 'বাড়ির লোক একদিন দেখিল বাড়ির যেমহলে জগমোহন থাকেন সেইদিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক ও পরিবেশকের দল সব মুসলমান।' এইসব দেখে হরিমোহন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তার দাদার কাছে আপত্তি জানালে, 'জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না— আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব তাহাতে বাধা দিয়ো না।' তর্ক চলে। হরিমোহন বলেন, 'তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?' উত্তরে জগমোহন যে কথাটা বলেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত এই জন্য যে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মেছিলেন, 'ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মানো, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়— তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।' ক্ষিপ্ত হরিমোহন বলেন, 'তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?' উত্তরে জগমোহন বলেন, 'হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা।' এর পরের কাহিনিপ্রবাহ নিয়ে বিশেষ-কিছু বলার নেই। জগমোহনকে দেবত্র সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে চাকরি নিতে হল। আর শেষপর্যন্ত প্লেগের হাসপাতাল খুলে মুসলমান প্রতিবেশীদের বাঁচানোর চেষ্টা করে নিজেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিলেন। এই পরিণতিই ছিল একজন প্রকৃত নাস্তিকের পরিণতি— একজন প্রকৃত ধার্মিকের পরিণতি।

এই নাস্তিকের চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় রয়েছে। রয়েছে মানবিক ধর্মের চূড়ান্ত পরিচয়। একজন বিশুদ্ধ ধার্মিকের পরিচয়। এখানে মনে রাখা যায় যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানচেতনা তথা যুক্তিবাদ এবং সেই সঙ্গে নাস্তিক্যও এসে পৌঁছোয় এই দেশে। আমরা বিদ্যাসাগরকে পাই, আরো বেশি করে পাই তাঁর বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্তকে। এই মুক্তচিন্তক অক্ষয়কুমার দত্ত সমগ্র প্রাচীন সভ্যতার— বিশেষত ভারতীয় সভ্যতার—সাহিত্য ও দর্শন আলোচনা করে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখেছিলেন। ফরাসি দার্শনিক

অগাস্ট কোঁতের পজিটিভিজম্ ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩০) ও অন্যান্য কয়েকজন বাঙালি চিন্তকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবিজীবনী'র লেখক প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, 'এমন হতে পারে জ্যাঠামশায়ের চরিত্র চিত্রণের সময় "পুরাতন প্রসঙ্গ" রবীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল, অবশ্য পটভূমি রচনাতেই তা সীমাবদ্ধ থেকেছে।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে *পুরাতন প্রসঙ্গ* বইটি বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৯৭৫-১৯৩৬) কৃষ্ণকমলের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রচনা করেন।

৩

জ্যাঠামশায়ের মতো একটি নাস্তিক অথচ প্রকৃত ধার্মিক চরিত্র সৃষ্টির জন্যই শুধু 'চতুরঙ্গ' একটি মহৎ সৃষ্টি নয়। অন্য তিনটি চরিত্রও অবিস্মরণীয়। প্রত্যেকেই আত্মজিজ্ঞাসার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিকশিত হয়েছে। সংক্ষেপে এদের কথাও কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। দু-বছর পর তার বন্ধু শ্রীবিলাস তাকে জনৈক লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনের দলে আবিষ্কার করে। লীলানন্দের শিষ্য হিসেবে শচীশ তার গুরুর তামাক সাজে আর পা টেপা আর অবশ্যই কীর্তনের দলে কর্তাল বাজায়। কে এই শচীশ? শ্রীবিলাস লিখেছে (এই উপন্যাসটি অন্যতম চরিত্র উজ্জ্বল পণ্ডিত শ্রীবিলাসের ডাইরি), প্রথম সাক্ষাতের পর, 'শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক— তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম; — তাই একমুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।' এই শচীশ তার জ্যাঠামশায়ের শিষ্যত্বে যে নাস্তিকতার মধ্যে মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছিল সে কেন আজ এক সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে কর্তাল বাজায় আর অন্য সময় গুরুর তামাক সাজে আর পা টেপে, তা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এ আত্মজিজ্ঞাসার একটা স্তর— এক্ষেত্রে হয়তো দ্বিতীয় একটা স্তর। সে শ্রীবিলাসকে সঙ্গে নিয়েই এসে পৌঁছলো লীলানন্দের এক শিষ্যের বাড়িতে যে শিষ্য মৃত্যুর আগে গুরুকে তার বাড়িটি দান করে তার যুবতী বিধবাকে দেখাশোনার ভার দিয়ে গেছে। এখন চারজনের পরিবার তৈরি হল। কিন্তু দামিনীর মনে লেশমাত্র আনন্দ নেই, গুরুর প্রতি কোনো শ্রদ্ধাও নেই। সে গুরু হিসেবে শচীশকেই মানে। কিন্তু শচীশ ঈশ্বরের খোঁজে বিভোর। তিনটি চরিত্রই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। এখানে মনে রাখা যায় যে তারা চারজন যখন একটি সমুদ্রের ধারে নির্জন গুহায় ঘটনচক্রে একটি রাত্রিবাস করছিল সেদিনের অভিজ্ঞতা শচীশের ডাইরিতে এই '...জানি না কতক্ষণ পরে— সেটা বোধ করি ঘুম নয়— অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!' এই 'জন্তু'টাকে শচীশ দু-পায়ে ঠেলতে লাগল। 'মনে হল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে— ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে— সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছড়িয়ে লাথি মারিলাম। ....অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?' বলা বাহুল্য, এ ছিল শচীশের কাছে দামিনীর আত্মসমর্পণ— শরীরের সমস্ত আগুন আর মনের সমস্ত শুদ্ধতা নিয়ে আত্মসমর্পণ। এর পর থেকে শচীশের আত্মজিজ্ঞসার তৃতীয় স্তরের শুরু। দামিনীর নিজের আগুনে পুড়ে ক্রমশ শুদ্ধ হয়ে ওঠা। বুকে প্রেমিকের পদঘাত বহন করা!

আমরা এই গল্পটি পাঠককে মনে করিয়ে দেবার জন্য শুধু এইটুকু বলব যে শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করে আর শেষ পর্যন্ত দামিনী বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে হাওয়া-বদলের জন্য সেই সমুদ্রের ধারে যায় (যার তীরের গুহায় তারা একসময় রাত্রি কাটিয়েছিল আর দামিনী বুকে অর্জন করেছিল তার প্রেমিক তথা গুরুর অনিচ্ছাকৃত পদাঘাত) এবং এই শেষ হাওয়া বদলের 'চিকিৎসায়' কোনো লাভ হয় না। কিন্তু দামিনী মৃত্যুর আগে জানিয়ে যায় যে সে শ্রীবিলাসকে ভালোবেসেছিল যা ছিল তার আত্মজিজ্ঞাসার শেষ স্তরে পৌঁছোনো। এই লেখাটি শেষ হয়েছিল দামিনীর এই উক্তিতে যা বাংলাসাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে; 'যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন দেখা পাই।'

পাঠক ভাবতে পরেন শচীশের কী হল। শচীশ তার আত্মখননের কোনো এক স্তরে বসবাস করার জন্য দামিনীর একসঙ্গে বসবাস করার প্রস্তাব অস্বীকার ক'রে, 'আমার কাজ অন্যত্র' ব'লে চিরকালের জন্য উপন্যাস থেকে হারিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যা মনে রাখতে হয় তা হল এই যে এই উপন্যাসটি দামিনীর আত্মহুতির গল্প— প্রেমের জন্য আত্মহুতি— জন্মান্তরের বাসনা নিয়ে মৃত্যুবরণ।

৪

আমরা এই আলোচনাটুকু শেষ করার মুহূর্তে একটা অন্য কথা ভাবছিলাম। ওই সময়টা, ওই ১৩২১ সাল (১৯১৪-১৫) কেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। তিনি এই বছর সৃষ্টিশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিলেন বলা যায়। তাঁর সৃষ্টির বিপুল তালিকা এখানে রাখছি না। কিন্তু সে-বছর তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি

সাংঘাতিক চিঠি লেখেন। তিনি মাঝে মাঝে মুখের ও কানের বাঁদিকে একটা ব্যথায় কষ্ট পেতেন ঠিকই, কিন্তু এই চিঠিটিকে সেই অসুখ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তিনি লিখছেন,

> দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ;— অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য ও অনাস্থা। তার পরে রামগড়ে এখন ছিলুম আমার Conscience-এ কেবলি ভয়ঙ্কর আঘাত করচে যে যে বিদ্যালয় জমিদারী সংসার দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্ত্তব্য আমি কিছুই করিনি— আমার উচিত ছিল নিঃসঙ্কোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া, এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোককে একেবারে চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যে টেনে আনা; ...কাল সন্ধ্যার সময়ে ক্ষণকালের জন্য, এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা আলোর আবির্ভাব দেখতে পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এইবার থেকে আমি এই ভয়ঙ্কর মোহজাল থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে আবার আমার প্রকৃতি ফিরে পাব। (রবিজীবনী/সপ্তম খণ্ড/৩৭পৃ.)

কেন এই চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এই প্রশ্ন নিয়ে শঙ্খবাবুর শরণাপন্ন হওয়া আজ আর সম্ভব নয়। হতে পারে, কেউই এর উত্তর জানেন না! মনে রাখা যায়, আগের বছর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবার কারণে তাঁর খ্যাতি তখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে— বিশ্ব থেকে অতিথিরা আসছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে! আর তিনিও নিজেকে বিশ্বপিতার 'পথিক সন্তান' বলে ভাবছেন— বেরিয়ে পড়ছেন বিশ্বভ্রমণে। জীবনের এই সুসময়ে এইরকম হতাশায় আক্রান্ত হওয়া ভাবা যায় না!

একজন মহাস্রষ্টার মন যে কত বিচিত্র হতে পারে— কত রকম অকারণ আনন্দে আঘাতে স্মৃতিকাতরতায় বেদনাবোধের স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত থাকে— তা ব্যাখ্যা করা কারো পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়।

আমরা এই নিবন্ধ এই কথা বলে শেষ করতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নাস্তিকতার দিকে সারা জীবন ধরে এগিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁর মধ্যে একজন নাস্তিকেরও বসবাস ছিল যে-সত্তার রূপায়ণ ঘটেছে জ্যাঠামশায় চরিত্রটির মধ্যে— তাঁর মধ্যবয়সেই। তাঁর মন ক্রমশ বিজ্ঞানচেতনার দিকে এগিয়েছে যার ফল হিসেবে তাঁর কাছ থেকে আমরা পেলাম তাঁর শেষ জীবনের অত্যাশ্চর্য রচনা— বিশ্বপরিচয়।

এই রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা আমাদের চিরকালই করে যেতে হবে যিনি শেষ লেখায় উচ্চারণ করলেন, 'তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে।' এ হল মাটির সঙ্গে, পঞ্চভূতের সঙ্গে মিশে যাবার প্রাক্‌কথন, এখানে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের কোনো স্থান নেই।

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Issue date 16 April 2021. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 9, Issue 8 & 9 Arek Rakam

In the ADJUNCTIVE TREAMENT of your patients with PARTIAL SEIZURES

Brevipil

Brivaracetam

25/50/75/100 mg Tablets, 10mg/mL Oral Solution
10mg/mL Injection

For an unstoppable life

Swift in action

- Superior brain permeability results fast onset of action against seizures
- Crosses BBB rapidly within minutes compared with LEV (30-60 mins)

Rapid brain bioavailability

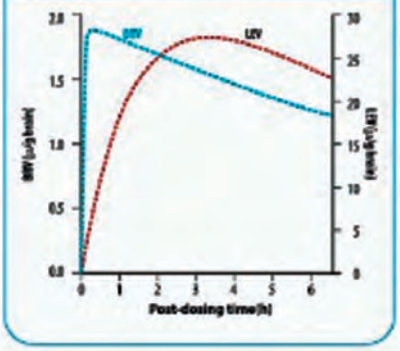

SYMENTA
a SUN PHARMA division

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 50